পাভেল বাঝোভ
মালাকাইটের ঝাঁপি

সূচীপত্র

ভূমিকা

উরালের কাহিনীকার পাভেল পেত্রোভিচ বাঝোভের (১৮৭৯—১৯৫০) কাহিনীগুচ্ছ 'মালাকাইটের ঝাঁপি' এক অসামান্য সৃষ্টি। ইতিমধ্যেই রুশ সাহিত্যে তা ক্লাসিকের স্থান নিয়েছে। আখ্যানগুলির নিবিড় গভীরতা ও বিরল লালিত্যের আকর্ষণে একাধিক ব্যালে ও ফিল্ম হয়েছে তা নিয়ে।

উরাল গিরিশিরার ঢালুতে দুম্‌নায়া আর আজোভ পাহাড়ের পাদদেশের খনি এলাকাটা তার পটভূমি। সোনা, তামা, লোহা, মর্মর, মালাকাইট ও নানা দুষ্প্রাপ্য রত্নে জায়গাটা অতি সমৃদ্ধ। সতের শতকেই তার সন্ধানে রাশিয়ার কেন্দ্রাঞ্চল থেকে দুঃসাহসীরা আসতে শুরু করে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে। তবে খনিগুলো ভালো করে চালু হয় আঠারো শতকে। স্বয়ং রাজা তো বটেই, তাছাড়াও অভিজাত জমিদার-জায়গীরদাররা হয়ে বসে তার মালিক। কাজ চলত ভূমিদাস দিয়ে। ভূমিদাস কথাটা বাঙালী পাঠকদের কাছে একটু ব্যাখ্যা করা দরকার, কেননা হুবহু অনুরূপ প্রথা আমাদের দেশে তেমন নেই। এরা ছিল চাষী, কিন্তু জমির সঙ্গে বাঁধা, ছেড়ে চলে যাবার অধিকার তাদের ছিল না। তাতে বাঁধা থেকে মনিবের বেগার খাটতে হত তাদের, মনিব জমিদার খুশিমতো নিজের চাষ ছাড়াও তাদের অন্য যেকোনো কাজে লাগাত। খনি আবিষ্কারের পর এই ভূমিদাসদেরই সেখানে জোর করে পাঠানো হয় খাটতে। বাঝোভের অনেক কাহিনীর নায়কই এই ভূমিদাস-মজুর — পাথর কাটে তারা, সোনা মেশানো মাটি ধুয়ে ধুয়ে সোনা তোলে, তামা-লোহা গালাই করে, খোদাই করে পাথর। উরালের ভয়াল-মোহন প্রকৃতি, তার কিছু জানা বহু অজানা সম্পদের আভাস, রাজধানীবাসী অভিজাতদের পাঠানো নায়েব-গোমস্তাদের নীচতা, নিষ্ঠুরতা, নিজেদের আপন শ্রমকৃতিত্বে বিস্ময়, অন্তিম শুভ ও ন্যায়ে স্বতঃপ্রণোদিত আস্থা — লোকপ্রতিভায় এ সবের প্রভাবে তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে

নানা কিংবদন্তী — কোনোটা সমাপ্ত, কোনোটা অসমাপ্ত, মুখে মুখে তা ছড়ায়, পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে তা বয়ে আসে, কোনোটার রূপ পালটায়, কোনোটায় আবার দেখা দেয় নতুন অর্থ, কোনোটায় লোকপ্রজ্ঞার দর্শন, কোনোটায় লোককল্পনার কাব্য। বাঝোভের কাহিনীগুলি এইসব লৌকিক কিংবদন্তী অবলম্বনে।

বাঝোভের নিজের জন্মও এই কিংবদন্তীর জন্মভূমিতে। তিনিও কয়েক পুরুষ ভূমিদাস-মজুর বংশের লোক। ঠাকুরদা ছিলেন তামা গালাইকর ভূমিদাস, ঠাকুরমাও। যৌবনে ভূমিদাসী হিসেবে একদল মেয়ের সঙ্গে তাঁকে জোর করে জন্মভূমি সিসের্ত থেকে পাঠানো হয় পোলেভায়ার পুরনো খনিতে। সেখানে নাকি মেয়ে কম পড়েছিল। 'যাকে বলবে তাকেই বিয়ে করতে হবে' — এই ছিল রেওয়াজ। তাঁর উক্তিতে, 'ওদিকের পথটা ছিল মেয়েদের চোখের জলে ভেজা।' নানা কারণে ভূমিদাস প্রথা উঠে গেলে স্বাধীনতা পেয়ে তিনি স্বামী-সংসার নিয়ে ফের চলে আসেন সিসের্তে। লেখকের পিতাও ছিলেন ভালো মিস্ত্রি, কিন্তু খানিকটা স্বাধীনচেতা, ওপরওয়ালাদের সঙ্গে সব সময় বনত না, এক জায়গায় টিকতে পারতেন না বেশি দিন, প্রায়ই জায়গা বদলাতেন। ফলে ছোট থেকেই বাঝোভ ওই বিস্তীর্ণ এলাকাটার লোকজন, জীবনযাত্রা, উপকথা-কিংবদন্তীর সঙ্গে পরিচিত হবার একটা কষ্টকর তবে ভবিষ্যৎ-সার্থক সুযোগ পেয়ে যান। তখনই দরিদ্র, হয়ত-বা অশিক্ষিত, কিন্তু নিজেদের ধরনের ভূয়োদর্শী বৃদ্ধ মজুরের দেখা তিনি কম পান নি। বালক বাঝোভ প্রাণভরে শুনেছেন তাদের বলা সব গল্প।

লেখককে সৌভাগ্যবান বলতে হবে, মজুরের ছেলে হলেও মা-বাপ তাঁকে স্থানীয় স্কুলে দিতে কুণ্ঠা করেন নি। পরে পের্মের ধর্মীয় শিক্ষায়তন থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বিদ্যালয়ে রুশ ভাষা ও সাহিত্য পড়াতে শুরু করেন। তবে ঘুরে বেড়াবার নেশা তাঁর কাটল না। ছুটি পেলেই দেশ ঘুরতেন, প্রধানত উরাল। নোট নিতেন, স্থানীয় উপকথা, কিংবদন্তী, ইতিহাস সংগ্রহ করতেন, লক্ষ্য করতেন এলাকার মিস্ত্রি-মজুরদের কাজ করার কায়দা, জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তখনো তিনি কলম ধরেন নি। লেখক তাঁকে করে তোলে বিপ্লব। জনগণের গভীর থেকে এসেছেন তিনি, তৎক্ষণাৎ বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়তে তাঁর দেরি হয় নি। ১৯১৭—১৯২১ সালের গৃহযুদ্ধে তিনি হয়ে ওঠেন শুধু যোদ্ধা নন, সাহিত্যিকও। ফ্রন্টের সংবাদপত্রেই

বেরয় তাঁর প্রথম স্কেচ, ব্যঙ্গ-রচনা। নিজেই তিনি বলেছেন, 'সত্যি, বিপ্লব না হলে কোনো সাহিত্য- কর্মই আমার দ্বারা হত না।'

তারপর থেকে তিনি উরাল খনি-অঞ্চলের জীবনযাত্রা, ইতিহাসাশ্রিত ঘটনা, উরাল লালফৌজীদের বীরত্ব ইত্যাদি নিয়ে লিখেছেন কম নয়, কিন্তু ১৯৩৯ সালে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'মালাকাইটের ঝাঁপি'ই তাঁকে অমর করে গেছে।

এ এক আশ্চর্য রূপকথার রাজ্য। বাস্তব এখানে অনায়াসে মিলে যায় অতিপ্রাকৃতে, ইতিহাস ডানা মেলে অতিকথায়, মানবিকটা হয়ে ওঠে কাব্যিক। একজন হঠাৎ একতাল প্রাকৃতিক সোনা পেয়ে গেল, কেউ খুঁড়ে তুলল আশ্চর্য শোভার কোনো মালাকাইট পাথর। নৃশংস কোনো গোমস্তার মৃত্যু হল অপঘাতে — এ থেকে সেকালের লোক-মানসে গড়ে উঠেছে অপ্রাকৃত শক্তির স্বকীয় এক-একটা প্রতিমা। যেহেতু তার উৎস লোকসাধারণ, তাই দেবতা না হলেও (খৃষ্টধর্মের প্রভাব তখন নীরন্ধ্র), মাঝে মাঝে অশুচি শক্তি, প্রেত বলে গণ্য হলেও (তামা পাহাড়ের ঠাকরুন সমস্ত মালাকাইট সরিয়ে নেয়, কেননা তার দেওয়া এই মালাকাইট নিয়ে তৈরি স্তম্ভ জমিদার পাঠিয়েছিল খৃষ্টীয় গির্জায়), এরা মোটের ওপর সাধারণ ভালোমানুষদের পক্ষে। এইসব লোককল্পনার সঙ্গে আমাদের, হয়ত-বা অনেক দেশেরই উপকথার মিল আছে। যেমন বাঙলায় একটা কথা আছে যকের ধন। কোথাও যেন প্রচুর গুপ্তধন সঞ্চিত আছে, তা রক্ষা করছে কোনো যক্ষ। শুধু সৌভাগ্যবান বা পিশাচসিদ্ধের পক্ষেই তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এখানেও আছে তেমন পিশাচসিদ্ধ, তেমন যক্ষিণী। আমাদের আদিবাস যেখানে, সে গাঁয়ে শুনতাম, এক রাতে খোঁড়া এক পুষ্করিণীতে পার্বণের দিনে লোকেদের কাছে ভেসে আসত সোনার চালুনীতে সোনার পিদিম। কোনো এক লোভী তা দখল করতে যাবার পর থেকে তা আর আসে না। এখানেও লোভ দেখলে মহানাগ অজগর সরিয়ে নেয় তার সোনা। তবে বলাই বাহুল্য, উরালের যক্ষ ও যক্ষিণীদের চেহারা ও স্বভাবে সেখানকার ছাপ থাকবেই। যেমন, তামা পাহাড়ের ঠাকরুন পরমাসুন্দরী তরুণী, ভারি চঞ্চল, পরনে তার মালাকাইট পাথরের পোষাক, কিন্তু রেশমের মতো তা মোলায়েম। আবার গুপ্তধনের কুয়ো আগলিয়ে যে থাকে, সে একেবারে নীল বুড়ি, আঙুলে নখ নেই, হাত বাড়িয়ে দেয় লম্বা, কিন্তু ইচ্ছে হলে, ভালো লাগলে সে হয়ে যায় রূপকথার রূপসী। কোথায় সোনা মিলবে, সে সংকেত দেয়

মহানাগ অজগর সাপ, কখনো তার রূপ সোনালী জরির পোষাকে রাশভারী পুরুষ, কখনো সাপের মতো নিষ্পলকা অষ্টাদশী। আজোভ পাহাড়ের কোন গুহায় আছে এক দীর্ঘতনু আদিবাসী লাবণ্যবতী, কেউ তার সোহাগের নাম ধরে ডাকতে পারলেই সে তার তাল তাল সোনার ভাঁড়ার খুলে দেবে। কেউ-বা আবার আগুনী-নাচুনী ছোট্ট পুতুল, পাক দিয়ে নাচতে-নাচতে বড়ো হয়ে গিয়ে ঠিক যেখানটায় সে শিস দিয়ে অদৃশ্য হবে, সেখানে খুঁড়লেই মিলবে সোনা।

এইসব কল্প-প্রতিমার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে সু-কু'র দ্বন্দ্ব, লোককথার যা বৈশিষ্ট্য। তবে বাঝোভ সেটার রূপ দিয়েছেন একেবারেই নিজের ধরনে, আর এইখানেই তিনি শুধু সংকলক নন, সংগ্রাহক নন, স্রষ্টা। লোককথার আমেজ এতটুকু ক্ষুণ্ণ না করে তিনি তাতে দিয়েছেন নতুন অর্থ, ব্যঞ্জনা। অত্যাচারী নায়েব, নির্বোধ জমিদারপুত্র, এমন কি লোভী কাঙাল, কর্তাভজা মজুর, — কেউই অপ্রাকৃত শক্তির হাত থেকে শাস্তি না পেয়ে যায় নি। তবে তার চেয়েও বড়ো কথা, শুভের জয়। কিন্তু সেটা তিনি দেখিয়েছেন চোখে আঙুল দিয়ে নয়, আশ্চর্য সংযমে, যেন এমনি-এমনি। ভূমিদাস স্তেপান ভয় পায় নি গোমস্তার মুখের ওপর বলতে যে, সে বোট্‌কা ছাগল, তামা পাহাড় থেকে চলে যাক। ঠাকরুনের বরে সে ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি পায়, স্বাধীন সংসার গড়ে। সরল সৎ-সাহসী ইলিয়া পায় নীল বুড়ির দৌলত। পরিশ্রমী মেয়ে ভাসিওন্‌কার হাতে এসে পড়ে হীরে। নির্লোভ অনাথ দেনিস্কো গিয়ে পৌঁছয় 'পাথুরে ঠোঁটের' গুহায়, সোনার চাঙড়ায়। এ সবই ঘটে ঠিক রূপকথার রীতিতে, তবু ঠিক তেমনটি নয়। 'তারপর তারা সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল' — রূপকথার এই শেষ কথাটি বাঝোভের বাস্তবতাবোধে বা উরাল লোক-প্রজ্ঞায় অকল্পনীয়। অপ্রাকৃতের হাতে পুরস্কৃতরা কখনোই এমন ধন পায় নি বা নেয় নি, যাতে তারা সত্যিকারের ধনী (সুতরাং নিপীড়ক) হয়ে ওঠে। একটু জমি, একটা ঘোড়া, কিছু গরু-টরু হলেই তারা খুশি। স্তেপান মাত্র একটা স্বাধীন সংসার পাতে, তার মুঠোভরা পান্নাগুলো সে কোনো কাজেই লাগায় না। ইলিয়াও যে আশ্চর্য সুন্দরী মেয়েটিকে বিয়ে করল, শ্বেতপাথরের সে মজুরানী মারা গেল ক্ষয়রোগে, ইলিয়া নিজেও। মহানাগের দৌলতে সোনার খোঁজ পেয়েও পান্তেলেই কেবল মুক্তি কিনে সোনা খোঁজা ছেড়ে দিল। ভাবল: 'সোনা ছাড়াই শান্তিতে থাকব।'

এর সঙ্গেই মিলে আছে বাঝোভের আরেকটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য: শ্রম, তা সে পাথর কাটা, কাঠকয়লা বানানো, পাথর খোদাই, মালাকাইটের কাজ, সেলাই-ফোঁড়াই, এমনকি গৃহস্থালীর টুকিটাকি, — যাই হোক, তার মৃদু-নিভৃত জয়গান। চরিত্ররা তাঁর সবাই কাজ করে। রূপকথা হলেও স্তেপানের স্ত্রী নাস্তাসিয়া 'খাটিয়ে মেয়ে'। তানিউশ্‌কা তো সেলাইয়ে নামকরা, রাজবাড়ীতেও ডাক পড়ে তার, খাটো-হাত তিমোখা চায় সব বিদ্যে শিখতে। আর পেশা কত — '...কেউ খনি থেকে খনিজ নিয়ে আসে, অন্যরা সেটা গলায়। কেউ মাটি ধুয়ে সোনা বার করে, প্ল্যাটিনাম কুড়োয়, রঙীন পাথরের জন্যে মাটি খোঁড়ে, পাথরের খনিতে কাজ করে। কেউ আবার জহরত খোঁজে, পালিশ করে সেগুলো...'

উরালের মিস্ত্রি, কারিগর, ওস্তাদদের কারুকর্মে তিনি উল্লসিত। কিন্তু সেইসঙ্গে বোঝেন এক-একটা শিল্পসৃষ্টির যন্ত্রণা। এই দিক দিয়ে তাঁর 'পাথরের ফুল', 'পাহাড়ের কারিগর' আর 'ঠুনকো ডাল' কাহিনীত্রয়ী ঘটনার ধারাবাহিকতায় আর বক্তব্যের বিকাশে একসঙ্গে নেওয়া ভালো। অনাথ ছেলে, হিলহিলে রোগা, 'উপোসী' দানিলা এমনিতে কোনো কাজে লাগে না, ভুলো মন, কাজ ছেড়ে সে চেয়ে দেখে প্রজাপতির রঙ, খুঁত ধরে ওস্তাদ পাথর-কারিগরের। তাহলেও বুড়ো ওস্তাদ ভালোবেসে তাকে কাজ শেখায়। দেখা গেল সে সত্যিকারের শিল্পী। রাজধানী থেকে বাবুরা নিজেদের রুচিমতো নক্সা এ'কে পাঠায় পাথরের পেয়ালার জন্যে। সে নক্সা দানিলার পছন্দ নয়। সে তার নিজের মতো আরো একটা পাথরের পেয়ালা বানাতে লাগল। ওস্তাদরা সবাই তার তারিফ করল। কিন্তু মন তার উঠছিল না। সে চায় রূপকথার সত্যিকারের পাথরের ফুল দেখতে। তাহলে সে হয়ত করতে পারবে। ঠাকরুন তাকে সেটা দেখাল। কিন্তু অমন পাথর সে পাবে কোথা থেকে? ঠাকরুন বলল, 'তুমি নিজে থেকে ভাবতে পারলে আমি পাথর দিতাম, কিন্তু এখন আর পারি না।' স্রষ্টার অতৃপ্তিতে দানিলা তার সৃষ্টিকে চূর্ণ করে একদিন উধাও হয়ে গেল। দ্বিতীয় পর্বে দানিলাকে ঠাকরুন কারিগর হিসেবে টেনে নেয় তার পাহাড়ের রাজ্যে। পাথরের আশ্চর্য সব কারুকাজ সেখানে। কিন্তু মর্ত্য-মানবী বাগদত্তা কাতিয়ার ঐকান্তিক অনুরাগে ঠাকরুন তাকে শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে দেয়। শুধু অলোকসামান্য যেসব সৃষ্টি সে দেখেছিল সেটা ভুলে যেতে হয় তাকে। তৃতীয় পর্বে দানিলা-কাতিয়ার

ছেলে কুঁজো মিতিয়া একেবারে সাধারণ, পথ তৈরির পাথর থেকে বানায় অপূর্ব শিল্প। ধনী জমিদার তার নৈপুণ্যে মুগ্ধ হলেও যখন শোনে সেটা দামী নয়, সাধারণ পাথর, তার মেয়ের যৌতুক হিসেবে নাকি অপমানকর, তখন নির্বোধ রাগে গুঁড়িয়ে দেয় সেটা। মিতিয়া জমিদারকে চাবুক মেরে উধাও হয়ে যায়। লোকজন, চাকর-বাকর সবাই থ' মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। এর ভিতর দিয়ে লেখক বলতে চেয়েছেন, সত্যিকারের যে শিল্পী তার পক্ষে শুধু আকাঙ্ক্ষাই যথেষ্ট নয়, চাই কল্পনার পরিপূর্ণতা, যা ছিল মিতিয়ার, যার সামান্য অভাবে দানিলা অমন অশান্ত।

আর এই সবকিছুই বাঝোভ প্রকাশ করেন এমন একটা মায়ায়, যা একাধারে বাস্তব ও কাব্যিক, ইঙ্গিতময়। তামা পাহাড়ের ঠাকরুন স্তেপানকে বিদায় জানানোর সময় সাধারণ রমণীর মতো কাঁদে, কিন্তু ফোঁটা ফোঁটা তার চোখের জল হয়ে ওঠে দানা দানা পান্না। নীল বুড়ি সুন্দরী গেঁয়ো মেয়ের রূপ ধরে ইলিয়াকে দেয় ডালা-ভরা বুনো বৈঁচি, পরে তা হয়ে ওঠে মণিরত্ন। আজোভ পাহাড়ের গুহা থেকে কেবল হাহাকারের শব্দ আসে, শুধু কৃষক-বিদ্রোহের সময় নাকি সেখানে গানের মতো শোনা গিয়েছিল। ফরাসী মণিকার যার বানানো কৃত্রিম মালাকাইট দেখে মুগ্ধ, সেই বুড়ো ঝেলেজ্‌কো গৃহযুদ্ধে মারা যাবার আগে বলে, 'ভাবনা নেই, মজুরের হাত সব পারে। কোনোটা গুঁড়ো করবে, কোনোটা দানা বানাবে, কোনোটায় পালিশ। ব্যস, গোটা একটা পাথর হবে ভারি আনন্দের। অবাক হবে সারা দুনিয়া। একটু শিক্ষাও পাবে।'

পরিশেষে একটা কথা বলা দরকার। সেটা বাঝোভের ভাষা, অনুবাদে তার রূপান্তর সম্ভবত অসম্ভব। তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র বুড়ি যেমন রাঢ়ের গ্রাম্য টানে কাহিনী গাঁথে, বাঝোভের প্রতিটি গল্পই তেমনি উরালের বৃদ্ধ মজুরের মুখে বলা। পদে পদে তাতে উরালী উপভাষার স্বাদ, সামান্য এক-একটা কথায় খুলে যায় জন-জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, অথচ বয়ে চলে তা সুরে সুরে, ছন্দে, অনাড়ম্বরে।

এ বই ছোটো-বড়ো সবাইকেই সমান টানবে।

ননী ভৌমিক

তামা
পাহাড়ের
ঠাকরুন

বার আমাদের খনির দুজন লোক গিয়েছিল জমির ঘাস দেখতে। জমিটা ছিল বেশ খানিক দূরে। সেভেরুশ্কার ওপারে কোথাও।

ছুটির দিন, গরম কী। বর্ষার পর যেরকম ভালো আবহাওয়া হয় সেই ধাঁচের। দুজনেই তারা কাজ করত গুমেশ্কি খনিতে। মালাকাইট তুলত আর এক ধরনের নীল পাথর, আর কখনো তামার তাল আর এটা-ওটা যা মিলত।

তাদের একজন ছোকরা মতো, তখনো বিয়ে করে নি। তাহলেও চোখদুটো সবজেটে হতে শুরু করেছে। অন্য জনের বয়েস বেশী, খেটে খেটে শরীর ভেঙেছে। চোখদুটো সবুজ, গালও যেন সবুজ। কাশি তার থামেই না।

বনের মধ্যে ভারি আরাম। মনের আনন্দে পাখি গাইছে, ভাপ উঠছে, বাতাসও হালকা। দুজনেই, জানো তো, হয়রান হয়ে উঠেছিল। পৌঁছল ক্রাস্নগোর্স্ক খনির কাছে। সেখান থেকে লোকে তখন তুলত আকর লোহা। তা, সেখানে রোয়ান গাছের তলায় ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল, আর শুতেই ঘুম। হঠাৎ জেগে উঠল ছোকরা — যেন কেউ খোঁচা মেরেছে। দেখে কি, সামনেই বড় একটা পাথরের পাশে আকর স্তূপের উপর কে একজন মেয়ে বসে আছে। তার দিকে পিছন ফিরে, তবে তার বিনুনি দেখে বোঝা যায় কুমারী মেয়ে। বিনুনিটি তার কুচকুচে কালো, আমাদের দেশের কুমারীদের বিনুনির মতো তা লটপট করছে না, ঠিক যেন পিটে সেঁটে দেওয়া। বিনুনির ডাগায় লাল না সবুজ কী একটা ফিতে, ভিতর দিয়ে আলো জ্বলজ্বল করছে, আর ঝুনঝুন করে বাজছে, যেন তামার পাতলা পাত। বিনুনি দেখে ছোকরা অবাক, তারপর সব নজর করে দেখে। খুব লম্বা নয় মেয়েটি, গড়নটি সুন্দর, কিন্তু এমন ছটফটে যে এক মিনিটও স্থির থাকতে পারে

না। একবার ঝু্ঁকে পড়ে সামনে, যেন পায়ের তলায় কোনো-কিছু খুঁজছে, তারপর আবার পিছনে হেলে বসে, একবার এপাশে ঝু্ঁকে, একবার ওপাশে। কখনো লাফিয়ে উঠে হাত নাড়ায়, তারপর আবার ঝু্ঁকে পড়ে। যেন পারা। কানে আসে, কী যেন বকবক করছে। কিন্তু কী ভাষা কে জানে। কার সঙ্গে কথা কইছে তাকেও দেখা যায় না। আর সারাক্ষণ কেবল হাসি। বোঝা যায় ফুর্তিতে আছে।

ছেলেটি কথা কইতে যাবে, হঠাৎ যেন মাথায় বাড়ি পড়ল:

'কী কাণ্ড, এ যে স্বয়ং ঠাকরুন! ঐ তো তার পোষাক। সঙ্গে সঙ্গেই কেন নজর করি নি? বিনুনির দিকেই শুধু তাকিয়েছিলাম।'

পোষাক তার সত্যিই এমন যে দুনিয়ায় দেখা যাবে না। রেশমী মালাকাইটের পোষাক, জানো তো, মাঝে মাঝে যা চোখে পড়ে। এমনিতে পাথর, কিন্তু দেখে মনে হয় যেন রেশম, ইচ্ছে হয় হাত বোলাতে।

ছেলেটি ভাবল, 'দ্যাখো দিকি কী বিপদ! ঠাকরুনের চোখে পড়ার আগেই পালাবো কী করে?..' বুড়োদের কাছে ও যে শুনেছিল এই ঠাকরুন, 'মালাকাইট-কুমারী' লোকের সঙ্গে চালাকি খেলতে ভালোবাসে।

কথাটা ভাবতেই ঠাকরুনও ফিরে চাইল। তাকিয়ে থাকে খুসিভরা চোখে, হাসে, ঠাট্টা করে বলে:

'কী গো স্তেপান, কুমারী মেয়ের এমনিতেই রূপ গিলছ? রূপ দেখলে যে টাকা দিতে হয়। কাছে এসো-না, গল্প করা যাক।'

ছেলেটি ভয় পেল বৈকি, কিন্তু দেখাল না। সাহস করে দাঁড়াল। মেয়েটি অপদেবতা হলেও মেয়ে তো। আর সে যে ছেলে, কুমারী মেয়ের সামনে ভীরুতা দেখাতে তার লজ্জা হল।

ছেলেটি বলল, 'গল্প করার সময় নেই। এমনিতেই বহুক্ষণ ঘুমিয়েছি। অথচ ঘাস দেখতে এসেছিলাম।'

মেয়েটি খিলখিলিয়ে হাসে, তারপর উঠে বলে:

'ঢঙ রাখো। বলছি, এসো-না, কাজ আছে।'

তা ছেলেটি দেখল উপায় নেই। এগিয়ে গেল সে। মেয়েটি তাকে হাত দিয়ে দেখায়, আকর স্তূপ ঘুরে অন্য পাশ দিয়ে এসো। ঘুরে গিয়ে সে দেখে এক গাদা

গিরগিটি, গোণা যায় না। সবগ্লোই, জানো তো, আলাদা আলাদা, — যেমন, কোনোটা সব্জ, কোনোটা ফিকে নীল, এমন কি গাঢ় নীল। কেউ কেউ মাটি বা বালি রঙের, মাঝে মাঝে সোনালী ছিটে। কতকগ্লো জব্লজব্ল করছে, যেন কাঁচ কি অভ্র, কেউ কেউ আবার ঘাসের মতো ম্যাড়মেড়ে। কার্র গায়ে আবার নানা ধরনের নক্সা।

মেয়েটি হাসে আর বলে:

'আমার সৈন্যসামন্তদের মাড়িয়ো না, স্তেপান। দেখো, তুমি যেরকম লম্বা আর ভারি, আর আমার এগ্লো নেহাৎ ছোট ছোট।' বলে মেয়েটি হাততালি দিল, সঙ্গে সঙ্গে সব গিরগিটি এদিক-ওদিক ছ্টে পালিয়ে তার যাবার পথ করে দিল।

তা ছোকরা গিয়ে মেয়েটির কাছে দাঁড়াল। মেয়েটি আবার দিল হাততালি, একেবারে হেসে ল্টোপ্টি হয়ে রইল:

'এবার তোমার আর পা ফেলার জায়গা নেই। আমার চাকরদের মাড়ালে কিন্তু বিপদে পড়বে।'

পায়ের দিকে তাকাল ছেলেটি, মাটি দেখাই যায় না। সব গিরগিটি গিজগিজ করছে একটা জায়গায়, পায়ের নীচে যেন নক্সা-কাটা মেঝে। তাকিয়ে দেখে স্তেপান — আরে, এ তো আকর তামা! নানা ধরনের স্ন্দর পালিশ-করা তামা। অভ্রও রয়েছে আর দস্তা, কত রকমের ছটা, কোনোটা আবার মালাকাইটের মতো।

'এবার চিনলে তো, স্তেপান? আমি কে?' এই বলে মালাকাইট-কুমারী হাসিতে ল্টিয়ে পড়ে। তারপর একটু থেমে বলে:

'ভয় পেয়ো না। কোনো ক্ষতি করব না তোমার।'

একটি মেয়ে তাকে নিয়ে হাসছে আবার ওধরনের কথা বলছে বলে ছেলেটির অভিমান হল। ভয়ানক রেগে গলা চড়াল:

'আমি খনিতে কাজ করি, কাকে আমার ভয়!'

মালাকাইট-কুমারী বলল, 'এই তো দিব্যি কথা। এমনি লোকই আমার চাই, কাউকে যে ভয় করে না। কাল খনিতে যাবার সময় তোমাদের গোমস্তা থাকবে সেখানে। তাকে বলো, তবে দেখো, কথাগ্লো যেন ভুল না হয়। বলবে, ওরে বোটকা পাঁঠা, তামা পাহাড়ের ঠাকর্ন তোকে বলেছে ক্রাস্নগোর্স্ক খনি থেকে দ্র

হতে। এখনো যদি আমার লোহার টুপি ভাঙতে থাকিস, তাহলে গুমেশ্কির সমস্ত তামা এতো নীচে তলিয়ে দেব যে তার পাত্তা পাবি না।'

বলে মেয়েটি তার দিকে চোখ কোঁচকাল:

'বুঝলে, স্তেপান? খনিতে খাটো বলছ, কাকেও ভয় করো না। বেশ, তাহলে গোমস্তাকে বলবে আমার হুকুম। এখন যাও তোমার সঙ্গীর কাছে, কিন্তু দেখো, একটা কথাও যেন তাকে বলো না। একেবারে কাহিল লোক, ওকে ভয় পাইয়ে এ ব্যাপারে জড়িয়ে লাভ কী। আমার একটি গিরগিটিকে বলেছি ওকে কিছু সাহায্য করতে।'

মেয়েটি আবার হাততালি দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল গিরগিটিগুলো। নিজেও সে লাফিয়ে উঠল, হাত দিয়ে পাথর ঠেলে নিজেও গিরগিটির মতো শুরু করল দৌড়তে। হাত-পায়ের বদলে দেখা গেল সবুজ থাবা। ল্যাজ গজাল তার আর একটা কালো ডোরা ফুটে উঠল পিঠের মাঝামাঝি। কিন্তু তখনো মুখটা মানুষের মতো। চূড়ার উপর দৌড়ে উঠে সে ফিরে তাকিয়ে বলল:

'স্তেপান, যা বললাম, ভুলো না। ওরে বোটকা পাঁঠা, হুকুম দিয়েছে ক্রাস্নগোরকা থেকে দূর হতে... আমার কথা মতো কাজ করলে বিয়ে করব তোমায়।'

রেগে ছেলেটি থুথু ফেলল:

'ওয়াক থু — শালী কোথাকার! আমি কিনা বিয়ে করব একটা গিরগিটিকে!'

তা দেখে মেয়েটি হি-হি করে হাসে।

চেঁচিয়ে বলে, 'যাক গে, পরে কথা বলা যাবে। হয়তো মত দেবে?'

বলেই সবুজ ল্যাজ ঝলকিয়ে পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হল।

ছেলেটি পড়ে রইল একা। চারিদিক ভারি শান্ত। শুধু কানে আসে আকর স্তূপের ওপাশে তার সঙ্গীর নাক-ডাকার শব্দ। তার ঘুম ভাঙিয়ে দুজনে গেল তাদের মাঠে ঘাস দেখতে। ফিরল সন্ধেয়। স্তেপানের মাথায় কিন্তু কেবল এক চিন্তা: কী করবে? গোমস্তাকে ওকথা বলা চারটিখানি কথা নয়। তাতে আবার সত্যিই লোকটার গা দিয়ে বোটকা গন্ধ ছাড়ে। লোকে বলে তার পেটের ভিতরে কী যেন পচতে শুরু করেছে। যদি না বলে, সেটাও ভয়ের ব্যাপার। হাজার হলেও তো সে ঠাকরুন। যেকোনো ভালো পাথরকেই সে ঝামা বানিয়ে দিতে পারে। কাজটা কিন্তু

সে তাহলে করবে কী করে? সবচেয়ে বড় কথা, একটা মেয়ে তাকে হামবড়া ভাববে, এটা লজ্জার কথা।

ভাবতে ভাবতে তার সাহস হল:

'যা হবার হবে, যা বলেছে তাই করব।'

পরের দিন সকালে সবাই যখন ডুলির কাছে জুটেছে, গোমস্তা এগিয়ে এল। সবাই মাথার টুপি যেমন খুলতে হয় খুলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। স্তেপান কিন্তু এগিয়ে গিয়ে বলল:

'কাল তামা পাহাড়ের ঠাকরুনকে দেখেছি। সে তোমাকে বলতে বলেছে, ওরে বোটকা পাঁঠা, ক্রাস্নগোরকা থেকে দূর হয়ে যা। বলেছে, এই লোহার টুপি নষ্ট করলে গুমেশ্‌কির সমস্ত তামা এত নীচে তলিয়ে দেবে যে কেউ নাগাল পাবে না।'

রাগে গোমস্তার গোঁফ পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

'কী বললি, মাতাল না পাগল হয়েছিস? ঠাকরুন আবার কে? কার সঙ্গে কথা কইছিস? তোকে — খনির মধ্যে তোকে পচিয়ে মারব!'

স্তেপান বলল, 'সে তোমার যা ইচ্ছে। তবে ঠাকরুন আমাকে এই কথা বলতে বলেছে।'

গোমস্তা চিৎকার করে উঠল, 'চাবুক মারো! পাঠাও খনির মধ্যে! কাজের জায়গায় রাখো শিকল দিয়ে বেঁধে। যাতে টেঁসে না যায় খেতে দেবে কুকুরদের জই। দয়ামায়া না করে পুরো কাজ ওর ঘাড়ে চাপাবে। একটু এদিক-ওদিক করলে কষে মারো!'

তা ছেলেটিকে চাবুক মেরে খনির মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হল। খনির কুলি-সর্দার — সেও কম ছুঁচো নয় — সবচেয়ে খারাপ কাজের জায়গায় লাগাল স্তেপানকে। জায়গাটা একে তো জলা। ভালো আকরও নেই, বহুকাল আগেই জায়গাটা বাতিল করা উচিত ছিল। সেইখানে তাকে তারা লম্বা একটা শিকল দিয়ে বাঁধল, মানে কাজ করতে যাতে পারে। জানোই তো সেকালের কথা, ভূমিদাস প্রথা। কী জুলুম চলত লোকের ওপর। কুলি-সর্দার তাকে বলল:

'এখানে একটু মাথা ঠাণ্ডা কর। আর তোর কাজ হবে একেবারে খাঁটি মালাকাইট তুলতে হবে — এতো এতো।' পরিমাণ যা দেখাল তা সব বুদ্ধি-বিবেচনার বাইরে।

কী আর করে। কুলি-সর্দার চলে যেতেই স্তেপান গাঁতি চালাতে লাগল। যতই হোক চটপটে কাজের ছেলে তো। তাকিয়ে দেখে, আরে ভারি খুসির ব্যাপার। ঝরঝর করে এত মালাকাইট বেরুচ্ছে, কেউ যেন দিচ্ছে ছুঁড়ে ছুঁড়ে। জলও কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে, একেবারে শুকনো হয়ে উঠেছে জায়গাটা।

ভাবল, 'এতো খুব ভালোই হল। বোঝা যাচ্ছে ঠাকরুন আমাকে ভোলে নি।'

এই কথা ভাবতেই ঝলসে উঠল আলো। দেখে, সামনেই স্বয়ং ঠাকরুন।

বলে, 'সাবাস, স্তেপান, নিজের জন্যে ইমান আছে তোমার। বোটকা পাঁঠাটাকে ভয় পাও নি। খুব ভালো বলেছ। এসো তবে আমার বিয়ের যৌতুক দেখতে। আমিও আমার কথা রাখি।'

ঠাকরুন নিজে কিন্তু ভুরু কোঁচকাল, যেন ব্যাপারটা বিশেষ পছন্দ করছে না। হাততালি দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে গিরগিটিগুলো দৌড়ে এসে স্তেপানের শেকল দিল খুলে। ঠাকরুন হুকুম দিল:

'দ্বিগুণ কাজ করে রাখো, আর দেখো যেন সবচেয়ে ভালো রেশমী মালাকাইট হয়।' তারপর স্তেপানকে বলল, 'তাহলে এসো, আমার ভাবী বর, আমার যৌতুক দেখবে।'

চলল তারা পাহাড়ে, আগে মেয়েটি, পিছনে স্তেপান। যে-দিকে মেয়েটি ফেরে, খুলে যায় সে-দিক। সেগুলো যেন মাটির তলার বড় বড় ঘর, আলাদা আলাদা তাদের দেয়াল। কোনোটা সব একেবারে সবুজ, কোনোটা-বা সোনালী ছিট-ধরা হলদে, কোনোটার ওপর তামার ফুল। নীল দেয়ালও ছিল, নীল পাথর দিয়ে তৈরি। মোট কথা এত সুন্দর যে, বলা যায় না। আর তার — ঐ ঠাকরুনের, পোষাকটাও চলেছে ক্রমাগত বদলে। কখনো জ্বলজ্বল করছে কাঁচের মতো, তারপরই হঠাৎ কেমন ম্যাড়মেড়ে। কখনো ঝলমলিয়ে উঠছে, যেন হীরে ছড়ানো, কখনো হয়ে উঠছে তামাটে লাল, তারপর আবার রেশমী সবুজের ঝিলিমিলি। যেতে যেতে শেষকালে থামল মেয়েটি।

বলল, 'এরপর বহু ক্রোশ জুড়ে কেবল হলদে আর ছিট-ছিট ছেয়ে পাথর। ও আর দেখে কী হবে? আর এই যে এইখানটা, এটা একেবারে ক্রাস্নগোরকার তলায়। গুমেশ্কির পরেই এই জায়গাটা সবচেয়ে ভালোবাসি।'

স্তেপান দেখল মস্তো একটা কামরা; তাতে পালঙ্ক, টেবিল, টুল, সবকিছুই খাঁটি তামার। দেয়াল মালাকাইটের। তাতে হীরে। ছাদ গাঢ় লাল রঙের, তাতে সামান্য কালোর ছোপ আর তামার ফুল।

মেয়েটি বলল, 'খানিক বসি এখানে, গল্প করা যাক।'

বসল তারা টুলে। মালাকাইট-কুমারী বলল:

'আমার যৌতুক তো দেখলে।'

'দেখলাম,' বলল স্তেপান।

'তাহলে, এবারে বিয়েটা?'

কী বলবে স্তেপান কিছু ভেবে পেল না। জানো তো, আগেই আর একটি মেয়েকে বিয়ে করবে বলে সে কথা দিয়েছিল। ভালো মেয়ে, অনাথা। তবে মালাকাইট-কুমারীর পাশে তার রূপ সে কিছুই না। সাধারণ মেয়ে, আটপৌরে। কুঁথিয়ে কুঁথিয়ে স্তেপান শেষ পর্যন্ত বলল:

'যৌতুক তোমার রাজার মতো, আর আমি মামুলী লোক, মজদুর।'

মেয়েটি বলল, 'আথালি-পাথালি করো না, বাপু। পরিষ্কার করে বলো আমায় বিয়ে করবে কিনা?' বলে ভয়ানক ভ্রূকুটি করল।

তা স্তেপানও সোজাসুজি বলল:

'বিয়ে করতে পারব না, কেননা আরেক জনকে কথা দিয়েছি।'

বলল তো, কিন্তু মনে মনে ভাবছে: এই বার ক্ষেপে উঠবে মেয়েটি। মেয়েটি কিন্তু যেন খুসিই হল।

বলল, 'সাবাস, স্তেপান। গোমস্তার ব্যাপারে তোমায় বাহবা দিয়েছিলাম, আর এর জন্যে দ্বিগুণ প্রশংসা। আমার ধনে তোমার লোভ হয় নি, শিলাকন্যার জন্যে ভাসিয়ে দাও নি তোমার নাস্তাসিয়াকে।' আর সত্যিই ছেলেটার কনের নাম ছিল নাস্তাসিয়া। মেয়েটি বলল, 'এই নাও, তোমার কনের জন্যে একটা উপহার।' মেয়েটি তাকে দিল একটি মালাকাইটের ঝাঁপি। আর কী বলব, তার ভিতরে সব রকমের মেয়েলী গয়না। আঙটি, দুল আরো কত কী, ধনী কনেরও যা হয় না।

স্তেপান জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু এ জিনিস নিয়ে এখান থেকে বেরুব কী করে?'

'কিছু ভেবো না। সবই ঠিক হবে। গোমস্তার হাত থেকেও তোমায় উদ্ধার

করব। নতুন বৌয়ের সঙ্গে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাবে। শুধু সাবধান — দেখো এর পরে আমার কথা কখনো ভাববে না। সেটাই আমার তৃতীয় পরীক্ষা। এবার এসো, কিছু খাওয়া যাক।'

হাততালি দিল মেয়েটি, আবার দৌড়ে এল গিরগিটিগুলো, টেবিল ভরে খাবার সাজাল। মেয়েটি তাকে খাওয়াল বাঁধাকপির চমৎকার সুপ, মাছের পুর-দেওয়া পিঠে, ভেড়ার মাংস, জাউ, রুশী কেতায় যা-যা দরকার, সব। খাওয়া শেষ হলে মেয়েটি বললে:

'তাহলে এখন বিদায়, স্তেপান। দেখো আমার কথা যেন ভেবো না।' ওদিকে নিজের চোখেই তার জল। হাত পাতল সে, টপ্‌টপ্‌ করে তার চোখের জল হাতের উপর পড়ে শক্ত হয়ে উঠল দানার মতো, একেবারে এক আঁজলা। 'এই নাও, তোমার ধন-দৌলৎ। পাথরগুলোর অনেক দাম। বড়লোক হয়ে যাবে,' বলে সেগুলো তাকে দিয়ে দিল মেয়েটি।

পাথরগুলো ঠাণ্ডা, কিন্তু হাতটা তার, কী বলব, গরম, যেন জীবন্ত, সামান্য কাঁপছে।

স্তেপান পাথরগুলো নিয়ে নীচু হয়ে কুর্ণিশ করে বলল:

'কোথায় যাব?' তার মনও ভারি হয়ে উঠেছে। মেয়েটি আঙুল দেখাল। সামনে তার সুড়ঙ্গের মতো পথ খুলে গেল। দিনের মতো তাতে আলো। সেই পথ ধরে চলল স্তেপান। ফের মাটির তলার সব ধনসম্পদ দেখল, তারপর পেঁছিল তার কাজের জায়গায়। পেঁছতেই সুড়ঙ্গ বন্ধ হয়ে গেল আর সবকিছুই হয়ে উঠল আগেকার মতো। একটা গিরগিটি ছুটে এসে তার পায়ে শিকল পরিয়ে দিল। গয়নার ঝাঁপিটা হঠাৎ ছোট হয়ে গেল, স্তেপানও সেটাকে তার জামার তলে লুকিয়ে ফেলল। অল্প পরেই কুলি-সর্দার এল তাকে টিটকারি দেবার জন্যে। কিন্তু দেখে কি — স্তেপান কাজ তুলেছে তার বরাদ্দের অনেক বেশী। বাছাই-করা সব মালাকাইট। ভাবল: 'এ আবার কী, কোথা থেকে এল এগুলো?' খনিতে নেমে এসে সে সব দেখেশুনে বলল:

'এ জায়গাটা থেকে যা ইচ্ছে তাই পাওয়া যায় দেখছি।' স্তেপানকে তাই অন্য একটা জায়গায় পাঠিয়ে স্তেপানের জায়গায় বহাল করল নিজের ভাইপোকে।

পরের দিন স্তেপান কাজ শুরু করল, আবার অবিরাম ধারায় ঝরে পড়তে লাগল মালাকাইট, তামার তালও মিলতে লাগল; কিন্তু সেই ভাইপো, হে ভগবান, — সে পেল শুধু পাথর আর ঝামা। কুলি-সর্দার তো হুলস্থূল লাগাল। ছুটল গোমস্তার কাছে! বটে! বটে!

বলল, 'এ না হয়ে যায় না, স্তেপান তার আত্মা বিক্রি করেছে শয়তানের কাছে।'

গোমস্তা তা শুনে বলে:

'যার কাছে বিক্রি করুক সেটা ওর ব্যাপার। আমাদের দরকার ফয়দা ওঠানো। তাকে বলো, একশো মন মালাকাইটের চাবড়া তুলতে পারলে মুক্তি পাবে।'

গোমস্তা তাহলেও স্তেপানের শিকল খুলতে হুকুম দিল — ক্রাস্নগোরকায় সব কাজ বন্ধ।

বলল, 'কে জানে, বাপু, বোকাটা হয়তো সত্যি কথাই বলেছিল। আকরের সঙ্গে তামা মিশছে, শুধু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে লোহা।'

স্তেপানকে কুলি-সর্দার গোমস্তার কথা জানাল। স্তেপান বলল:

'কে না মুক্তি চায়? চেষ্টা করব, তবে পারব কিনা, সে আমার বরাত।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই তেমন একটা চাঙ্গড় বার করল স্তেপান। ঠেলাঠেলি করে তা ওপরে তোলা হল। সেটা নিয়ে ওদের কী গরব: দেখো, কী পেয়েছি। স্তেপানকে কিন্তু মুক্তি দিল না। ব্যাপারটা তারা জানাল বাবুকে। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে, জানো তো, তিনি এলেন। সব কথা শুনে স্তেপানকে তলব করলেন।

বললেন, 'ভদ্রলোকের কথা দিচ্ছি, অন্তত বিশ হাত লম্বা লম্বা থাম করার মতো মালাকাইট বার করতে পারলে তোকে মুক্তি দেব।'

স্তেপান বলল:

'আগেই একবার ঠকেছি। এখন চৈতন্য হয়েছে। প্রথমে ছাড়পত্র লিখে দাও, তারপর চেষ্টা করে দেখব কী হয়।'

বাবু অবশ্য পা ঠুকে তাকে গালাগালি করে চললেন, স্তেপান কিন্তু তার গোঁ ছাড়ে না:

'ভালো কথা, ভুলেই গিয়েছিলাম — আমার কনের জন্যেও মুক্তিপত্র লিখে দাও, নইলে সে আবার কী ব্যবস্থা, আমি স্বাধীন আর বৌ থাকবে বাঁদী।'

বাবু দেখলেন স্তেপানকে কিছুতেই বাগ মানান যাবে না, তাই তিনি দলিল সই করে দিলেন।

বললেন, 'এই নে, কিন্তু দেখিস, প্রাণপণ চেষ্টা করবি।'

স্তেপানের কিন্তু এক কথা:

'সে আমার কপাল।'

সেটা অবশ্য সে পেল। ওর আর কী, পাহাড়টার সবকিছুই যে তার জানা আর স্বয়ং ঠাকরুন তার সাহায্যে। চাঙ্গড় থেকে যেমন দরকার তেমনি সব থাম কুঁদে বার করল, টেনে তুলল উপরে। উপহার হিসেবে বাবু সেগুলো সেণ্ট পিটার্সবুর্গের সবচেয়ে বড় গির্জেয় পাঠালেন। লোকে বলে স্তেপান যে চাঙ্গড়টা প্রথম পেয়েছিল এখনো সেটা আমাদের শহরে আছে। সেটা রেখে দিয়েছে দুষ্প্রাপ্য বস্তু হিসেবে।

তারপর স্তেপান মুক্তি পেল। আর গুমেশ্‌কির সমস্ত দৌলতও সব যেন মিলিয়ে গেল। নীল পাথর বেরত কম, বেশীর ভাগই ঝামা। তামার তালের কথা তো শোনাই যায় না। মালাকাইটও ফুরিয়ে গেল। জল উঠতে লাগল। সেই থেকে গুমেশ্‌কির পতন, তারপর তো একেবারেই ভরে গেল জলে। লোকে বলত ঠাকরুন থামগুলোর জন্যে রেগে গেছে, জানো তো, সেগুলো যে রাখা হয়েছে গির্জেয়। সেটা ঠাকরুনের মোটেই দরকার নেই।

স্তেপানের জীবনও সুখের হয় নি। বিয়ে করে সে, সংসার পাতে, বাড়ীও তোলে, সবকিছুই যেমন দরকার। এবার দিব্যি আনন্দ করে জীবন কাটালেই হয়। সে কিন্তু মনমরা হয়ে উঠল, স্বাস্থ্য গেল। দেখতে দেখতেই শুকিয়ে উঠছিল।

এদিকে অসুস্থ, অথচ শিকারে যাওয়া ছাড়ত না। গাদা বন্দুকটা নিয়ে কোথায় যেত, জানো তো, কেবলি ক্রাস্নগোর্স্ক খনিতে, কিন্তু বাড়ীতে কখনোই কোনো শিকার নিয়ে আসত না। তারপর এক শরৎকালে সে বেরুল, আর সেই শেষ। নেই, তো নেই!.. গেল কোথায়? লোক ডেকে-ডুকে খোঁজা শুরু হল। আর সে ওদিকে খনির মস্তো এক পাথরের ওপর মরে পড়ে আছে। মুখে যেন হাসি, বন্দুকটা পাশে, একটা গুলিও ছোঁড়া হয় নি তা থেকে। প্রথম যারা ছুটে যায় তারা বলে একটা সবুজ গিরগিটিকে তার পাশে দেখেছিল — এতো বড় যে আমাদের দেশে কোথাও তা দেখা যায় না। যেন মড়ার পাশে বসে আছে, মাথা তুলছে, চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌

করে ঝরে পড়ছিল জল। কিন্তু লোকে কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা পাথরের পিছনে অদৃশ্য হয়ে যায়। স্তেপানকে বাড়ীতে এনে কফিনে শোয়াবার সময় লোকে দেখে তার একটা হাত মুঠো-করা, তার ভিতর দিয়ে সবুজ কী দানা দেখা যায় — পুরো একমুঠো। তাদের মধ্যে একজন ওয়াকিবহাল লোক ছিল। একদৃষ্টে দেখে সে বলে:

'আরে, এগুলো যে তামার পান্না! দুষ্প্রাপ্য পাথর, সাতরাজার ধন এক মানিকের মতো। তোমার জন্যে এক অসীম সম্পত্তি ও রেখে গেছে, নাস্তাসিয়া। কোথা থেকে ওগুলো পেল?'

নাস্তাসিয়া, স্তেপানের বৌ আর কি, বলে, পাথর-টাথরের কথা সে কখনো বলে নি। বিয়ের আগে মালাকাইটের ঝাঁপিটা স্তেপান দিয়েছিল তাকে। তার মধ্যে ছিল বহু গয়নাপাতি, কিন্তু এধরনের পাথর তো নয়। এ সে দেখে নি।

স্তেপানের মৃত হাতের ভিতর থেকে তারা পাথরগুলো বার করতে শুরু করল, আর তা গুঁড়িয়ে যেতে লাগল ধুলো হয়ে। কোত্থেকে তা স্তেপান পেল, কেউ তখন জানত না। লোকে ক্রাস্নগোরকা খোঁড়াখুঁড়ি করে দেখল। কিন্তু পেল শুধু বাদামী বাদামী আকরিক, তাতে তামার ঝিলিক। তারপর কে একজন বার করল যে স্তেপানের হাতে ছিল তামা পাহাড়ের ঠাকরুনের চোখের জল। আরে শোনো, শোনো, কাউকেই সে তা বিক্রী করে নি, নিজের লোকদের কাছ থেকেও লুকিয়ে রেখেছিল, মরেও ওই নিয়ে। দেখেছ?

দ্যাখো, কেমন তামা পাহাড়ের ঠাকরুন!

তার দেখা পেলে খারাপ লোকের কপালে বিপদ, ভালো লোকের কপালেও সুখ কিছু নেই।

মালাকাইটের ঝাঁপি

স্তেপানের বিধবা বৌ নাস্তাসিয়া পেয়েছিল মালাকাইটের সেই ঝাঁপিটা। ভিতরে নানা ধরনের মেয়েলী গয়না। আঙটি, দুল, আরো কত কী। স্তেপান বিয়ে করার আগে তামা পাহাড়ের ঠাকরুন নিজে সেটা তাকে দিয়েছিল।

অনাথ অবস্থায় নাস্তাসিয়া মানুষ তো। এধরনের দামী জিনিসে অভ্যস্ত নয়। সাজগোজে তেমন ঝোঁক ছিল না। স্তেপান বেঁচে থাকতে প্রথমদিকে মাঝে মাঝে এটা-ওটা পরেছে। কিন্তু কখনো স্বস্তি পেত না। হয়তো একটা আঙটি পরল, একেবারে মাপসই, তোমার আঁটও নয় ঢিলেও নয়। গির্জেয় বা নেমন্তন্নে যাবে, কিন্তু পরে বড় কষ্ট পেত, আঙুল উঠত টনটন করে, যেন কেউ চিমটি কেটেছে। আঙুলের ডগাটা পর্যন্ত উঠত নীল হয়ে। দুল পরলে তো আরো খারাপ। কান ধরে যেন ক্রমাগত টানত, শেষ পর্যন্ত কানের লতি উঠত ফুলে। কিন্তু হাতে নিলে কখনোই মনে হত না যে-দুল সব সময় পরে তার চেয়ে ভারি। ছ’-সাতনরী হারটা সে শুধু পরে দেখতে গিয়েছিল। গলায় ঠেকল যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা, গরম আর হয় না। লোককে ওটা একেবারেই দেখায় নি, — লজ্জা হয়েছিল।

লোকে বলবে, ‘ইস, ভারি এক রাজরানী পোলেভায়ায় এসেছেন!’

স্তেপানও তাকে ওসব পরাতে চেষ্টা করে নি। এমন কি একবার বলে:

‘তুলে রাখো, নয়তো বিপদ ঘটতে পারে।’

নাস্তাসিয়া তাই ঝাঁপিটা রাখে তার সবচেয়ে তলার তাকে — দুর্দিনের জন্যে যেটায় এটা-ওটা জমিয়ে রাখত। রাখত হাতে-বোনা ধরনের জিনিসপত্তর।

তা স্তেপান যখন মারা গেল, তার মুঠোয় ঐসব পাথর দেখা গেল, নাস্তাসিয়াকে তখন তার ঝাঁপিটা লোককে দেখাতে হল। কিন্তু ওয়াকিবহাল যে-লোকটা স্তেপানের পাথরগুলোর কথা বলেছিল, লোকজন চলে গেলে নাস্তাসিয়াকে সে বলে:

'দেখো, ঐ ঝাঁপিটা যেন কম দামে বিক্রি করো না। ওটার দাম অনেক হাজার টাকা।'

লোকটা লেখাপড়া জানত, স্বাধীনও ছিল সে। এক সময় খনিতে সর্দারের কাজও করত, কিন্তু বরখাস্ত হয়। অধীনস্থ লোকদের উপর একেবারেই সে হম্বিতম্বি করত না। মদ খেতেও ভালোবাসত। সবসময় সে থাকত শুঁড়িখানায় পড়ে, তবে মারা গেছে — ওসব কথা না বলাই ভালো। কিন্তু এছাড়া আর সব বিষয়েই সে ছিল একেবারে খাঁটি মানুষ। দরখাস্ত লেখা... সবই করত বিবেক মেনে, অন্যের মতো নয়। শুধু একটু মদ পেলেই হত। পরবের দিনে আমাদের খনির লোকেরা তাকে এক গেলাশ করে পানীয় দিয়ে যেত। যতদিন না মারা যায় ততদিন আমাদের খনিতে সে এইভাবে দিন কাটায়। লোকেরা তাকে খাওয়াত।

নাস্তাসিয়া স্বামীর কাছে শুনেছিল সর্দার ভালো লোক, তার বুদ্ধিও আছে। তার একমাত্র দোষ মদ খাওয়া। তাই নাস্তাসিয়া সর্দারের কথা শোনে আর বলে:

'বেশ, দুর্দিনের জন্যেই তুলে রাখব।' আগে যেখানে রাখত সেখানে ঝাঁপিটা তুলে রাখল।

স্তেপানকে কবর দেবার পর চল্লিশ দিন ধরে বিধিমতো শোক করা হয়। নাস্তাসিয়া সুন্দরী, অবস্থাও ভালো, তাই এর মধ্যেই ঘটক আসা শুরু হল। কিন্তু নাস্তাসিয়া বুদ্ধিমতী তো — সবাইকেই এক কথা:

'দ্বিতীয় স্বামী সোনার মতো খাঁটি হতে পারে, কিন্তু তাহলেও ছেলেমেয়ের সে হবে সৎ-বাবা।'

তাই কিছুদিন পরে কেউ আর তাকে বিরক্ত করল না।

আগেই বলেছি স্তেপান তার পরিবারের ভালো সংস্থান করে গিয়েছিল। বাড়ীখান ভালো, ঘোড়া আর গরু, দরকারী সবকিছু আছে। নাস্তাসিয়া খুব খাটিয়ে মেয়ে ছেলেমেয়েরাও ভালো আর বাধ্য। তাই দুর্ভাবনার কোনো কারণ ছিল না। কিন্ত এক বছর যায়, দু'বছর যায়, তিন বছর যায়, তা অবস্থা পড়ে গেল। ছোট ছেলেমে

নিয়ে একলা মেয়ে সত্যিকারের ভালো করে খামার চালাবে কোথেকে! নগদ পয়সা কড়িও তো দরকার। ধরো এই নুনটার জন্যেই। স্তেপানের আত্মীয়স্বজনরা নাস্তাসিয়ার কানে গুজগুজ করে:

'ঝাঁপিটা বিক্রি করে দাও। রেখে লাভ কী? জহরতগুলো খামকা পড়ে রয়েছে। তানুশ্‌কা তো কোনো দিন ওগুলো পরবে না। দামী দামী কী সব জিনিস! কেবল জমিদার আর ব্যবসাদার কিনতে পারে। ছেঁড়া জামাকাপড়ের উপর তো আর পরা যায় না। বিক্রি করলে টাকা পাবে। তাতে তোমার খানিকটা সুরাহা হবে।'

মানে, এইসব বোঝায়, কাকের দল যেমন একটুকরো হাড়ের উপর ভিড় করে আসে তেমনি ঝাঁকে ঝাঁকে এল খদ্দের। সবাই বেনিয়া। কেউ একশো রুবল হাঁকে, কেউ দু'শো।

বলে, 'তোমার ছেলেমেয়েদের জন্যে আমাদের দুঃখ হয়। তুমি গরীব বিধবা, তাই তোমাকে দয়া করছি।'

ভেবেছিল এক গেঁয়ো মেয়েকে বুঝি ঠকাতে পারবে। কিন্তু সেটি হল না।

সেই বুড়ো সর্দারের কথাটা নাস্তাসিয়ার মনে ছিল — ঝাঁপিটা যেন কম দামে বিক্রি না করা হয়। তাছাড়া সেটা বিক্রি করতেও তার মন উঠছিল না। হাজার হলেও সেটা তো স্তেপানের উপহার, তার মৃত স্বামীর। আর তার ছোট্ট মেয়েটির কথাও ভাবতে হয়। সে বায়না ধরে কেঁদে বলত:

'মা, ওটা বিক্রি করো না! বিক্রি করো না, লক্ষ্মী মামণি! আমি বরং চাকরানীর কাজও করব, কিন্তু বাবার কথা ভেবে ওটা রাখো!'

স্তেপান রেখে যায় তিনটি ছেলেমেয়ে। দুটি ছেলে, যেকোনো সাধারণ ছেলেদের মতোই। কিন্তু মেয়েটি তার বাবা কিম্বা মা'র — কারুর মতোই নয়। স্তেপান যখন বেঁচে ছিল আর সে নেহাৎ কচি, তাকে দেখে লোকে অবাক হয়ে যেত। শুধু মেয়ে আর গিন্নির দলই নয়, পুরুষরাও। তারা বলত:

'স্তেপান, ও যে আমাদের চাষাভুষা নয়! কার মতো দেখতে ওকে? অত চমৎকার চেহারা, কালো চুল, আর তার উপর ঐ সবুজ চোখ! এখানকার কোনো মেয়ের মতোই নয়।'

ঠাট্টা করে স্তেপান কথাটা উড়িয়ে দিত:

‘ওর চুল যে কালো, তা নিয়ে অবাক হবার কিছু নেই। ছেলেবেলা থেকেই তার বাবাকে অন্ধকার খনিতে কাজ করতে হয়েছে। আর সবুজ চোখ — সেটা নিয়েও অবাক হবার কিছু নেই, আমাদের তুর্চানিনভ জমিদারবাবুর জন্যে মালাকাইট তো কম তুলি নি। সে স্মৃতিটা থেকে গেল।’

সে তার নাম দিয়েছিল ‘স্মৃতি’; তাকে ডাকতে হলে বলত: ‘এখানে আয়, আমার ছোট্ট ‘স্মৃতি’!’ তার জন্যে সব সময়েই সে কিনত সবুজ বা নীল রঙের জিনিস।

মেয়েটি বড় হতে লাগল, সবাইকার নজরে পড়ল সে। যেন এক ঝলমলে নেকলেস থেকে খসে পড়া জ্বলজ্বলে একটি পাথর — দূর থেকে দেখা যায়। লোকেদের সঙ্গে ভাব জমাবার মতো শিশু সে নয়। তবু সবারই মুখে কেবল ‘তান্যুশ্‌কা আর তান্যুশ্‌কা’। এমন কি হিংসুটে মাগীরাও তাকে দেখত মুগ্ধ হয়ে। বাস্তবিকই সুন্দরী! শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলত তার মা:

‘সুন্দরী, তা সুন্দরী বটে, তবে আমাদের ঘরের নয়। কেউ যেন ওকে হাতসাফাই করে দিয়ে গেছে।’

স্তেপানের মৃত্যুর পর মেয়েটি দারুণ মুষড়ে পড়ল। রোগা হয়ে উঠতে লাগল সে, মনে হত যেন সর্বকিছু ক্ষয়ে যাবার পর শুধু তার চোখদুটিই বাকি আছে। তাই একদিন মা তার মন ভালো করার জন্যে জিনিস ভর্তি সেই মালাকাইট ঝাঁপিটা তাকে দেখতে দিল। নেহাৎ শিশু হলেও সে তো মেয়ে, আর ছোট বেলা থেকে মেয়েরা সাজতে ভালোবাসে। তান্যুশ্‌কা পরে দেখতে লাগল এটা-ওটা। অবাক কাণ্ড, যেটাই পরে মনে হয় বুঝি সেটাই তার জন্যে ফরমাশ দিয়ে তৈরি। এমন কতকগুলো জিনিস ছিল যেগুলো তার মাও জানত না কিসের জন্যে — কিন্তু মনে হল মেয়েটি সবকিছুই জানে। এটাই সব নয়। সে ক্রমাগত বলে যেত:

‘মামণি, বাবার উপহার পরে আমার ভারি ভালো লাগছে। এগুলো এমন গরম যে মনে হয় বুঝি রোদে বসে আছি আর কেউ গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে খুব আস্তে আস্তে।’

নাস্তাসিয়া ওগুলো আগে পরেছিল। কখনো ভোলে নি কী রকম তার আঙুল ফুলে ওঠে, কান ব্যথা করে আর হারটা ছিল কী রকম বরফের মতো ঠাণ্ডা। ভাবল: ‘ব্যাপারটা তো ভালো ঠেকছে না, উঁহুঁ, ভালো ঠেকছে না!’ তাই আবার

সে সিন্দুকের মধ্যে ঝাঁপিটা তুলে রাখল। কিন্তু তারপর থেকে ক্রমাগতই তান্যুশ্‌কা বায়না ধরতে শুরু করল:

'মামণি, বাবার উপহারগুলো নিয়ে আমায় খেলতে দাও।'

নাস্তাসিয়া সেগুলো দিতে চাইত না, কিন্তু মা'র মন তো, তাই ঝাঁপিটা বার করে তাকে খেলতে দিয়ে সাবধান করে দিত:

'দেখিস, ভাঙিস না যেন!'

একটু বড় হবার পর তান্যুশ্‌কা নিজেই ঝাঁপি বার করত। নাস্তাসিয়া ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে যেত ফসল কাটা বা কোনো একটা কাজে। তান্যুশ্‌কাকে রেখে যেত ঘর-সংসারের কাজ করার জন্যে। প্রথমে অবশ্য তার মা যে-কাজ করতে বলত তা সে করে রাখত — যেমন, বাসনপত্র ধোয়া, টেবিল-ঢাকা ঝাড়া, ঝাঁট দেওয়া, মুরগিদের খাওয়ানো, আগুন ঠিকমতো জ্বলছে কিনা দেখা। তাড়াতাড়ি করে কাজগুলো সেরে সে বার করত ঝাঁপিটা। তখন শুধু তলার সিন্দুকের একটামাত্র সিন্দুক বাকি, সেটাও একেবারে ফাঁকা হয়ে এসেছে। তান্যুশ্‌কা তাই সেটা সহজেই একটা টুলের ওপর রেখে তলার সিন্দুক থেকে ঝাঁপি বার করতে পারত। তারপর গয়না বার করে পরে পরে দেখত।

একদিন এক ডাকাত এসে হাজির। হয়তো খুব ভোর থেকেই বাগানের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, হয়তো বাড়ীর মধ্যে ঢোকে চুপিচুপি, কারণ প্রতিবেশীরা কেউই তাকে পথে দেখে নি। অচেনা লোক, কিন্তু মনে হল কেউ যেন সবরকম সুলুকসন্ধান দিয়ে রেখেছে তাকে।

নাস্তাসিয়া বেরিয়ে যাবার পর তান্যুশ্‌কা সংসারের খানিকটা কাজকর্ম করল। তারপর বাড়ীতে ঢুকল ঝাঁপিটা নিয়ে খেলার জন্যে। জড়োয়া মুকুট আর দুল সে পরল। ঠিক সেই সময়ই ঘরে ঢুকল ডাকাতটা। তান্যুশ্‌কা দেখল চৌকাটে একটা অজানা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে তার একটা কুড়ুল। সেটা তান্যুশ্‌কাদেরই কুড়ুল, ছিল বাড়ীতে ঢোকবার জায়গাটায়। নিজেই ঝাঁট দেবার পরে কোণে সে রেখেছিল। রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল তান্যুশ্‌কা, বসে রইল আড়ষ্ট হয়ে। হঠাৎ চেঁচিয়ে লোকটা কিন্তু কুড়ুল ফেলে দু'হাত দিয়ে নিজের চোখ চেপে ধরল, যেন তা পুড়ে যাচ্ছে।

'ওঃ মাগো, চোখ গেল, হা ভগবান, অন্ধ হয়ে গেছি!' চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে আর্তনাদ করে চলল।

তান্যুশ্কা দেখল লোকটার কিছু একটা বিপদ ঘটেছে। প্রশ্ন করল:

'আমাদের বাড়ীতে ঢুকলে কী করে, কাকু, কুড়ুলটাই বা নিয়েছ কেন?'

লোকটা ওদিকে গোঙায় আর চোখ রগড়ায়। তান্যুশ্কার মায়া হল তার উপর। সে এক ঘটি জল এনে দিতে যাবে, লোকটা কিন্তু হাতড়ে হাতড়ে দরজার দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠল:

'এই আসবে না বলছি!' প্রবেশ পথে গিয়ে সে দরজা আগলে বসে রইল যাতে তান্যুশ্কা বেরুতে না পারে। তান্যুশ্কা কিন্তু জানালার ভিতর দিয়ে গলে ছুটে গেল পড়শীদের কাছে। তারা তান্যুশ্কার সঙ্গে এসে লোকটাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, সে কে আর কীই বা চায়। লোকটার তখন চোখ মিটমিট করছে, আবার দেখতে শুরু করেছে। বলল, যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে, আসে ভিক্ষে চাইতে। তারপর তার চোখে যেন কী হয়।

'যেন চোখের উপর সূর্য ঝলসে উঠেছে, মনে হল বুঝি অন্ধ হয়ে গেছি। হয়তো গরমের জন্যেই।'

তান্যুশ্কা কিন্তু পড়শীদের সেই কুড়ুল কিম্বা ঝাঁপিটার কথা বলে নি। তাই তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল:

'ব্যাপারটা আর কিছু নয়। হয়তো সে ফটক বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল, তাই লোকটা ভিতরে আসে। তারপর তার কিছু একটা হয়। কতকিছুই তো হতে পারে।'

তবু, নাস্তাসিয়া না আসা পর্যন্ত, লোকটাকে তারা আটকে রাখল। ছেলেদের সঙ্গে নাস্তাসিয়া ফেরার পর পড়শীদের কাছে লোকটা যে-কথা বলেছিল তাই আবার আওড়াল। নাস্তাসিয়া দেখল সব জিনিসই ঠিকঠাক রয়েছে, কিছুই চুরি যায় নি। তাই লোকটাকে নিয়ে সে আর মাথা ঘামাল না। লোকটা চলে গেল, পড়শীরাও।

তারপর তান্যুশ্কা তার মাকে জানায় ঠিক কী কী ঘটেছিল। নাস্তাসিয়া আঁচ করল লোকটা এসেছিল ঝাঁপিটা নিতে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটা চুরি করা সহজ নয়। ভাবল:

'যাই হোক, সাবধান হওয়াই ভালো।'

তান্যুশ্‌কা আর অন্য ছেলেদেরকে নাস্তাসিয়া কিছু না বলে মাটির তলার ভাঁড়ার ঘরে ঝাঁপিটা নিয়ে গিয়ে মাটি চাপা দিয়ে রাখল।

আবার তারা তান্যুশ্‌কাকে একা রেখে বেরুল। তান্যুশ্‌কা ঝাঁপি খুঁজতে গেল, কিন্তু সেটা উধাও। বাস্তবিকই মন খারাপ হয়ে গেল তান্যুশ্‌কার, কিন্তু হঠাৎ যেন তার গরম লাগতে লাগল। কী ব্যাপার? কোথা থেকে আসছে এই উত্তাপ? মুখ ফিরিয়ে দেখল মেঝের ফাটলের ভিতর থেকে একটা আলো আসছে। তাতে সে ভয় পেয়ে গেল — নীচের তলায় কিছুতে আগুন লাগল নাকি? ভাঁড়ার ঘরে নীচের দিকে সে তাকাল — হ্যাঁ তাই তো, একটা কোণ থেকে আলো আসছে। আগুন নেভাবার জন্যে সে নিয়ে এল এক বালতি জল, কিন্তু কোনোকিছুতে আগুন লেগেছে বলে দেখতে পেল না, ধোঁয়ার গন্ধও নেই। তাই সে যে আলগা মাটি থেকে আলো আসছিল সেটা সরাতেই দেখতে পেল ঝাঁপিটা। সেটা খুলতে পাথরগুলো যেন আগের চেয়েও সুন্দর দেখাল। নানা রঙে তা জ্বলজ্বল করছে, ভিতর থেকে ঠিকরে পড়ছে একটা আলো, সূর্যের আলোর মতো। তান্যুশ্‌কা ঝাঁপিটা ওপরের ঘরে আনল না। ক্লান্ত না হয়ে পড়া পর্যন্ত পাথরগুলো নিয়ে খেলল সেখানেই।

সেই দিন থেকে এই চলতে লাগল। মা ভাবল: 'আমি ঝাঁপিটা ভালো করে লুকিয়ে রেখেছি, সেটা কোথায় কেউ জানে না...' আর এদিকে তার মেয়ে একলা থাকলেই তার বাবার দেওয়া উপহার নিয়ে খেলত ঘণ্টাখানেক ধরে। সেগুলো বিক্রি করার কথা নাস্তাসিয়া কানেই তুলত না।

'রুটির জন্যে ভিক্ষে করার অবস্থা দাঁড়ালে তবেই এগুলো বিক্রি করব। তার আগে নয়।'

নাস্তাসিয়া খুব টানাটানির মধ্যে পড়ল, কিন্তু সেগুলো সে বিক্রি করল না। কয়েক বছর কষ্টেসৃষ্টে কাটাল, তারপর উন্নতি হল অবস্থার। বড় ছেলেরা সামান্য রোজগার করতে শুরু করল আর তান্যুশ্‌কাও শুধু শুধু বসে রইল না। জানো তো, রেশমের সুতো আর পুঁতির কাজ শিখল। এতো ভালো যে জমিদারবাবুদের সেলাই ঘরের সবচেয়ে ভালো নক্সী মেয়েরাও একেবারে অবাক হয়ে গেল এই কথা ভেবে — কোথা থেকে সে নক্সা পায়, কোথা থেকেই বা পায় রেশমের সুতো?

ব্যাপারটা ঘটে ভারি অদ্ভুত। একদিন একটি মেয়ে তাদের বাড়ীর দরজায় টোকা দেয়। প্রায় সে নাস্তাসিয়ার বয়েসী, খুব একটা লম্বা নয়, চোখ কালো, তীক্ষ্ণ, জ্বলজ্বলে আর এতো চঞ্চল যে অবাক হয়ে যেতে হয়। পিঠে তার একটা হাতে-বোনা ঝুলি আর হাতে তীর্থযাত্রীদের মতো চেরি গাছের লাঠি। দরজার কাছে এসে সে নাস্তাসিয়াকে জিজ্ঞেস করে:

'গিন্নিমা, আমি কি এখানে দু'-এক দিন জিরিয়ে নিতে পারি? অনেকদূর যেতে হবে, পাদুটো হয়রান হয়ে পড়েছে।'

প্রথমে নাস্তাসিয়ার সন্দেহ হয় — আবার কেউ এল নাকি ঝাঁপিটা চুরি করতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে সে থাকতে দেয়।

'তুমি বিশ্রাম নাও, তাতে আপত্তি নেই। তুমি তো আর সিঁধ কেটে জিনিসপত্তর নিয়ে পালাতে যাচ্ছ না। তবে আমাদের অনাথের সংসার, অবস্থা মোটেই ভালো নয়। সকালের খাওয়া পেঁয়াজ আর ক্বাস, সন্ধেয় ক্বাস আর পেঁয়াজ, এই যা তফাৎ। যদি তাতে তোমার চলে তাহলে যতদিন খুসি থাকো, আমরা খুসিই হব।'

ইতিমধ্যেই কিন্তু মেয়েটি সম্মতির অপেক্ষা না রেখে উনুনের পাশে বসার জায়গায় তার লাঠি আর ঝুলিটা নামিয়ে নিজের জুতো খুলতে শুরু করে দিয়েছে। এতে কিন্তু নাস্তাসিয়া বিশেষ খুসি হল না। কিন্তু চুপ করে রইল।

'ইস, বেহায়া কেমন, ডাকতে না ডাকতেই জুতো খোলা শেষ, ঝুলি বিছিয়ে বসেছে।'

বাস্তবিকই মেয়েটি তার ঝুলি খুলে বসল। আঙুল নেড়ে তানুশ্‌কাকে ডাকল:

'এদিকে এসো খুকি, আমার হাতের কাজ দেখো। যদি পছন্দ হয়, তোমাকে এটা শেখাব... বুঝতে পারছি এদিকে তোমার ঝোঁক আছে।'

তানুশ্‌কা গেল তার কাছে। মেয়েটি তাকে দিল একটুকরো কাপড়, তার কিনারে রেশমী কাজ করা। নক্সাটা এতো সুন্দর যে মনে হল তাতে ঘর যেন আলো আর গরম হয়ে উঠেছে।

তানুশ্‌কার চোখ আর ফেরে না। মেয়েটি হেসে বলে:

'দেখছি আমার কাজ তোমার চোখে ধরেছে, তাই না? শিখবে?'

'শিখব!'

নাস্তাসিয়া কিন্তু মুখঝামটা দিয়ে উঠল:

'কথাটা মনেও ঠাঁই দিস না। নুন কেনারও পয়সা নেই, আর তুই কিনা চাইছিস রেশমের কাজ করতে! রেশমের অনেক দাম।'

তীর্থযাত্রী বলল, 'এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না, গিন্নিমা। মেয়ের ক্ষমতা থাকলে রেশমও হবে। তোমার অন্ন-জলের জন্যে দিয়ে যাব, অনেক দিন চলবে। আর তারপর দেখো কী হয়। আমাদের হাতের কাজের জন্যে লোকে দাম দেয়। বিনি পয়সায় বিলিয়ে দিই না। দুটো জোটে।'

নাস্তাসিয়াকে তাই রাজী হতে হল।

'তুমি ওকে রেশম দিলে অবশ্য ও ভালো করে শিখতে পারবে, আপত্তি কী? তোমায় অনেক ধন্যবাদ।'

মেয়েটি তানুশ্‌কাকে শিখাতে শুরু করল, আর তানুশ্‌কা এতো চটপট সবকিছু শিখে ফেলল যে মনে হয় বুঝি আগে থাকতেই সে জানত। আরো একটা কথা। তানুশ্‌কা অপরিচিত লোকদের কাছ ঘেঁষত না বা তাদের সংসারে সেরকম কেউ থাকে তা পছন্দ করত না। কিন্তু এ মেয়েটির কথা আলাদা — সব সময় সে তার পিছন পিছন ঘুরঘুর করে। এতে নাস্তাসিয়ার চোখ টাটাতো, একেবারেই সে খুসি হত না। ভাবত:

'মেয়েটার যেন নতুন মা হয়েছে। নিজের মায়ের কাছ ঘেঁষতে চায় না, এক হাঘরের আঁচল ধরে ঘোরে!'

আর সে মেয়েটিও যেন ব্যাপারটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যেই তানুশ্‌কাকে ডাকত 'খুকি' আর 'মা' বলে। কখনোই তাকে নাম ধরে ডাকত না। তানুশ্‌কা বুঝত তার মা চটেছে, কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারত না। মেয়েটিকে এতো ভালোবেসেছিল যে তাকে সেই ঝাঁপিটার কথাও বলল।

'বাবার স্মৃতি হিসেবে আমাদের একটা খুব দামী জিনিস আছে,' তানুশ্‌কা জানাল। 'একটা মালাকাইটের ঝাঁপি। তার ভিতরে কী চমৎকার চমৎকার পাথরই না আছে! সারা জীবন ধরে দেখেও সাধ মিটবে না।'

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'আমায় দেখাবি, মা?'

সেটা যে তার দেখান উচিত নয় এ কথাটা তানুশ্‌কার মাথায় এল না।

বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখাব, যখন বাড়ীতে কেউ থাকবে না।'

সুযোগ ঘটতেই তানুাশ্‌কা মেয়েটিকে মাটির তলার ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে গেল। ঝাঁপিটা বার করে খুলল; মেয়েটি খানিক দেখে তানুাশ্‌কাকে বলল:

'ওগুলো পরে ফ্যাল, তাহলে ভালো করে দেখতে পারব।'

তানুাশ্‌কাকে দু'বার বলতে হল না। সে পরে ফেলল। মেয়েটি প্রশংসা করতে শুরু করল:

'বাঃ, চমৎকার দেখাচ্ছে, ওগুলো শুধু সামান্য অদল-বদল করা দরকার।'

কাছে এসে সে আঙুল দিয়ে একবার এপাথর একবার ওপাথর ছুঁতে লাগল। আর যে-পাথরটা ছোঁয় সেটাই ওঠে নতুনভাবে জ্বলজ্বল করে। কখনো তানুাশ্‌কার চোখে পড়ে, কখনো পড়ে না। তারপর মেয়েটি বলল:

'উঠে দাঁড়া তো, মা।'

তানুাশ্‌কা সোজা হয়ে দাঁড়াল, আর মেয়েটি খুব ধীরে ধীরে হাত বোলাতে লাগল তার চুলে আর পিঠে। তার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে বলল:

'তোকে পিছন ফিরে দাঁড়াতে বলার পর দেখিস, আমার দিকে যেন আর ঘুরে দেখিস না। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকবি, যাকিছু চোখে পড়ে দেখবি আর একটা কথাও কইবি না। এবার ঘুরে দাঁড়া।'

তানুাশ্‌কা ঘুরে দাঁড়াল। তার চোখে পড়ল সামনে বিরাট একটা হল-ঘর। সেরকম ঘর জীবনে সে দেখে নি। দেখতে অনেকটা গির্জের মতো, তবু ঠিক গির্জের মতোও নয়। আসল মালাকাইটের থামের উপর ছাদ ভর দিয়ে রয়েছে অনেক উপরে। দেয়াল মানুষের মাথা পর্যন্ত উঁচু মালাকাইট দিয়ে ঢাকা। তার উপর সব জায়গায় রয়েছে মালাকাইটের নক্সা। তানুাশ্‌কার ঠিক একেবারে সামনে যেন এক আয়নার ভিতর দাঁড়িয়ে ভারি সুন্দর একটি মেয়ে, ঠিক যেন রূপকথার গল্পের মতো। রাত্রির মতো কালো তার চুল, সবুজ চোখ উঠছে জ্বলজ্বল করে। সর্বাঙ্গে তার দামী জহরত। সবুজ মখমলের পোষাক থেকে আলো পড়ছে ঠিকরে। ছবিতে রাজরানীদের যা পরতে দেখা যায়, এ পোষাকটা সেই ধরনের। কী করে যে তা গায়ের সঙ্গে আটকে আছে ভাবতে অবাক লাগে। ওরকম পোষাকে আমাদের খনির মেয়েরা লোকের সামনে বেরুতে লজ্জা পায়। কিন্তু সবুজ-চোখ মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইল

একেবারে স্থির হয়ে, যেন সেটাই ঠিক। ঘরখানা লোকে ভরা, পরনে তাদের বাবু ধরনের খানদানী পোষাক, সর্বাঙ্গে সোনা। কারোর সামনে, কারোর পিছনে, কারোর বা সর্বাঙ্গেই সোনার কাজ। স্পষ্টই বোঝা যায় খুব ওপরওয়ালা লোক। মেয়েরাও রয়েছে হাত-কাটা বুক-খোলা জামা পরে, গা-ভরা জহরত। কিন্তু সবুজ-চোখ মেয়েটির পায়ের যুগ্যিও কেউ নয়। এমন কি তাকাতেই ইচ্ছে করে না।

মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে একটি লোক, চুল তার পাটের মতো। চোখ ট্যারা, কান বড় বড়, খাড়া খাড়া। দেখতে একেবারে ঠিক খরগোশের মতো। পোষাকটা তার বাস্তবিকই অদ্ভুত। শুধু সোনাতেই হয় নি, এমন কি তার জুতোর উপরও জহরত বসানো। সে ধরনের জহরত দশ বছরে একবার চোখে পড়ে। নিশ্চয়ই তার নিজের অনেক খনি আছে। সেই খরগোশের মতো লোকটা মেয়েটির কাছে ক্রমাগত বিড়বিড় করে চলেছে, কিন্তু মেয়েটি একবার তার দিকে মুখ তুলেও তাকাচ্ছে না। যেন লোকটা সেখানে নেই।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তানুশ্‌কা অবাক হয়ে গেল আর তারপর একটা জিনিস তার চোখে পড়ল।

'আরে, মেয়েটি তো আমার বাবার জহরত পরেছে!' তানুশ্‌কা চেঁচিয়ে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু গেল মিলিয়ে।

মেয়েটি হাসতে লাগল:

'দেখে সাধ মিটল না, মা! মন খারাপ করিস না, সময় হলে আরো দেখবি।'

তানুশ্‌কা অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে লাগল — যে-জায়গা দেখেছে সেটা কোথায়?

মেয়েটি বলল, 'ওটা রাজবাড়ী। সেই হল-ঘর যেটা এখানকার মালাকাইট দিয়ে সাজানো। তোর বাবা তো সেটা তুলত।'

'ঐ মেয়েটা কে, যে বাবার জহরত পরেছিল, আর ঐ লোকটাই বা কে, যাকে দেখতে খরগোশের মতো?'

'ওকথা, মা, তোকে বলব না, শীগ্‌গীর নিজেই জানতে পারবি।'

সেদিন নাস্তাসিয়া যখন বাড়ী ফিরল অপরিচিতা মেয়েটি তখন যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। বাড়ীর গিন্নিকে সে ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন করল, আর তানুশ্‌কাকে দিল এক বাণ্ডিল রেশমের সুতো আর পুঁতি। তারপর বার করল ছোট্ট একটা

বোতাম। সেটা কাঁচেরও হতে পারে বা স্ফটিক থেকে মসৃণ করে কাটা পাথরও হতে পারে।

'স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এটা নে, মা,' বলে মেয়েটি সেটা তানুশ্‌কাকে দিল। 'কাজের সময় যদি কিছু ভুলে যাস বা কখনো যদি অসুবিধেয় পড়িস, বোতামটার দিকে তাকাস। সেখানে উত্তর খুঁজে পাবি।'

এই বলেই চলে গেল। হঠাৎ একেবারে অদৃশ্য।

তারপর থেকে তানুশ্‌কা ছুঁচের কাজ খুব ভালো শিখেছে। তার বিয়ের বয়েসও হয়ে এসেছে — ইতিমধ্যেই দেখতে হয়েছে বড় মেয়েদের মতো; খনির ছেলের দল নাস্তাসিয়ার জানালার দিকে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু তানুশ্‌কার কাছে যেতে সাহস করে না। তানুশ্‌কা মিশুকে ধরনের নয়, প্রকৃতি তার গম্ভীর, নিজের মনে থাকতে ভালোবাসে। আর তাছাড়া, কোন স্বাধীন মেয়ে বিয়ে করতে যাবে ভূমিদাসকে! সাধ করে কে ফাঁস নেয় গলায়?

জমিদার বাড়ীর লোকেরা তানুশ্‌কার ছুঁচের কাজের দক্ষতার কথা শুনল। তারা লোক পাঠাতে শুরু করল তার কাছে। চাকরবাকরদের মধ্যে কম বয়েসী আর সুন্দর দেখতে এক ছোকরাকে বেছে, বাবুর মতো পোষাক পরিয়ে, চেনওয়ালা ঘড়ি ঝুলিয়ে তানুশ্‌কার কাছে পাঠানো হল, যেন কী একটা কাজে এসেছে। ভাবল, হয়তো এমন ছেলেকে কি আর তানুশ্‌কার মনে ধরবে না। তাহলেই তানুশ্‌কাকে দখল করতে পারবে তারা। কিন্তু কোনোই ফল হল না। তানুশ্‌কা শুধু কাজের কথাই বলে, চাকরটার অন্য কোনো কথা কানেই তুলত না। বিরক্তি ধরে গেল তানুশ্‌কার, তাকে ঠাট্টা করতেও শুরু করল:

'পালাও গো বাছাধন, পালাও, তোমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে। ভয় পাচ্ছে ঘড়িটা আবার নষ্ট করে না ফ্যালো, চেনের সোনা ঘষে না যায়, জানো তো, অভ্যেস তো নেই, ফোস্কা পড়বে।'

কুকুরের গায়ে ছুঁড়ে-দেওয়া গরম জলের মতোই তার কথায় জ্বালা ধরে। গরগর করতে করতে সে বা অন্য কোনো চাকর সরে পড়ত:

'ওকে আবার মেয়ে বলে? সবুজ-চোখ পাথরের মূর্তি! ওর চেয়ে অনেক ভালো মেয়ে আছে!'

গরগর করলেও মোহিত হয়ে যায়। যাকেই পাঠায় তান্যুশ্কার রূপ সে আর ভুলতে পারে না। মনে হত কী যেন তাদের পিছনে টানছে, শুধু জানালাটা দেখার জন্যেই সেটার পাশ দিয়ে তারা যেত। উৎসবের দিনে খনির সব ছেলেদেরই সেই পথে কোনো না কোনো দরকার পড়ত। জানালার পাশ দিয়ে তারা যাতায়াত করায় সেখানে একটা পায়ে-চলা পথ ফুটে উঠল। কিন্তু তান্যুশ্কা তাদের দিকে মুখ তুলেও তাকাত না।

পড়শীরা নাস্তাসিয়াকে ভর্ৎসনা করতে শুরু করল:

'তোমার তান্যুশ্কা নিজেকে মনে করে কী? মেয়েদের সঙ্গে সে মেশে না, ছেলেদের দিকে তাকায় না। রাজপুত্র চায়, নাকি নিজেকে মনে করে যিশুখৃষ্টের বৌ?'

নাস্তাসিয়া শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলত।

'আমি নিজেই কিছু বুঝতে পারছি না গো। মেয়েটা চিরকালই অদ্ভুত, কিন্তু সেই ডাইনী আসার পর থেকেই সে আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। আমি তার সঙ্গে কথা বলি আর সে শুধু সেই যাদু-করা বোতামটার দিকে তাকিয়ে থাকে, কোনো কথাই বলে না। বোতামটা ছুঁড়ে ফেলে দিতাম, কিন্তু সেটা তার কাজে লাগে। যখনই সে রেশমী সুতোটুতো বদলাতে চায়, সে তাকায় বোতামটার দিকে। আমাকে একবার সেটা সে দেখিয়েছিল, কিন্তু নিশ্চয়ই আমার চোখ খারাপ হয়ে আসছে, কিছুই সেখানে আমি দেখতে পাই নি। তাকে চাবকাতাম, কিন্তু বাস্তবিকই সে খুব কাজের মেয়ে। নক্সী কাজ দিয়েই তো আমাদের সংসার চলছে। তাই শুধু ভাবি আর ভাবি, শেষ পর্যন্ত কান্না এসে যায়। সে বলে: মা, জানি চিরকাল এখানে থাকব না। কারো মন কাড়তে চাই না, তাদের খেলাতেও যোগ দিই না। খামকা লোকের মনে কষ্ট দিয়ে লাভ কী? আর জানালার কাছে বসি, সেটা আমার কাজের জন্যে বসতেই হয়। আমাকে বকছ কেন? কী অন্যায় করেছি? নাও, জবাব দাও!'

এসব সত্ত্বেও কিন্তু তাদের সংসারের অবস্থা ভালো হয়ে উঠল। জমিদারবাবুদের কাছে তান্যুশ্কার হাতের কাজ ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াল। শুধু এই খনির কাছাকাছি আর আমাদের শহরের লোকরাই সেগুলো কিনত না, অন্যান্য জায়গা থেকেও লোকে ফরমাশ দিত, কাজের জন্যে দিত ভালো দাম। জোয়ান মরদও অত রোজগার

করে না। তারপর কিন্তু এক দুর্ঘটনা ঘটল — অগ্নিকাণ্ড। আগুন লাগল রাত্রে। গরুঘোড়ার গোয়াল, খামার বাড়ীর সব যন্ত্রপাতি — সবকিছুই নষ্ট হয়ে গেল। পরনের জামাকাপড় নিয়ে কোনো মতে তারা পারল বেরিয়ে আসতে। তাছাড়াও নাস্তাসিয়া ঝাঁপিটা আনতে পেরেছিল। পরের দিন নাস্তাসিয়া বলল:

'মনে হচ্ছে আর কোনো উপায় নেই। জহরত-ভরা এই ঝাঁপিটা আমাদের বিক্রি করতেই হবে।'

ছেলেরা সবাই বলল:

'হ্যাঁ, মা, এটা বিক্রি করে দাও। কিন্তু দেখো, সস্তায় ছেড়ো না।'

বোতামটার দিকে তানুশ্‌কা চুপিচুপি তাকাল লুকিয়ে। তার ভিতরে দেখতে পেল সেই সবুজ-চোখ মেয়েটিকে, মাথা নাড়িয়ে সে বলছে — হ্যাঁ, বিক্রি করে দাও। তানুশ্‌কার কাছে ব্যাপারটা মর্মান্তিক, কিন্তু করার আর কিছুই ছিল না। তাছাড়া আগেই হোক পরেই হোক সেগুলো তো সেই সবুজ-চোখ মেয়েটির কাছে চলে যাবেই। তাই তানুশ্‌কা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'বিক্রিই যদি করতে হয় তো, তাই দাও।' জহরতগুলো সে একবার শেষবারের মতোও দেখল না। বলবার কী আছে, এক পড়শীর বাড়ীতে তারা আশ্রয় নিয়েছে রাখারই বা জায়গা কই।

বিক্রি করতে মনস্থির করার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবসাদাররা এসে জুটল। সম্ভবত তাদের মধ্যেই কেউ নিজেই আগুন লাগিয়েছিল ঝাঁপিটা পাবার জন্যে। তারা তো এই জাতেরই — নোখ ধারাল, সবকিছুই একেবারে খাবলে ধরে। তারা দেখল, এখন ছেলেরা বড় হয়ে উঠেছে, তাই বেশী দাম হাঁকলে। কেউ পাঁচশো, কেউ সাতশো একজন এমন কি হাজার। প্রচুর তাদের টাকা, ঐ জহরতগুলোর বিনিময়ে নাস্তাসিয়া খুব আরামেই থাকতে পারে। তাহলেও নাস্তাসিয়া দাম চাইল দু'হাজার। দরাদরি করার জন্যে ক্রমাগত তারা নাস্তাসিয়ার কাছে আসতে লাগল। অল্প অল্প করে দাম বাড়ায় আর পরস্পরের কাছ থেকে সেকথা লুকিয়ে রাখে, কারণ কখনো তারা নিজেদের মধ্যে একমত হতে পারে না। ঐ ঝাঁপিটার ওপর সবাইকারই লোভ, কেউই চায় না সেটা হারাতে। যখন তারা তখনো এই ধরনের দরাদরি করছে, পোলেভায়াতে এল নতুন এক গোমস্তা।

কখনো কখনো গোমস্তারা অনেক দিন ধরে থাকত, কিন্তু তখনকার দিনে ক্রমাগতই গোমস্তাদের বদলানো হচ্ছিল। স্তেপানের জীবদ্দশায় যে বোটকা পাঁঠা ছিল, বোটকা গন্ধের জন্যেই বোধ হয় বুড়ো জমিদার তাকে ক্রীলাতোভস্কোয় পাঠিয়ে দেয়। তারপর যে-গোমস্তা আসে তাকে লোকে বলত পিছন-পোড়া — মজুরেরা তাকে একদিন জোর করে চেপে বসিয়েছিল তপ্ত লোহার উপর। তারপর আসে খুনে-সেভেরিয়ান, ঠাকরুন তার দফারফা করে দিয়েছিল ফাঁপা পাথরে ঢুকিয়ে। তারপর আসে আরো দুই বা তিন জন, আর সবশেষে আসে এই লোকটি।

লোকে বলত এই লোকটা এসেছে বিদেশ থেকে, নানা ভাষা জানে, তবে আমাদের রুশ ভাষাটা সবচেয়ে কম। কিন্তু একটা কথা খুব ভালো বলতে পারত 'চাবকাও'। এমন টেনে টেনে কথাটা বলত যে মনে হত বুঝি গান গাইছে: চা-ব-কা-ও! দোষ যাই থাক, মুখে কেবল একটি কথা: চাবকাও! তাই লোকে তার নাম দিয়েছিল চাবুক-হাঁকিয়ে।

কিন্তু এই চাবুক-হাঁকিয়ে লোকটা বাস্তবিকই খুব খারাপ লোক ছিল না। বেজায় সে হৈচৈ করত বটে কিন্তু বেঁধে চাবুক মারবার থামটা ব্যবহার খুব বেশী করত না। শাস্তিদাতারা অলস আর মোটা হয়ে উঠল, তাদের করার কিছুই নেই। চাবুক-হাঁকিয়ে যখন সেখানে ছিল লোকেরা পেয়েছিল নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ।

ব্যাপারটা কী জানো। বুড়ো কর্তা কাহিল হয়ে পড়েছিল, নড়তে-চড়তে প্রায় পারত না। চেষ্টা করছিল এক কাউণ্টেস অথবা ঐ ধরনের কারুর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে। কিন্তু ছোট কর্তা রেখেছিল এক প্রণয়িনী। বাস্তবিকই তাকে নিয়ে তার মাথা গিয়েছিল বিগড়ে। বুড়ো কর্তার কাছে এটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। ব্যাপারটা ভারি অস্বস্তিকর। কনের বাপ-মা এ ঘটনায় কী মনে করবে? তাই বুড়ো কর্তা প্ররোচনা দিতে লাগল সেই মেয়েটিকে — তার ছেলের প্রণয়িনীকে — সঙ্গীত শিক্ষককে বিয়ে করুক। ছেলেদের গান আর বিদেশী ভাষা শেখাবার জন্যে বুড়ো কর্তার বাড়ীতে সে চাকরি করত, বড়লোকেদের যেমন হয় আর কি।

বলল, 'বদনাম নিয়ে থাকবে কেন? সঙ্গীত শিক্ষককে বিয়ে করো। তোমাকে ভালো যৌতুক দেব আর পোলেভায়ার গোমস্তা করে পাঠাব তোমার স্বামীকে। লোকদের কড়া শাসনে রাখতে পারলে সেখানকার কাজটা সহজ। সঙ্গীতজ্ঞ হলেও

তার মধ্যে এধরনের সুবুদ্ধি যথেষ্ট। তুমিও বাস্তবিকই আরামে থাকবে, হবে সেই জায়গার প্রধান মহিলা। তোমাকে সবাই ভক্তি শ্রদ্ধা করবে। এর মধ্যে খারাপ কিছুই নেই, তাই না?'

মেয়েটি সাগ্রহেই কথাগুলো শুনল। হয়তো সে ঝগড়া করেছিল প্রভু-পুত্রের সঙ্গে, কিম্বা ছিল বেজায় চালাক।

বলল, 'বহুকাল ধরে তাই চাইছি, কিন্তু মুখ ফুটে বলার সাহস হয় নি।'

সঙ্গীত শিক্ষক অবশ্য প্রথমে খানিকটা আপত্তি করে। বলল:

'বিয়ে করব না। ওর বদনাম আছে, মেয়েটা খারাপ।'

বুড়ো কর্তা কিন্তু ছিল খুব চালাক। এত খনিটনি তো আর খামকা বাগায় নি। অল্প দিনের মধ্যেই সঙ্গীত শিক্ষকের মত ঘুরিয়ে দিল। জানি না তাকে সে ভয় দেখায়, নাকি খোশামোদ করে, নাকি মদ খাইয়ে মাতাল করে ফেলে — কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই বিয়ের দিন সে স্থির করে ফেলল, তারপর সেই তরুণ দম্পতি চলে যায় পোলেভায়ায়। চাবুক-হাঁকিয়ে এইভাবে আসে আমাদের গ্রামে। বেশী দিন এখানে সে থাকে নি — কিন্তু তার স্বপক্ষে বলতেই হবে লোকটা খুব খারাপ ছিল না। পরে যখন তার বদলে নিজেদের মধ্যে থেকে হামদো-মুখো একজন এল, লোকেরা তখন চায় চাবুক-হাঁকিয়ে ফিরে আসুক।

চাবুক-হাঁকিয়ে আর তার স্ত্রী ঠিক সেই সময় এল যখন ব্যবসাদাররা নাস্তাসিয়াকে ছেঁকে ধরেছে। এখন হয়েছে কি, চাবুক-হাঁকিয়ের স্ত্রীও সুন্দরী, গায়ের রঙ ফর্সা আর গোলাপী — মানে, মোহিনী। ছোট কর্তার পছন্দটা যে ভালো একথা স্বীকার করতেই হবে। এই সুন্দরীটির কানে গেল ঝাঁপিটার কথা। ভাবল, 'ওটা একবার দেখা যাক। হয়তো সত্যিই কেনবার মতো।' তাই সে সেজেগুজে গাড়ী চড়ে এল নাস্তাসিয়ার কাছে। জমিদারির সব ঘোড়াগুলোকেই তো তারা ব্যবহার করতে পারত!

সে বলল, 'শোনো, ভালোমানুষের বৌ। তুমি যে-জহরত বিক্রি করছ সেগুলো আমাকে দেখাও।'

নাস্তাসিয়া ঝাঁপি বার করে খুলল। চাবুক-হাঁকিয়ের স্ত্রীর চোখদুটো যেন এল ঠিকরে বেরিয়ে। জানো তো, ছোট কর্তার সঙ্গে সে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে থেকেছে,

অন্যান্য দেশেও ঘুরেছে। জহরত সম্বন্ধে সে কিছুটা জানে। এগুলো দেখে বাস্তবিকই সে অবাক হয়ে গেল। ভাবল, 'কী কাণ্ড, এধরনের জহরত রাজরানীরও নেই, আর ওগুলো কিনা রয়েছে পোলেভায়ায়, ঘর-পোড়াদের কাছে। ওগুলো কিছুতেই হাত ফস্কে যেতে দেব না।'

জিজ্ঞেস করল, 'কত দাম চাও?'

নাস্তাসিয়া বলল:

'দু'হাজার চাইছি।'

মেয়েটি খানিক দরদস্তুর করল লোক দেখানো হিসেবে। তারপর বলল:

'বেশ কথা, ভালোমানুষের বৌ, তুমি যে-দাম চাইছ সেই দামই দেব। ঝাঁপিটা আমার বাড়ীতে নিয়ে এসো। সেখানে টাকা পাবে।'

নাস্তাসিয়া কিন্তু রাজী হল না। বলল:

'আমাদের দেশে পেটের পিছনে রুটি দৌড়য় না। টাকা নিয়ে এলেই ঝাঁপিটা পাবেন।'

চাবুক-হাঁকিয়ের স্ত্রী দেখল নাস্তাসিয়ার ইচ্ছেমতো কাজ তাকে করতেই হবে। তাই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে টাকা আনতে বাড়ী ফিরে গেল। কিন্তু যাবার আগে নাস্তাসিয়াকে বলল:

'দেখো, ওগুলো যেন অন্য কাউকে বিক্রি করো না।'

নাস্তাসিয়া বলল:

'দুর্ভাবনা করবেন না। কথার খেলাপ করি না। সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করব, কিন্তু তারপরে আমার যা ইচ্ছে।'

মেয়েটি চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এল সব ব্যবসাদারদের দল। তারা দূর থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। জিজ্ঞেস করল:

'কী ঘটেছে?'

'ওগুলো বিক্রি করে দিয়েছি,' নাস্তাসিয়া বলল।

'কতয়?'

'দু'হাজারে, যে-দাম চেয়েছিলাম সেই দামে।'

সবাই তারা চেঁচামেচি লাগাল, 'সে কী! মাথা খারাপ হল নাকি? নিজেদের

লোককে না দিয়ে বাইরের লোককে দিয়ে দিলে!' আবার তারা দর হাঁকতে শুরু করল, বাড়িয়ে চলল তাদের দাম।

নাস্তাসিয়া কিন্তু টোপ গিলল না।

'এটাই হয়তো তোমাদের কাজ করার ধরন — একবার একথা বলা, একবার ওকথা বলা আর জিনিসটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখা। কিন্তু আমার স্বভাব তা নয়। কথা দিয়েছি, ব্যস।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই চাবুক-হাঁকিয়ের স্ত্রী ফিরে এল। টাকা এনে নাস্তাসিয়ার হাতে দিয়ে ঝাঁপিটা তুলে নিয়ে বাড়ী ফেরার জন্যে সে ফিরে দাঁড়াল। আর সেইখানে দরজার সামনে তানুশ্‌কার সঙ্গে তার দেখা। ঝাঁপিটা যখন বিক্রি হয় তানুশ্‌কা তখন অন্য কোথাও ছিল। দেখে, ঝাঁপি হাতে ধরে রয়েছে কে এক জমিদার গিন্নি। সে ভালো করে তাকাল মেয়েটির দিকে — যাকে সে তখন দেখেছিল সে না তো। চাবুক-হাঁকিয়ের স্ত্রীও বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল তার দিকে।

'এ পরীটি কে? কার মেয়ে এ?'

নাস্তাসিয়া বলল, 'লোকে বলে এ আমারই মেয়ে। যে-ঝাঁপিটা আপনি কিনেছেন সেটা ওর হওয়ারই কথা। সর্বনাশ না হলে ঝাঁপিটা কখনোই বিক্রি করতাম না। খুব ছেলেবেলা থেকেই সবসময় ও ঐ জহরতগুলো নিয়ে খেলে এসেছে। ওগুলো পরে সে বলত তার শরীর গরম হয়ে উঠেছে, মন খুসি হয়ে উঠেছে। কিন্তু এখন আর ওকথা বলে লাভ কী? গাড়ী থেকে যা পড়ে গেছে, তা চিরকালের মতোই গেছে!'

চাবুক-হাঁকিয়ের বৌ বলল, 'ভালোমানুষের বৌ, ভুল করছ। আমি ঐ পাথরগুলো ভালো জায়গায় রাখব।' কিন্তু মনে মনে সে ভাবতে লাগল: 'ঐ সবুজ-চোখ মেয়েটা নিজের ক্ষমতার কথা যে জানে না এটা খুব ভালো। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ও গেলে রাজাদের মাথা ঘুরিয়ে দেবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, আমার বোকা তুর্চানিনভের নজর ওর ওপর যেন না পড়ে।'

এই ভেবে সে চলে গেল।

বাড়ী ফিরে চাবুক-হাঁকিয়ের বৌ তার স্বামীর কাছে বড়াই করতে শুরু করল: 'শোনো বন্ধু, এখন আর তোমার কিম্বা তুর্চানিনভের আওতায় আমার থাকার

দরকার নেই। একটু কিছু হলেই — আমি চললাম! সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যাব কিম্বা হয়তো আরো ভালো, বিদেশে। বিক্রি করে দেব ঝাঁপিটা আর তারপর আমার খুসি হলে তোমার মতো বর কিনব গণ্ডায় গণ্ডায়।'

এইভাবে সে বড়াই করে চলল। যে-জহরত কিনেছিল ইচ্ছে হল সেগুলো পরে নিজেকে দেখে। হাজার হলেও মেয়ে তো! তাই সে আয়নার কাছে দৌড়ে গিয়ে প্রথমে পরল মুকুট। কিন্তু — উঃ, উঃ, এ কী কাণ্ড! মাথাকে যেন কামড়াচ্ছে আর চুল ধরে এমন টানছে যা অসহ্য। কোনো ক্রমে তা খুলল। তবুও ইচ্ছে হয়। দুল পরল, কানের লতি প্রায় ছিঁড়ে পড়ে। আঙটি সে পরল — এমন কেটে বসে গেল যে সাবান দিয়ে কোনোরকমে খুলতে পারল সবেমাত্র। স্বামী বসে বসে ব্যঙ্গ করে — ওসব জিনিস তোমার পরার জন্যে নয়!

মেয়েটি ভাবল, 'আশ্চর্য তো। শহরে গিয়ে কোনো এক ভালো জহুরীকে এগুলো দেখাতে হবে। মাপসই করে হবে গড়াতে যাতে পাথরগুলো বদলে না দেয়।'

সঙ্গে সঙ্গে তাই সে করল। পরের দিন চলে গেল সকালে। তিনটে ভালো ঘোড়ার গাড়ী, যেতে কতক্ষণ। ভালো সৎ জহুরী কোথায় জেনে নিয়ে এক্কেবারে হাজির। লোকটি বুড়ো, এক্কেবারে বুড়ো আর ভারি দক্ষ কারিগর। ঝাঁপিটার উপর চোখ বুলিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, কোথা থেকে কিনেছে। মেয়েটি যা জানত বলল। বুড়ো লোকটি আবার ঝাঁপিটা দেখতে লাগল, কিন্তু জহরতগুলোর উপর নজরই দিল না।

বলল, 'ওগুলো ছোঁবই না, যত টাকাই আপনি দেন না কেন। যে-জহুরী এগুলো বানিয়েছে সে আমাদের দেশের লোক নয়। তার সঙ্গে পাল্লা দেবার লোক আমি নই।'

মেয়েটি বুঝতেই পারল না ব্যাপারটা কী। বিরক্ত হয়ে অন্য এক জহুরীর কাছে গেল। কিন্তু মনে হল সবাই যেন একটা ষড়যন্ত্র করেছে। একের পরে এক তারা ঝাঁপিটা দেখল, তারিফ করল সেটার, জহরতগুলোর দিকে ফিরেও তাকাল না। সেগুলো নিয়ে কাজ করতে অস্বীকার করল। তারপর মেয়েটি চালাকির আশ্রয় নিল। বলল সেটা সে কিনেছে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে। সবকিছু সেখানেই তৈরি। কিন্তু একথা যাকে বলল সে উঠল হেসে।

'জানি ঝাঁপিটা কোথায় তৈরি,' সে বলল, 'যে এটা তৈরি করেছে তার গল্প শুনেছি। আমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই যে এটার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। সে কারুর জন্যে গয়না গড়ালে অন্য কেউই সে-গয়না পরতে পারবে না — যতই কেন না চেষ্টা করুক।'

মেয়েটি তখনো সব কথা বুঝতে পারল না, কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারল — ব্যাপারটা খারাপ। লোকটা যেন কোনোকিছুতে ভয় পেয়ে গেছে। তারপর তার মনে পড়ল নাস্তাসিয়ার কথা — তার মেয়ে এই গয়না পরতে কী রকম ভালোবাসত।

'এগুলো কি ঐ সবুজ-চোখ মেয়েটার জন্যেই তৈরি করা হয়েছিল? কী বিপদ!'

কিন্তু তারপর আবার সে ভাবল:

'বয়ে গেল। বিক্রি করব কোনো ধনী বোকা মেয়ের কাছে। এগুলো নিয়ে সে মাথা ঘামাক। টাকা তো আমার হবে!' এই ভেবে সে পোলেভায়ায় ফিরে এল।

ফিরে এসে একটা দারুণ খবর শুনল। বুড়ো কর্তা মারা গেছে। লোকটা চালাক ছিল, চাবুক-হাঁকিয়েকে কায়দা করেছিল, কিন্তু মরণকে ঠেকাতে পারে নি। মরণ তাকে কাৎ করেছে। ছেলের বিয়ে দেবার সময়ও পায় নি, অতএব তার ছেলে এখন নিজেই সর্বেসর্বা। অল্প দিনের মধ্যেই চাবুক-হাঁকিয়ের স্ত্রী একটা চিঠি পেল। এই এই ব্যাপার, প্রিয়তমা, যখন বসন্তকালে আমি তোমাদের খনিতে আসব, সবকিছু তদারক করব আর নিয়ে যাব তোমাকে সঙ্গে করে। ঐ সঙ্গীত শিক্ষককে তাড়াব কোনো ছলে। চাবুক-হাঁকিয়ে কেমন করে যেন চিঠিটার কথা জানতে পেরে দারুণ হৈচৈ শুরু করল। লোকের সামনে লজ্জায় তার মাথা কাটা যায় তো। হাজার হলেও সে গোমস্তা। আর বৌকে নিচ্ছে ছিনিয়ে। দারুণ মদ ধরল। কেরানী-টেরানিদের সঙ্গে আর কি। বিনা পয়সায় পেয়ে তোয়াজ করত তারা। একদিন খানাপিনা চলেছে। একজন বড়াই করে বলতে শুরু করল:

'আমাদের খনিতে নিখুঁত সুন্দরী বলতে যা-বোঝায় সেরকম মেয়ে একটি আছে। তার জুড়ি কোথাও মিলবে না।'

শুনেই চাবুক-হাঁকিয়ের কান খাড়া হয়ে উঠল:

‘কার মেয়ে সে? কোথায় থাকে?’

তা সব কথা তারা বলল, ঝাঁপিটার কথাও — সেই পরিবার থেকেই তোমার স্ত্রী সেটা কিনেছে।

‘তাকে একবার দেখতে চাই,’ বলল চাবুক-হাঁকিয়ে। মাতালের দল একটা ছুতোও বার করল।

‘এখুনি যাওয়া যাক-না, দেখে আসি তাদের নতুন বাড়ীটা কেমন হল। তারা ভূমিদাস নয় বটে, কিন্তু থাকে তো এই খনির জমিতেই। তাই জোর ফলানোও যায়।’

দু’তিন জন চলল, তাদের সঙ্গে চাবুক-হাঁকিয়েও। একটা মাপবার ফিতেও সঙ্গে নিল, দেখবে অন্যের এক চিলতে জমিও নাস্তাসিয়া দখল করেছে কিনা, সীমানার খুঁটি ঠিক আছে কিনা। পান থেকে চুন খসলেই তাকে তারা ধরবে। গেল তারা সেই কুঁড়ে ঘরটায়, একমাত্র তানুশ্কাই ছিল সেখানে। চাবুক-হাঁকিয়ে তাকে দেখল একবার। তারপরেই যেন বোবা হয়ে গেল। মানে, কোনো দেশেই তো এরকম সুন্দরী দেখে নি। একেবারে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল সে, আর তানুশ্কা — চুপ করে বসে রইল যেন তাদের লক্ষ্যই করে নি। তারপর চাবুক-হাঁকিয়ে যেন সামান্য ধাতস্থ হয়ে জিজ্ঞেস করল:

‘কী করছ?’

‘এটা সেলাই করছি, লোকের ফরমাশ,’ বলে তানুশ্কা সেটা তাকে দেখাল। চাবুক-হাঁকিয়ে বলল:

‘আমার একটা ফরমাশ নেবে?’

‘যদি দামে বনে তাহলে কেন নেব না?’

চাবুক-হাঁকিয়ে বলল:

‘তোমার নিজের ছবি রেশমী সুতো দিয়ে তুলতে পারবে?’

তানুশ্কা চুপিচুপি তার বোতামের দিকে তাকাল, আর সেই সবুজ-চোখ মেয়েটি ইঙ্গিত করল তাকে ফরমাশটা নিতে, আর তারপর নিজের দিকে আঙুল দেখাল সে।

তানুশ্কা বলল:

‘আমার নিজের ছবি করব না। এক মেয়েকে জানি যার গায়ে জহরতের গয়না

আর রাজরানীর মতো পোষাক। তার ছবি করতে পারি। কিন্তু সেধরনের কাজ সস্তায় হবে না।'

চাবুক-হাঁকিয়ে বলল, 'দাম নিয়ে মাথা ব্যথার দরকার নেই। তার জন্যে একশো কি দু'শো রুবল দেব, শুধু মেয়েটি যদি তোমার মতো দেখতে হয়।'

তানুশ্‌কা বলল, 'তার মুখ আমার মতো, কিন্তু পোষাক আলাদা।'

একশো রুবলে রফা হল। তানুশ্‌কা বলল ছবিটা এক মাসের মধ্যে হয়ে যাবে। কিন্তু তাহলেও ক্রমাগত চাবুক-হাঁকিয়ে আসতে লাগল কাজটা কী রকম এগুচ্ছে দেখবার ছুতো করে। কিন্তু আসল কারণ একেবারে আলাদা। লোকটার মাথা একেবারে ঘুরে গেছে। তানুশ্‌কা কিন্তু তাকে আমলই দেয় না। দু'একটা কথা বলেই সে চুপ করে যায়। চাবুক-হাঁকিয়ের ইয়ার বন্ধুরা তাকে ঠাট্টা করতে শুরু করল:

'ওখানে কিছুই মিলবে না। মিছিমিছিই জুতো ক্ষইয়ে ফেলছ!'

তারপরে তো তানুশ্‌কা ছবিটা শেষ করে ফেলল। চাবুক-হাঁকিয়ে দেখে — কী অবাক কাণ্ড! — এটা যে হুবহু তার ছবি, গায়ে শুধু দামী পোষাক আর জহরত। একশো রুবলের বদলে তিনশো রুবল সে তানুশ্‌কাকে দিল, কিন্তু তানুশ্‌কা ফিরিয়ে দিল দু'শো রুবল।

বলল, 'উপহার নিই না, খেটে খাই।'

চাবুক-হাঁকিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরল; মুগ্ধ হয়ে ছবিটা দেখে। কিন্তু বৌয়ের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। তার মদ খাওয়া কমে গেল এবং খনি সম্বন্ধে সে খানিক মন দিতে শুরু করল।

বসন্তকালে খনিতে এল ছোট কর্তা। এল পোলেভায়ায়। সব লোকজন জড়ো করা হল, গির্জেতে হল উপাসনা, আর তারপর জমিদার বাড়ীতে চলল যত নাচগান, ফুর্তি। সাধারণ লোকের জন্যে মদে-ভরা দুটো পিপে গড়িয়ে দেওয়া হল, বুড়ো কর্তাকে স্মরণ করুক, ছোট কর্তার স্বাস্থ্য পান করুক। যেন ফোয়ারা ছুটিয়ে দেওয়া হল — তুর্চানিনভ পরিবারদের সবাই এ কাজ ভালো করত। জমিদারের মদের সঙ্গে তোমার নিজের দশ বোতলও মেশাও, তাহলে সেটা বেশ জমকালো দেখাবে। কিন্তু শেষকালে দেখবে তোমার শেষ কোপেকটাও নেই, আর একেবারে খামকা। পরের দিন লোকেরা আবার কাজে ফিরে গেল, কিন্তু জমিদার বাড়ীতে

তখনো খানা-পিনা চলছে। এইভাবেই চলতে লাগল। খানিক ঘুময়, তারপরে আবার ফুর্তি। মানে, নৌকোয় বেড়ানো, বনের মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে ঘোরা, বাজনার আসর — কত কী। চাবুক-হাঁকিয়ে ওদিকে সব সময়ই বেসামাল। ইচ্ছে করেই কর্তা তাঁর সবচেয়ে বেপরোয়াগুলোকে তার পিছনে লাগালো — ওকে আকণ্ঠ মদ গিলিয়ে রাখো! তারাও নতুন প্রভুর অনুগ্রহ লাভ করতে ব্যস্ত।

চাবুক-হাঁকিয়ে মাতাল হয়ে থাকে বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও টের পায় কী ঘটতে চলেছে। অতিথিদের সামনে অপ্রস্তুত লাগে তার। খাবার সময় সকলের সামনে সে চিৎকার করে উঠল:

'তুর্চানিনভ কর্তা আমার বৌকে যদি নিয়ে নেন তাতে থোড়াই কেয়ার করি। নিয়ে যান-না! তাকে আমি চাই না। আমি যা পেয়েছি, এই দেখুন!'

এই বলে পকেট থেকে সেই রেশমী ছবিটা বার করল। বিস্ময়ে সবাই হতবাক হয়ে যায়। চাবুক-হাঁকিয়ের বৌয়ের মুখ হয়ে গেল হাঁ। কর্তাও চোখ বড় বড় করে দেখে। কৌতূহল হল খুব।

জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটি কে?'

চাবুক-হাঁকিয়ে কিন্তু হো-হো করে হাসে:

'টেবিল-ভরে মোহর দিলেও বলব না।'

কিন্তু এতে আর লাভ কী, সবাই তানুশ্‌কাকে চেনে। কে আগে কর্তাকে তার কথা বলবে তাই নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কিন্তু চাবুক-হাঁকিয়ের বৌ হাত নেড়ে পা ঠুকে বলে:

'যত রাজ্যের বাজে কথা! যা জানো না তা নিয়ে কথা বলো না! খনির মেয়ে কোথা থেকে ওরকম পোষাক আর জহরত পাবে? ঐ ছবিটা আমার স্বামী এনেছে বিদেশ থেকে। বিয়ের আগেই ওটা আমাকে দেখিয়েছিল। এ এখন মাতাল, কী বলছে খেয়ালে নেই। শীগ্‌গীরই বেহেড হয়ে যাবে। টেনেছে কী!'

চাবুক-হাঁকিয়ে দেখে, বৌয়ের বেশ আঁতে লেগেছে। হম্বিতম্বি শুরু করল সে:

'তুমি একেবারে নির্লজ্জ মেয়েমানুষ, একেবারে নির্লজ্জ! কর্তার চোখে ধুলো দেবার জন্যে একটা গাঁজাখুরি গল্প ফেঁদেছ! কখন তোমাকে ও ছবিটা দেখাতে

গেলাম? ওটা পেয়েছি এখানেই, সেই মেয়েটির কাছ থেকেই, যার কথা এরা সবাই বলাবলি করছে। পোষাক সম্বন্ধে অবশ্য আমি মিথ্যে বলব না, সেটা সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তাকে যেকোনো পোষাকই পরাতে পারো। কিন্তু জহরতগুলো এক সময় তার ছিল। এখন সেগুলো রয়েছে এখানে, তোমার আলমারির মধ্যে তালাবন্ধ। তুমি নিজেই ওগুলো কিনেছিলে দু'হাজার দিয়ে, কিন্তু পরতে পারো না। সিরাকাসিয়ান ঘোড়ার জিন গরুর পিঠে বসে না। খনির সবাই জানে তোমার কেনার কথা।'

জহরতগুলোর কথা শোনামাত্রই কর্তা বলল:

'কই দেখাও তো আমায়।'

আর এদিকে শোনো, ছোট কর্তা ছিল বুদ্ধিতে খাটো, দারুণ খরচে লোক, উত্তরাধিকারীরা যেমন হয়ে থাকে। জহরতের ব্যাপারে সে ছিল একেবারে পাগল। নিজের চেহারা নিয়ে তার গর্ব করার বিশেষ কিছু ছিল না, তাই জহরত নিয়ে গর্ব করত। ভালো জহরতের কথা শুনলেই কেনার জন্যে তার হাত নিসপিস করত। জহরত সে ভালো চিনত, যদিও বুদ্ধি তার বিশেষ ছিল না।

চাবুক-হাঁকিয়ের বৌ দেখল আর কোনো উপায় নেই, তাই সে নিয়ে এল ঝাঁপিটা। জহরতগুলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রভু জিজ্ঞাসা করল:

'কত দাম?'

মেয়েটি যা-দাম চাইল তা অসম্ভব রকম বেশী। কর্তা দরাদরি শুরু করল। অর্ধেকে রফা হল। ছোট কর্তা একটা হুণ্ডি দিল সই করে — মানে, অত টাকা তো তার সঙ্গে ছিল না। তারপর ঝাঁপিটা কর্তা তার সামনে টেবিলের উপর রেখে বলল:

'যে-মেয়েটির কথা বলছিলে তাকে নিয়ে এসো।'

লোক ছুটল তানুশ্কাকে আনবার জন্যে। কিছু না ভেবেই সে সঙ্গে সঙ্গেই এল — ভেবেছিল বড় রকম একটা ফরমাশ পাবে। ঘরে ঢুকল, লোকজনে তা ভরা, আর মাঝখানে — সেই খরগোশটা, আগে যাকে সে দেখেছিল। খরগোশটার সামনে রয়েছে তার বাবার ঝাঁপিটা। সঙ্গে সঙ্গেই তানুশ্কা চিনতে পারল ছোট কর্তাকে।

'ডেকেছেন কেন?' তানুশ্কা জিজ্ঞেস করল।

কর্তার কিন্তু মুখ দিয়ে রা বেরয় না। শুধু তান্যুশ্‌কার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তাহলেও শেষ পর্যন্ত মুখ ফুটল:

'ওগুলো তোমার জহরত?'

'আমার ছিল, এখন অন্যের, ওঁর,' বলে তান্যুশ্‌কা চাবুক-হাঁকিয়ের বৌয়ের দিকে আঙুল দেখাল।

'এখন আমার,' বলল তুর্চানিনভ।

'ওটা আপনাদের ব্যাপার।'

'চাও, তোমায় ফিরিয়ে দিই?'

'প্রতিদান দেবার মতো আমার কিছুই নেই।'

'আচ্ছা, ওগুলো পরতে তুমি আপত্তি করবে না নিশ্চয়ই — দেখতে চাই ওগুলো পরলে কেমন দেখায়।'

তান্যুশ্‌কা বলল, 'পরতে আমার আপত্তি নেই।'

ঝাঁপিটা নিয়ে গয়নাগুলো বাছল, তারপর চটপট পরে ফেলল। কর্তা দেখে আর 'বাঃ! বাঃ!' করে। কেবল 'বাঃ' আর 'বাঃ', আর কোনো কথা নেই। তান্যুশ্‌কা গয়নাগুলো পরে দাঁড়িয়ে বলল:

'এই দেখুন। হল তো? এখানে দাঁড়িয়ে থাকার সময় আমার নেই। কাজ রয়েছে।'

কর্তা কিন্তু সবাইকার সামনেই বলে উঠল:

'আমাকে বিয়ে করো। করবে?'

তান্যুশ্‌কা শুধু হাসতে লাগল:

'যে আপনার সমানে সমানে নয় তার সঙ্গে কর্তার এভাবে কথা বলা ঠিক নয়।' তারপর গয়না খুলে চলে গেল। কর্তা কিন্তু তাকে ছাড়ল না। পরের দিন সে তান্যুশ্‌কার বাড়ী গেল বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। কাকুতি-মিনতি করে নাস্তাসিয়াকে, — তোমার মেয়েটিকে আমায় দাও।

নাস্তাসিয়া বলল, 'ওকে কিছুই জোর করব না। ওর যা মত তাই হবে। কিন্তু আমার মনে হয় এই সম্বন্ধ উপযুক্ত হবে না।'

তান্যুশ্‌কা সব শুনল। তারপর বলল:

‘এই আমার শর্ত। শুনেছি রাজবাড়ীতে একটা ঘর আছে যেটা আমার বাবা যে-মালাকাইট পেয়েছিলেন তা দিয়ে সাজানো। সেই ঘরে রাজরানীকে যদি আমায় দেখাতে পারো তাহলে বিয়ে করব।’

কর্তা যে সবকিছুতেই রাজী, সে আর বলতে। তক্ষুনি সে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যাবার জন্যে তৈরি হতে লাগল। চাইল তান্যুশ্‌কাও তার সঙ্গে যায়। বলল — তোমার জন্যে ঘোড়া আনিয়ে দেব। কিন্তু তান্যুশ্‌কা বলল:

‘বিয়ে হবার আগে বরের ঘোড়াতেও কনে আমাদের দেশে যায় না, আর আমরা এখনো বরকনেও নই। তুমি তোমার কথা রাখার পর এ নিয়ে আলোচনা হবে।’

সে জিজ্ঞাসা করল, ‘তাহলে কখন তুমি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে আসবে?’

তান্যুশ্‌কা বলল, ‘হেমন্তের উৎসবে সেখানে যাব। ভাবনা নেই। এখন যাও।’

চলে গেল কর্তা; চাবুক-হাঁকিয়ের বৌকে অবিশ্যি সঙ্গে করে নিয়ে গেল না, এমন কি তার দিকে ফিরেও তাকাল না। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে পেঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই শহরের সব লোককে জহরত আর মেয়েটির কথা বলল। অনেককেই দেখাল ঝাঁপিটা। লোকেরা অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠল মেয়েটিকে দেখার জন্যে। শরৎকালের মধ্যে তান্যুশ্‌কার জন্যে সে একটা বাড়ী ঠিক করে ফেলল, নানা ধরনের পোষাক আর জুতো কিনে রাখল সাজিয়ে। তান্যুশ্‌কা খবর পাঠাল সে এসেছে, আর কোন এক বিধবার সঙ্গে রয়েছে শহরের একেবারে শেষে।

সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হল তুর্চানিনভ:

‘এখানে রয়েছ কেন? এরকম জায়গায় থাকার কথা কেউ ভাবতে পারে? আমি একটা বাড়ী সাজিয়ে রেখেছি, একেবারে পয়লা নম্বরের।’

তান্যুশ্‌কা কিন্তু শুধু বলল:

‘এখানেই বেশ আরামে আছি।’

রাজরানীর কানেও জহরত আর তুর্চানিনভের ভাবী স্ত্রীর কথা পেঁছেছিল। বলল:

‘ভাবী বৌকে তুর্চানিনভ যেন আমায় দেখায়। তার কথা যা শুনেছি তা বিশ্বাস হয় না।’

তুর্চানিনভ এল তান্যুশ্‌কার কাছে — বলে, তৈরি হয়ে নিতে হয়। পোষাক বানাতে হবে রাজ দরবারের উপযুক্ত, মালাকাইট ঝাঁপির জড়োয়া গয়নাও পরা ভালো।

তান্যুশ্‌কা বলল:

'আমার পোষাক নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, কিন্তু গয়না নেব ধার হিসেবে। আর দেখো, আমার জন্যে যেন ঘোড়া পাঠিও না। নিজেই যাবার ব্যবস্থা করে নেব। রাজবাড়ীর ফটকের সামনে আমার জন্যে অপেক্ষা করো।'

তুর্চানিনভ খুব অবাক হয়ে গেল — কোথা থেকে তান্যুশ্‌কা ঘোড়া পাবে? আর রাজ দরবারে যাবার মতো পোষাক? কিন্তু প্রশ্ন করতে সাহস হল না।

বড়লোকেরা সব রাজ দরবারে হাজির, রেশম আর মখমলের পোষাক পরে গাড়ী চেপে তারা এসেছে। আগে থেকেই তুর্চানিনভ দেউড়ির কাছে ঘোরাঘুরি করছে, অপেক্ষা করছে তান্যুশ্‌কার জন্যে। অন্যরাও তাকে দেখার জন্যে কৌতূহলী, ঐখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। তান্যুশ্‌কা কিন্তু গয়না পরে খনির মেয়েদের মতো মাথায় রুমাল জড়িয়ে, নিজের ভেড়ার চামড়ার ওপর-জামা পরে নিঃশব্দে এল পায়ে হেঁটে। ওদিকে লোকে দেখে বলাবলি করে — কোথা থেকে এসেছে। ভিড় করে তারা চলল তার পিছন পিছন। রাজবাড়ীতে পৌঁছল তান্যুশ্‌কা, কিন্তু চাপরাশীরা তাকে ঢুকতে দেয় না। বলে, 'খনির লোকেদের ঢোকা মানা।' দূর থেকে তুর্চানিনভ তান্যুশ্‌কাকে দেখেছিল, কিন্তু তার কনে অমন একটা ভেড়ার চামড়ার ওপর-জামা পরে পায়ে হেঁটে আসছে, এতে চেনা-পরিচিতদের কাছে তার যে মাথা হেঁট হবে। তাই সরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। তান্যুশ্‌কা তখন খুলে ফেলল তার ওপর-জামা, আর চাপরাশীরা দেখে — আরে, পোষাক কী! রাজরানীরও যে ওরকমটি নেই! সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ঢুকতে দিল। তান্যুশ্‌কা তার রুমাল আর ভেড়ার চামড়ার ওপর-জামা খুলে ফেলতেই চারিদিকে সোরগোল উঠল:

'কে ইনি? কোন দেশের রাজরানী?'

তুর্চানিনভও মুহূর্তের মধ্যে হাজির। বলে:

'আমার ভাবী স্ত্রী।'

তান্যুশ্‌কা কিন্তু তার দিকে খুব কড়া চোখে চাইল। বলল:

‘সেটা পরে দেখা যাবে। কথা রাখো নি, কেন দেউড়ির কাছে ছিলে না?’

তুর্চানিনভ তখন একথা, সেকথা, মানে ভুল হয়ে গেছে, মাপ করে দাও।

রাজবাড়ীর যে-ঘরে যেতে বলা হয়েছিল গেল সেখানেই। তান্যুশ্‌কা চারদিকে তাকিয়ে দেখে, এটা তো সে ঘর নয়। আরো কড়া করে সে তুর্চানিনভকে বলল:

‘এ আবার কী জুচ্চুরি। বলেছিলাম-না, সেই ঘর যেটা আমার বাবার পাওয়া মালাকাইট দিয়ে সাজানো!’ তারপর সে রাজবাড়ীর ভিতর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল, যেন নিজের ঘর। ওদিকে সেনেটর, সেনাপতি-টেনাপতি সবাই চলল তার পিছন পিছন। বলে:

‘এ কী! তাহলে বোধ হয় ঐদিকেই যাবার কথা।’

লোকের ভিড়ে তিল ধারণের জায়গা রইল না। সবাই তারা তান্যুশ্‌কার দিকে তাকিয়ে। তান্যুশ্‌কা ওদিকে মালাকাইটের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে রইল। তুর্চানিনভও অমনি সেখানেই। সে বকবক করে চলল, এটা ঠিক হচ্ছে না, রাজরানী বলেছেন অন্য ঘরে তার অপেক্ষা করতে। তান্যুশ্‌কা কিন্তু শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল, চেয়েও দেখলে না, যেন তুর্চানিনভের অস্তিত্বই সেখানে নেই।

যে-ঘরে সবার আসার কথা ছিল সেই ঘরে গিয়ে রাজরানী দেখে সেটা খালি। কান-ভাঙানি দেওয়া লোকেরা তাকে তাড়াতাড়ি জানাল তুর্চানিনভের ভাবী স্ত্রী সবাইকে নিয়ে গেছে মালাকাইট হলে। রাজরানী ধমকাল বৈকি — কী সব স্বেচ্ছাচারী কাণ্ড কারখানা! মেঝেতে পা ঠুকল। মানে, রেগে গিয়েছিল খানিকটা। তারপর গেল মালাকাইট হলে। সবাই তাকে ঝুঁকে পড়ে কুর্ণিশ করে, তান্যুশ্‌কা কিন্তু দাঁড়িয়েই থাকে, নড়ে না।

রাজরানী হাঁক দেয়:

‘কই, দেখাও তো আমাকে স্বেচ্ছাচারী মেয়েটাকে, তুর্চানিনভের ভাবী স্ত্রী!’

তান্যুশ্‌কার কানে কথাগুলো যেতে ভ্রূ কুঁচকে সে তুর্চানিনভকে বলল:

‘এর মানে? আমি তোমাকে বলেছিলাম রাজরানীকে দেখাতে, আর এমন ব্যবস্থা করেছ যে আমাকেই দেখানো হচ্ছে তার কাছে। আবার তোমার শয়তানি। তোমাকে আর চেয়ে দেখতেও চাই না! নিয়ে নাও তোমার গয়না!’

এই বলে তান্যুশ্‌কা মালাকাইটের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল — আর মিলিয়ে

গেল। শুধু পড়ে রইল জহরতগুলো — যেখানে তার মাথা, গলা আর হাত ছিল দেয়ালের গায়ে সেই সব জায়গায় সেগুলো আটকে গিয়ে জ্বলজ্বল করতে লাগল।

সবাই দারুণ ভয় পেয়ে গেল বৈকি, রাজরানী তো ভিরমি খেয়েই পড়ল মেঝেয়। দারুণ হৈচৈ পড়ে গেল। তোলা হল রাজরানীকে। ডামাডোল একটু শান্ত হলে তুর্চানিনভের বন্ধুরা তাকে বলল:

'জহরতগুলো অন্তত তুলে নাও। অন্য কোনো জায়গা তো নয়, রাজবাড়ী! এখানকার লোকেরা ওগুলোর দাম জানে।'

তুর্চানিনভ তাই সেগুলো দেয়াল থেকে খুঁটে তুলতে গেল, কিন্তু যেগুলোকেই ছোঁয় সেগুলোই হয়ে যায় এক একটি বিন্দু — কোনোটা চোখের জলের মতো স্বচ্ছ, কোনোটা হলদে, আর কোনোটা রক্তের মতো ঘন লাল। কোনো জহরতই আর সে পেল না। হঠাৎ চোখে পড়ল মেঝের উপর একটা বোতাম পড়ে। সাধারণ কাঁচের একটা বোতাম, বোতলের কাঁচের মতো দেখতে। একেবারেই বাজে জিনিস। মনের দুঃখে সেটাই সে কুড়িয়ে নিল। যেই না হাতে নিয়েছে অমনি সেটা হয়ে গেল আয়নার মতো। তার ভিতর থেকে তাকিয়ে রয়েছে সবুজ-চোখ এক সুন্দরী, পরনে মালাকাইটের পোষাক আর সর্বাঙ্গে জহরতের অলঙ্কার, খিলখিল করে হাসছে:

'ছি, ট্যারাচোখো বোকা খরগোশ! আমায় বিয়ে করবে কিনা তুমি! তুমি কি আমার যুগ্যি?'

তারপর থেকে যেটুকু বুদ্ধি ছিল তুর্চানিনভ সেটুকুও হারাল। কিন্তু বোতামটি ফেলে দিল না। থেকে থেকেই সেটার দিকে তাকায়, আর বরাবরই সেই এক ব্যাপার — সেই সবুজ-চোখ মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে আর তাকে টিটকারি দেয়। মনের দুঃখে সে মদ খাওয়া ধরল, আকণ্ঠ ডুবে গেল দেনায়। তার আমলে আমাদের সমস্ত খনি আর একটু হলেই নিলামে উঠত।

এদিকে সেই চাবুক-হাঁকিয়ে চাকরি যাবার পর শুঁড়িখানায় দিন কাটাতে লাগল। যথা সর্বস্ব মদ খেয়ে উড়িয়ে দিল, কিন্তু সেই রেশমের ছবিটা হাত-ছাড়া করল না। কেউই জানে না পরে সেটার কী হল।

চাবুক-হাঁকিয়ের বৌয়েরও হাত শূন্য হয়ে গেল। কী জানো, সমস্ত লোহা আর তামা যখন বন্ধক পড়েছে তখন হুণ্ডি থেকে পাবেটা কী!

সেই থেকে আর কখনো তান্যুশ্‌কার খবর কেউই শোনে নি। যেন কখনই সে ছিল না।

নাস্তাসিয়া অবশ্য শোক পেয়েছিল, কিন্তু খুব বেশী নয়। জানোই তো, পরিবারের কাছে তান্যুশ্‌কা অবশ্য ছিল যেন ঘরের লক্ষ্মী, তাহলেও নাস্তাসিয়ার কাছে যেন পরের মেয়ে।

তাছাড়া তার দুই ছেলেই তখন বড় হয়ে উঠেছে। বিয়ে করেছে। নাতিনাতনি হয়েছে। ঘরে বহু লোক। কাজ কত — একে দেখো, ওকে দাও — মন খারাপ করার সময় কই!

কিন্তু ছোকরার দল বহুদিন ধরে তান্যুশ্‌কাকে ভোলে নি। কেবলি নাস্তাসিয়ার জানালার কাছে ঘুরঘুর করে। হয়তো আবার জানালায় তান্যুশ্‌কাকে দেখা যাবে। কিন্তু দেখা আর কখনোই গেল না।

তারপর অবিশ্যি একে একে তারা বিয়ে করল, কিন্তু থেকে থেকেই তাদের মনে পড়ে:

'ইস, কেমন একটি মেয়ে ছিল আমাদের খনিতে। জুড়ি নেই তার।'

হ্যাঁ, আরো একটি কথা; এই ঘটনাটার পর গুজব রটল, তামা পাহাড়ের ঠাকরুনের নাকি এক জুড়ি আছে: মালাকাইটের পোষাক-পরা দুটি মেয়েকেই লোকে দেখেছে একসঙ্গে।

পাথরের ফুল

থর-খোদাই কাজের জন্যে শুধু ম্রামোর এলাকার লোকেরা সেরা তা নয়, লোকে বলে আমাদের খনিতেও ও বিদ্যে জানা ছিল। তবে আমাদের কারিগররা অধিকাংশই কাজ করে মালাকাইট নিয়ে, কারণ এখানে মালাকাইট আছে অঢেল, আর সেরা জাতের। তা দিয়েই সব জিনিস খুব ভালো বানায়, আর এমন জিনিস, বলব কী, অবাক হয়ে যাবে: আরে উৎরাল কী করে।

সে সময় ছিল খুব ভালো এক কারিগর, তার নাম প্রকোপিচ। খোদাই-কাজে সেই ছিল সবচেয়ে ভালো, কেউই তার কাছাকাছি যায় না। তবে বুড়ো হয়ে উঠেছিল।

তাই গোমস্তাকে জমিদারবাবু বললেন প্রকোপিচকে যেন কয়েকজন শাগরেদ দেওয়া হয়।

'ওর বিদ্যেটা কোনো ছেলে শিখে নিক, তার সব গুপ্ত রহস্য।'

কিন্তু প্রকোপিচ — কে জানে, হয়তো সে তাঁর বিদ্যার গুপ্ত রহস্য জানাতে চাইছিল না, কিম্বা হয়তো অন্য কোনো কারণ ছিল — কাউকেই বেশী কিছু শেখায় নি। তার কাছ থেকে তারা শুধু পেয়েছিল কিল-চড়-ঘুষি। ছেলেটাকে সে মেরে সমস্ত মাথা ফুলিয়ে দিত, কান প্রায় টেনে ছিঁড়ে আনত, তারপর গোমস্তাকে বলত:

'ও ছোকরা কোনো কাজের নয়... চোখে নজর নেই, হাত চলে না।'

গোমস্তাকে নিশ্চয়ই বলা ছিল যেন প্রকোপিচের মন রেখে চলে।

'ও ছোকরা ভালো যখন নয়, তো নয়... আরেকজনকে দেব...' এইভাবে পরের ছেলেকে পাঠান হত।

ছেলেরা সবাই প্রকোপিচের শেখাবার ধাঁচটার কথা শুনেছিল। ভোরবেলা থেকেই তারা কান্না জুড়ত, প্রকোপিচের কাজে যেন না যেতে হয়। বাপ-মায়েরাও মার খাবার জন্যে নিজের ছেলেমেয়েদের পাঠাতে চাইত না, যেমন পারে, তাদের লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করত। তাছাড়া মালাকাইট খোদাই করার কাজটাও স্বাস্থ্যকর নয়। ধুলো একেবারে বিষ। তাই সরে থাকত।

কিন্তু জমিদারবাবুর হুকুম মনে ছিল গোমস্তার। তাই সে একের পর এক ছেলে পাঠিয়ে চলল। প্রকোপিচও তার অভ্যেস মতো কিছুদিন তাদের যন্ত্রণা দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দিত।

'বাজে ...'

গোমস্তা রেগে উঠল:

'কতদিন ধরে এই চলবে? বাজে, আর বাজে — কখন বলবে 'ভালো'? একেই শেখাও...'

কিন্তু প্রকোপিচ তার গোঁ ছাড়ে না:

'আমার আর কী... যদি চান তো দশ বছর ধরে শেখাতে পারি, কিন্তু তাতে কোনো ফলই হবে না।'

'তাহলে কী ধরনের ছেলে চাও?'

'আমার জন্যে কাউকে পাঠাবারই দরকার নেই। ছেলের জন্যে হেদিয়ে উঠছি না...'

এইভাবেই চলল। গোমস্তা আর প্রকোপিচ বহু ছেলেকে পরখ করে দেখল, কিন্তু ফল নেই — একে মাথার ওপর ফোলা আর মাথার ভিতরে চিন্তা, কী করে পালাই। কেউ কেউ ইচ্ছে করেই জিনিসপত্তর নষ্ট করত, প্রকোপিচ যাতে ভাগিয়ে দেয়।

তারপর এল দানিলা-'উপোসী'র পালা। ছেলেটির বাপ-মা কেউই নেই। বয়েস ধরো বারো কিম্বা একটু বেশী। লম্বা লম্বা পা, তবে হিলহিলে রোগা চেহারা, অবাক লাগে কী করে বেঁচে আছে। কিন্তু মুখটা তার সুন্দর, চোখদুটো নীল নীল, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। প্রথমে জমিদার বাড়ীতে তাকে করা হয়েছিল চাকর, তার কাজ রুমালটা, নস্যির কৌটোটা দে, ওখানে ছোট, এইসব আর কি। তবে এসব কাজের জন্যে সে জন্মায় নি। অন্য ছেলেরা খুব চটপটে, ডাকালেই খাড়া, আজ্ঞে,

বলুন। আর এই দানিলা কোনো কোণে গিয়ে আপন মনে ছবি আর কোনো সাজাবার জিনিসের দিকে চেয়ে থাকে। লোকে ডাকে, তার কানেও যায় না। প্রথম প্রথম অবশ্য পিটুনি দেওয়া হত, তারপর তার আশা তারা ছেড়ে দেয়:

'ছেলেটা আকাশ পাতাল কী সব ভাবে। চলে যেন শামুকের মতো। কখনোই ভালো চাকর হতে পারবে না?'

তাহলেও কারখানায় বা খনিতে পাঠানো হল না। খুব রোগা যে, সে কাজে সাত দিনও বাঁচত না। পাঠানো হল রাখালদের সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু সে কাজও সে ভালো করতে পারল না। যথাসাধ্য চেষ্টা করত বটে, কিন্তু সবকিছুই তার ভুল হত। সব সময় সে যেন থাকে কিসের ঘোরে। তাকিয়ে আছে ঘাসের দিকে, আর গরু চলে যায় এদিক-ওদিক। রাখাল লোকটি বুড়ো, দয়ামায়া আছে। অনাথ ছেলেটার জন্যে তার দুঃখ হত। কিন্তু তাহলেও ধমক দিত একেক সময়:

'তোকে দিয়ে হবেটা কী, দানিলা? নিজেরও সর্বনাশ করবি আর আমার বুড়ো পিঠটার ওপরেও চাবুক পড়বে। কী কাজে লাগবি? কী ভাবিস বল তো?'

'নিজেই জানি না, দাদু... শুধু — না, এমনি, কিছুই ভাবি না। দেখছিলাম... পাতার ওপর একটা পোকা গুটিগুটি হাঁটছে। এমনিতে ঘুঘু-রঙা ডানার তলায় হলদে একটুখানি ছিটে; পাতাটা মস্তো লম্বা আর চওড়া... তার ধার ঝাঁঝরিকাটা, একটু কোঁকড়ানো, ঠিক যেন ঝালর, আর রঙটা কালো। মাঝখানটা কিন্তু টকটকে সবুজ যেন সবে রঙ করা। তার ওপর দিয়ে পোকাটা চলেছে গুটিগুটি।'

'শোন দানিলা, তোর মাথায় কিছু নেই। এখানে কি তুই পাতার ওপর পোকা দেখার জন্যে এসেছিস? পোকাটা গুটিগুটি যাচ্ছে তো যাক। তোর কাজ গরু চরানো। মাথা থেকে সব আজগুবি ভাবনা ঝেড়ে ফেল, নইলে গোমস্তাকে বলে দেব!'

অবশ্য একটা কাজ দানিলার উৎরায়। শিঙা বাজাতে সে শিখেছিল বুড়ো লোকটার চেয়েও অনেক ভালো। একেবারে সত্যিকারের সুর। সন্ধেয় গরু বাড়ীতে ফিরে এলে মেয়েরা-গিন্নিরা বলত:

'একটা গান বাজিয়ে শোনাও, দানিলা।'

সেও বাজাতে শুরু করত, কিন্তু সেধরনের গান তারা কখনো শোনে নি। কখনো যেন শনশন করছে বন, কখনো ঝর্নার রিনিঝিনি, নানা গলায় ডাকাডাকি করছে।

তবে দাঁড়াত খাসা। ঐ সব সুরের জন্যে মেয়েরা দানিলার নানা কাজ করে দিত, কেউ সেলাই করে দিত জামাকাপড়, কেউ ঘরে-বোনা কাপড় থেকে টুকরো কেটে দিত তার পায়ে জড়াবার জন্যে, কেউ বানিয়ে দিত নতুন একটা কামিজ। আর খাবারের তো কথাই নেই, তাকে সবচেয়ে ভালো করে খাওয়াবার জন্যে পড়ে যেত কাড়াকাড়ি। দানিলার সুর শুনে বুড়ো রাখালও খুব খুসি। তবে তাতে একটু খারাপ দাঁড়াল। দানিলা একবার বাজাতে শুরু করলে মনে হত তার চরাবার মতো একটা গরুও বুঝি নেই। এই বাজনাই ওর কাল হল।

একদিন দানিলা যখন সুরের মধ্যে হারিয়ে গেছে আর বুড়ো লোকটি অল্পক্ষণের জন্যে ঢুলছে, তখন কয়েকটা গরু গেল দলছাড়া হয়ে। গরুগুলোকে জড়ো করে একসঙ্গে আনার সময় দেখা গেল এ গরুটা নেই, ও গরুটা নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু কোথায়? জায়গাটা ইয়েলনিচনায়ার পাশে। একেবারে বিজিবিজি বন, নেকড়ের জায়গা... শুধু একটা গরু খুঁজে পেল। কী আর করে, গরুর দলটা বাড়ীতে আনল, বলল, এই-এই ঘটেছে। খুঁজবার জন্যে লোকজন ছুটল খনি থেকে, কিন্তু একটাকেও পেল না।

জানোই তো, শাস্তি ছিল কেমন। দোষ করলেই পিঠের জামা তুলতে হত। আরো পোড়া কপাল এই যে, হারানো গরুগুলোর একটা ছিল গোমস্তার নিজের। এবার আর সহজে নিষ্কৃতি পাবার আশা নেই। প্রথমে বুড়োকে তারা নিয়ে গেল চাবুক মারতে। তারপর এল দানিলার পালা। এত সে রোগা আর চেহারাটা এমন প্যাঁকাটির মতো যে চাবুক-হাঁকিয়ে তো বলেই উঠল:

'এটা তো এক ঘায়েই ভেঙে পড়বে, প্রাণও যেতে পারে।'

তাহলেও, বেশ জোরেই সে চাবুক চালাল, দয়ামায়া করলে না, কিন্তু দানিলার মুখ থেকে একটা শব্দও বেরুল না। পড়ল দ্বিতীয় ঘা, তৃতীয় ঘা — তবুও ছেলেটার মুখ থেকে কোনো শব্দ নেই। চাবুক-হাঁকিয়ে তখন হিংস্র হয়ে উঠে যত জোরে পারল মেরে চলল, চেঁচাল:

'তোকে আমি চিৎকার করিয়েই ছাড়ব, ওরে জেদি কুত্তা! চেঁচা! চেঁচা!'

দানিলা থরথর করে কাঁপে, চোখের জল গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়ে, কিন্তু একটা শব্দও করল না। ঠোঁট কামড়ে সে চুপ করে রইল। চাবুক খেতে খেতে সে অজ্ঞান

হয়ে পড়ল, কিন্তু একটা শব্দও তার মুখ ফুটে বেরুল না। গোমস্তা অবশ্য সেখানে ছিল, অবাক হয়ে গেল সে।

'একজন আছে দেখছি যে মার খেতে পারে! ছেলেটা যদি বেঁচে থাকে তাহলে কোথায় তাকে পাঠাব এবার বুঝেছি।'

যাই হোক, দানিলা অবশ্য ভালো হয়ে উঠল। ভিখোরিখা দিদিমা তাকে খাড়া করে তুলল। শুনেছি, তেমন এক বুড়ি ছিল। টোটকা ওষুধের জন্যে তার ভারি নাম। গাছ-গাছড়ার তেজ জানত বুড়ি, জানত কোনটা দাঁতের ব্যথায় লাগবে, কোনটা মচকানোয় বা বাতে... সে নিজেই যেত গাছ-গাছড়া খুঁজতে, যখন সেগুলোর তেজ সবচেয়ে বেশী। সেই সব ঘাস পাতা আর শেকড় দিয়ে পাঁচন বানাত, সেদ্ধ করত, মলমের সঙ্গে মেশাত।

সেই বুড়ির কাছে দিব্যি ছিল দানিলা। জানো তো, ভারি দয়ামায়া ছিল বুড়ির, গল্প করতে ভালোবাসত; সারা ঘরে ঝুলছে শুকনো ঘাস আর ফুল আর শেকড়। দানিলা এটা দেখে ওটা দেখে আর তাকে জিজ্ঞেস করে — এটার নাম কী? কোথায় এটা জন্মায়? ফুল দেখতে কী রকম? বুড়িও তাকে সব বলে।

একদিন দানিলা তাকে প্রশ্ন করল:

'দিদিমা, আমাদের এখানকার সব ফুল চেনো?'

বুড়ি বলল, 'গরব করছি না, তবে লোকে যত জানে, সব চিনি।'

'কিন্তু অজানা ফুল বলে কিছু আবার আছে নাকি?'

ভিখোরিখা বুড়ি বলল, 'হ্যাঁ, তাও আছে। পাপোরা ফুলের কথা শুনেছিস? লোকে বলে সেণ্ট জনের দিনে নাকি তাতে ফুল ফোটে। যাদু ফুল। সেই ফুল দেখিয়ে দেয় কোথায় গুপ্তধন আছে। কিন্তু মানুষের পক্ষে অপকারী। তারপর এক ধরনের ফুল আছে যা দিয়ে পাথর ভাঙা যায়। সেটা আলেয়ার মতো। হাতে থাকলে যেকোনো তালা খুলতে পারবি। সেটা ডাকাতদের ফুল। তারপর রয়েছে পাথরের ফুল। লোকে বলে সেটা জন্মায় মালাকাইট পাহাড়ে। সাপ উৎসবের দিনে সেটার দারুণ শক্তি। কিন্তু যে-লোকের চোখে সেটা পড়ে তার কপালে দুঃখ আছে।'

'কেন, দিদিমা?'

'সেটা, মানিক আমার, আমি নিজেই জানি না। এটা আমার শোনা কথা।'

দানিলা হয়তো ভিখোরিখার কাছেই থাকত। কিন্তু গোমস্তার অনুচররা দেখল ছেলেটা খাড়া হয়ে উঠেছে। খবরটা দিতে তারা ছুটল। শুনে গোমস্তা দানিলাকে ডেকে পাঠাল। বলল:

'প্রকোপিচের কাছে যা, শেখ মালাকাইটের কাজ। ঠিক তোরই উপযুক্ত হবে।'

কিছুই করার নেই, দানিলাকে তাই যেতে হল, যদিও হাওয়ার ঝাপটাতেই তখন পড়ে-পড়ে।

তার দিকে একবার প্রকোপিচ তাকাল, বলল:

'পেয়েছে ভালো। তাগড়াই তাগড়াই ছেলেরাই আমার বিদ্যে শিখতে পারে না, একে দিয়ে কী করব, ভালো করে খাড়া হয়ে দাঁড়াতেও পারে না?'

প্রকোপিচ তাই চলল গোমস্তার কাছে:

'অমন ছোকরা আমার চাই না। দৈবক্রমে আমার হাতে মারা পড়তে পারে — তখন জবাবদিহি করো।'

গোমস্তা কিন্তু কোনো কথাই কানে তুলল না:

'দেওয়া হয়েছে, শেখাও। আর তা নিয়ে বাজে বকবক করো না। ছেলেটা প্যাঁকাটির মতো দেখতে হলে হবে কি, খুব শক্ত-সমর্থ।'

প্রকোপিচ বলল, 'তা আপনার যা মর্জি। যা বলার ছিল বলেছি। শেখাব, কিন্তু পরে আমায় যেন কেউ দোষ না দেয়।'

'দোষ দেবার কেউ নেই, ও ছোকরা একলা, ওকে নিয়ে যা খুসি করো।'

তাই বাড়ী ফিরে এল প্রকোপিচ, ওদিকে কাজের চৌকির কাছে এক চাবড়া মালাকাইটের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দানিলা। সেই চাবড়াটার উপর একটা দাগ রয়েছে যেখানে কিনার খোদাই করতে হবে। সেটার দিকে তাকিয়ে দানিলা মাথা নাড়াচ্ছিল। প্রকোপিচ ভেবে পেল না এই নতুন ছেলেটা করছে কী। তাই তার যা স্বভাব, রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করল:

'কী করছিস? কে তোকে বলেছে কাজ নাড়াচাড়া করতে? হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিস কী?'

দানিলা বলল:

'দাদু, আমার মনে হয় আপনার ও ধারটায় কিনার খোদাই করা ঠিক হবে না। দেখুন, নক্সাটা কীভাবে চলে গেছে। এখানে খোদাই করতে গেলে সেটা একেবারে কেটে ফেলবেন।'

প্রকোপিচ চিৎকার করে তাকে গালাগালি করলে বৈকি:

'কী বললি? নিজেকে মনে করিস কী? ওস্তাদ কারিগর? তুই কোনো কিছুই দেখিস নি, জানিস্ না আর বুদ্ধি দিতে আসিস! কী বুঝিস তুই?'

দানিলা বলল, 'এইটুকু বুঝি যে এটা নষ্ট হয়ে গেছে।'

'কে নষ্ট করলে? এ্যাঁ? ওরে নাকের পোঁটা, একথা তুই বলছিস আমাকে যে কিনা সবচেয়ে ওস্তাদ কারিগর!.. তোকে এমন মার মারব যে অক্কা পাবি!'

গালাগালি করল সে আর তড়পাল, কিন্তু দানিলার গায়ে সে হাতও দিল না। মানে, নিজেই সে মাথা ঘামিয়েছিল, কোন দিকে কিনার খোদাই করতে হবে। দানিলা একেবারে ঠিক কথাটাই বলেছে। চুটিয়ে গালাগালি করে প্রকোপিচ তারপর বেশ নরম করে বলল:

'তা বেশ, ভুঁইফোড় ওস্তাদ, দেখা তো, তোর মতে এটা কীভাবে করা উচিত।'

দানিলা দেখাতে লাগল, বলল:

'দেখুন, নক্সাটা কী দাঁড়াচ্ছে। কিম্বা আরো ভালো হয় চাবড়াটা আরো সরু করে ফেলুন, তারপর যেখানে নক্সা নেই সেই জায়গাতে কিনারটা খোদাই করুন আর স্বাভাবিক নক্সাটা রেখে দিন ওপরে।'

প্রকোপিচ গজরাতে লাগল:

'হুম-হুঁ... হুঁ... দেখছি তোর বেজায় বুদ্ধি, দেখিস যেন ছল্‌কে না পড়ে।' কিন্তু মনে মনে ভাবল: 'ছেলেটা ঠিকই বলেছে। এর কিছু হবে। কিন্তু কী করে ওকে শেখাই? এক চড়েই তো অক্কা।'

সাত-পাঁচ সে ভাবল, তারপর দানিলাকে প্রশ্ন করল:

'তুই কার ছেলেরে, দিগ্‌গজ?'

দানিলা নিজের কথা সব জানাল।

মানে, অনাথ, মাকে তার মনে পড়ে না, আর বাবা — তার নামটা পর্যন্ত জানে না। লোকে তাকে দানিলা-'উপোসী' নামে ডাকে, কিন্তু তার আসল পদবী কখনো সে শোনে নি। বলল, জমিদার বাড়ীটায় কেমন ছিল, কেন তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, গ্রীষ্মকালটা কীভাবে কাটায় গরু চরিয়ে, আর কীভাবে তাকে চাবুক মারা হয়।

বুড়োর খুব কষ্ট হল:

'দেখছি, ছোকরা, জীবনটা তো খুব ভালো কাটে নি, তার ওপর আবার তোকে পাঠানো হয়েছে আমার কাছে। আমাদের কাজ মোটেই সহজ নয়।'

তারপর আবার রাগ দেখিয়ে গজরাতে লাগল:

'খুব হয়েছে! ইস, একেবারে বোব্বুলে! লম্বা লম্বা কথা বললেই যদি কাজ হাসিল হত তাহলে সবাই হয়ে উঠত ওস্তাদ কারিগর। দিনরাত বকবক করা! শাগরেদ —, ছ্যাঃ! কাল তোর ধাত দেখা যাবে! খেয়ে নে, ঘুমবার সময় হয়েছে।'

প্রকোপিচ একা থাকত। বৌ মারা গেছে বহুকাল আগেই। মিত্রফানভ্না নামে এক বুড়ি পড়শী আসত তার সংসার দেখাশোনা করতে। সকালের দিকে বুড়ি কিছু রেঁধে ঝাড়-পোঁচ করে যেত, সন্ধেয় প্রকোপিচ নিজের জন্যে খুসি মতো কিছু ফুটিয়ে নিত।

রাত্রের খাবার শেষ হবার পর প্রকোপিচ বলল:

'এই বেঞ্চিটায় শুয়ে পড়।'

দানিলা জুতোজোড়া খুলে নিজের ঝুলিটি মাথার তলায় রেখে বাড়ীতে বোনা কোট গায়ে ঢেকে খানিক কাঁপল — শরৎকাল তো, কুঁড়ের ভিতর বেশ ঠাণ্ডা — কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। প্রকোপিচও শুল কিন্তু ঘুমতে পারল না। মালাকাইটের নক্সাটার কথা ক্রমাগতই তার মাথায় ঘুরতে লাগল। এপাশ-ওপাশ ফিরে উঃ আঃ করে সে উঠে পড়ল। মোমবাতি জ্বালিয়ে চৌকির কাছে গিয়ে চাবড়াটা নানাভাবে মাপতে শুরু করল। নানাভাবে খোদাই করতে চেষ্টা করল সে। কিনার চওড়া করে, সরু করে, এদিকে সরায়, ওদিকে সরায়, ওল্টায়। কিন্তু যতই করুক, দেখা গেল ছেলেটা নক্সা বোঝে আরো ভালো।

‘দেখো, কেমন তোমার ‘উপোসী’!’ প্রকোপিচ আশ্চর্য হয়ে গেল। ‘এমনিতে তো কিছুই না, অথচ বুড়ো ওস্তাদকে শেখাতে পারে। চোখ বটে! চোখ বটে!’

গুদাম ঘরে সে পা টিপে টিপে গিয়ে একটা বালিশ আর একটা বড় ভেড়ার চামড়ার আলখাল্লা বার করল। তারপর দানিলার মাথার তলায় বালিশ গুঁজে চামড়া দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিল তার শরীর:

‘ঘুমোরে বাছা, চোখওয়ালা।’

ছেলেটার ঘুম ভাঙল না, শুধু পাশ ফিরে ভেড়ার চামড়ার তলায় হাত-পা ছড়িয়ে দিল ,— ভালো গরম লাগল তো, — দিব্যি নাক ডাকাতে লাগল। প্রকোপিচের নিজের ছেলেপিলে ছিল না। দানিলাকে সে খুব ভালোবেসে ফেলল। দানিলা নিশ্চিন্তে মৃদু নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে, আর বুড়ো তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ভাবে সে, কী করে ছেলেটাকে শক্ত-সমর্থ করে তুলবে। এমন রোগা আর কাহিল দেখায়।

‘আমাদের বিদ্যে শিখতে এসেছে এধরনের রুগ্ণ ছেলে! ঐ ধুলো — সেটা তো বিষ, চট করেই পেড়ে ফেলবে। কিছুটা বিশ্রাম নিক, মোটা-সোটা হয়ে উঠুক, তারপর কাজ শেখাব। দেখা যাচ্ছে, ওকে দিয়ে হবে।’

পরের দিন দানিলাকে সে বলল:

‘সংসারের টুকিটাকি কাজ দিয়ে তুই শুরু কর। এই আমার রেওয়াজ। বুঝেছিস? প্রথমে কণ্টকী-লতার ফল পেড়ে আন, সবে সেগুলো ঠাণ্ডা পেয়েছে, ঠিক পিঠে হবার কথা। কিন্তু দেখিস যেন খুব দূরে যাস না। যতগুলো পাবি আনবি। একটুকরো রুটি সঙ্গে করে নিয়ে যাস বনের মধ্যে খাবার জন্যে। আর মিত্রফানভনার বাড়ীতে যাস, তাকে বলেছি গোটা দুই ডিম তোকে ভেজে দিতে আর এক ভাঁড় দুধ। বুঝলি?’

পরের দিন ছেলেটাকে সে বলল:

‘আমার জন্যে একটা গোল্ডফিঞ্চ ধরে আন যেটা জোরে জোরে ডাকে, আর একটা চন্‌মনে লিনেট পাখিও ধরবি। খেয়াল রাখিস সন্ধের আগেই ফিরতে হবে। বুঝলি?’

দুটো পাখি ধরে দানিলা বাড়ী নিয়ে এল।

‘বাঃ দুটোই বেশ ভালো,’ বুড়ো বলল। ‘আরও কয়েকটা ধরে আনগে যা।’

এইভাবেই চলতে লাগল। প্রতিদিনই প্রকোপিচ দানিলাকে কাজ দেয়, কিন্তু সবই সেগুলো খেলা। বরফ পড়া শুরু হওয়াতে পড়শীদের সঙ্গে ছেলেটাকে সে পাঠাল কাঠ নিয়ে আসতে — একটু সাহায্য কর। সাহায্য আর কী! যাবার সময় সে শুধু স্লেজে বসে ঘোড়া চালাল, ফেরার পথে বোঝার পিছন পিছন এল ফিরে। খানিক জিরিয়ে নিয়ে খেল রাত্রির খাবার আর ঘুমল মড়ার মতো। প্রকোপিচ তাকে কিনে দিল একটা গরম আলখাল্লা, টুপি, দস্তানা আর ফেল্টের জুতো। জানো তো, বুড়োর আর্থিক অবস্থা বিশেষ খারাপ ছিল না। ভূমিদাস ছিল বটে, কিন্তু খালাসি-খাজনা দিয়ে খাটত, রোজগারও করত। দানিলাকে সে সত্যি সত্যি ভালোবেসে ফেলল। ও যেন তার নিজের ছেলে। তাই কোনোকিছু দিতেই সে খুঁতখুঁত করত না। সময় না হওয়া পর্যন্ত তাকে রাখল কাজের ঘরের বাইরে।

আরামে থাকার দরুন দানিলাও সেরে উঠতে লাগল চটপট। সেও ভালোবেসে ফেলল প্রকোপিচকে সত্যিকরেই। কেই বা ভালো না বেসে পারে? বুঝতে পারল প্রকোপিচ তাকে স্নেহ করে। জীবনে এই প্রথম ভালোভাবে দিন কাটছে। কেটে গেল শীতকাল। যত খুসি দানিলা পারল দৌড় ঝাঁপ করে বেড়াতে। কোনো দিন সে পুকুরে সাঁতরায়, পরের দিন যায় বনে। প্রকোপিচের কাজ বহুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করে। বাড়ীতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় তাদের গল্পসল্প। দানিলা নানা গল্প প্রকোপিচকে বলে আর তাকে জিজ্ঞেস করে — এটা কী, কেন ওটা অমন হল? প্রকোপিচ তাকে বুঝিয়ে বলে, দেখিয়েও দেয়। দানিলা সব শিখে ফেলে। কখনো নিজেই চেষ্টা করে — ‘এইবার এটা করি…?’ প্রকোপিচ তখন তার কাজ লক্ষ্য করে, দরকার হলে করে সাহায্য, দেখিয়ে দেয় আরো ভালোভাবে কী করে করা যায়।

অবশেষে একদিন পুকুর পাড়ে দানিলাকে দেখতে পায় গোমস্তা। মোসাহেবদের সে জিজ্ঞেস করল:

‘ও ছেলেটা কে? কতদিন তাকে এখানে দেখছি। একটা জোয়ান ছেলে, সে কিনা কাজের দিনে মাছ ধরে বেড়াচ্ছে! কেউ নিশ্চয়ই ওকে কাজ থেকে সরিয়ে রাখছে…’

গোমস্তার চররা শীগ্‌গীরই সব খবর নিয়ে জানাল। গোমস্তার কিছু বিশ্বাস হল না।

বলল, 'ওকে নিয়ে এসো তো আমার কাছে। নিজেই দেখব।'

দানিলাকে তাই নিয়ে আসা হল গোমস্তার কাছে। সে জিজ্ঞেস করল:

'কোথাকার ছেলে তুই?'

দানিলা বলল:

'শাগরেদি করছি। মালাকাইট খোদাই করার কাজ শিখছি।'

তার কান চেপে ধরল গোমস্তা:

'ওরে হতভাগা, এইভাবে তুই কাজ শিখছিস!' দানিলার কান ধরে সে নিয়ে গেল প্রকোপিচের কাছে।

বুড়ো দেখে ব্যাপার সুবিধের নয়, ছেলেটাকে বাঁচাতে গেল:

'ওকে পাঠিয়েছিলাম একটা পার্চ মাছ ধরার জন্যে। টাটকা পার্চ খাবার ভারি সাধ। পেট খারাপ তো, অন্য খাবার খেতে পারি না। তাই ছেলেটাকে বলেছিলাম কিছু মাছ ধরে আনতে।'

গোমস্তা কথাটা বিশ্বাস করল না। দেখল, দানিলাকে একেবারে অন্য রকম দেখাচ্ছে। ওজন বেড়েছে, তার পরনে ভালো কামিজ আর পেণ্টুলুন, এমন কি একজোড়া বুটও। দেখা যাক দানিলাকে পরখ করে। বলল:

'আয় তো, দেখা ওস্তাদ তোকে কী শিখিয়েছে?'

দানিলা একটা এপ্রন পরে, চৌকির কাছে গিয়ে নানা কথা বলে আর এটা-ওটা দেখায়। গোমস্তা যাকিছু জিজ্ঞেস করে, সমস্তই তার জানা। কীভাবে গড়ন করতে হয়, পাথরের টুকো দিয়ে ঘষতে হয়, পালিশ করতে হয়, জুড়তে হয়, কী করে তামা কিম্বা কাঠের উপর হয় বসাতে — সমস্তই একেবারে তার নখদর্পণে।

গোমস্তা তাকে কত রকম পরীক্ষা করে প্রকোপিচকে বলল:

'একে দিয়ে দেখছি তোমার চলবে?'

প্রকোপিচ বলল, 'আমার নালিশ করার কিছু নেই।'

'নালিশ করছ না বটে, কিন্তু একে কুঁড়েমি করতে দিচ্ছ। একে পাঠানো হয়েছে তোমার বিদ্যে শেখবার জন্যে, আর এ কিনা ছিপ নিয়ে পুকুরে। সাবধান! তোমাকে

এমন তাজা পার্চ দেব যে জীবনেও ভুলবে না, ছেলেটাও স্বাদ টের পাবে।'

খানিক হম্বিতম্বি করে সে চলে গেল। প্রকোপিচের কিন্তু অবাক লাগে:

'আচ্ছা, দানিলা, এসব তুই কবে শিখলি? এখনো তো তোকে কিছুই শেখাই নি।'

দানিলা বলল, 'আপনি নিজেই তো আমাকে সব দেখিয়ে দিয়েছেন, বুঝিয়েছেন, আমিও লক্ষ্য করে দেখেছি।'

প্রকোপিচ এত খুসি হয়ে উঠল যে তার দু'চোখ ভরে গেল জলে।

বলল, 'দানিলা, তুই আমার ছেলে... আমি যা জানি তোকে সব শেখাব। কিছুই লুকোব না...'

তারপর থেকে অবশ্য দানিলার সুখের জীবন শেষ হল। পরের দিনই গোমস্তা তাকে ডেকে পাঠিয়ে বেগারি বরাদ্দ করল। প্রথম দিকটায় অবশ্য ছিল সহজ সহজ জিনিস — ব্রোচ, মেয়েরা যা পরে আর কি, বাক্স। তারপর নানা কাজ-করা মোমবাতি দানী, তারপর বাস্তবিকই মিহি কাজ। ফুলের পাপড়ি আর গাছের পাতা, ফুল আর নানা নক্সা। মালাকাইটের কাজ ভারি একঘেয়ে। দেখলে হয়তো মনে হয় না বিশেষ কিছু, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় সেটা তৈরি করতে। যাক, দানিলার সবকিছু অভ্যেস হয়ে গেল।

গোটা এক খণ্ড মালাকাইট থেকে একটা সাপ ব্রেসলেট বানাবার পর গোমস্তা মানল যে সে সত্যিকারের ওস্তাদ। জমিদারবাবুকে সে কথা লিখে জানাল:

'মালাকাইটের কাজে এক নতুন ওস্তাদ আমাদের হয়েছে দানিলা-'উপোসী'। ভালো কাজ করে বটে, কিন্তু বয়েস কম তো, কাজ করে একটু ঢিমে তালে। তাকে কি বেগারিতে লাগাব নাকি প্রকোপিচের মতো খালাসি-খাজনায় ছেড়ে দেব?'

আসলে কিন্তু দানিলা মোটেই ঢিমে তালে কাজ করত না, করত বরং আশ্চর্য চটপট, নিপুণ। প্রকোপিচ কিন্তু তাকে চালাকি শেখাল। গোমস্তা হয়তো কোনো কাজের জন্যে দানিলাকে পাঁচ দিন সময় দেয়, কিন্তু প্রকোপিচ বলে:

'এত কম সময়ে সে পারবে না। পনেরো দিন দরকার। ছেলেটা এখনো কেবল মাত্র শিখছে। যদি তাড়া দিই তাহলে সে শুধু পাথরটাই খারাপ করে ফেলবে।'

গোমস্তা এ নিয়ে অবশ্য খানিক তর্ক করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আরো কয়েকটা

দিন বাড়িয়ে দেয়। ফলে দানিলা ধীরেসুস্থে কাজ করতে পারে। গোমস্তাকে লুকিয়ে এমন কি সে খানিক লিখতে পড়তেও শিখল। একথা প্রকোপিচই তার মাথায় ঢোকায়। মাঝে মাঝে বুড়ো নিজেই দানিলার কাজ খানিক করে দেয়, কিন্তু নজরে পড়লে ছেলেটা কখনোই তা করতে দেয় না।

'সে কী, দাদু — থামুন! কী লজ্জার কথা — আমার হয়ে আপনার কাজ কি সাজে? মালাকাইটের গুঁড়ো লেগে লেগে আপনার দাড়ি তো হয়ে উঠেছে সবুজ, স্বাস্থ্যও পড়েছে ভেঙে, কিন্তু আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন!'

দানিলা তখন একেবারেই সুস্থ ও সবল। নেহাৎ পুরনো অভ্যেসের দরুনই লোকে তখনো তাকে ডাকত 'উপোসী' বলে, কিন্তু চেহারাখানা তার কী! লম্বা চেহারা, গোলাপী গাল, কোঁকড়া চুল আর হাসিখুসি — এমন এক ছেলে, যার ওপর যেকোনো মেয়েরই নজর পড়ে। প্রকোপিচ এমন কি তার জন্যে পাত্রী দেখতেও শুরু করে, কিন্তু দানিলা শুধু মাথা নাড়ায়:

'মেয়েরা তো আর পালাচ্ছে না। আগে আমি সত্যিকারের ওস্তাদ হই, তারপর ওকথা ভেবে দেখা যাবে।'

জমিদারবাবুর কাছ থেকে গোমস্তা উত্তর পেল:

'প্রকোপিচের ঐ চেলাকে দিয়ে আমার জন্যে একটা বড় পেয়ালা তৈরি করে পাঠিও। তারপর দেখা যাবে তাকে খালাসি-খাজনায় ছেড়ে দেব নাকি বেগারি চাপাব। শুধু খেয়াল রেখো, প্রকোপিচ যেন না দানিলাকে সাহায্য করতে পারে। যদি তা হয় তাহলে সেজন্যে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে।'

চিঠি পড়ে গোমস্তা দানিলাকে ডেকে পাঠাল। বলল:

'আমার এখানে তোকে কাজ করতে হবে। কাজের জায়গা দেব, আনিয়ে দেব যে পাথর চাস।'

কথাটা প্রকোপিচ শুনে একেবারে দমে গেল। ব্যাপার কী? কী এর কারণ? গেল গোমস্তার কাছে। কিন্তু গোমস্তা কি আর শোনে। হম্বিতম্বি করল, 'নিজের চরকায় তেল দাও!'

দানিলাকে তাই যেতে হল এক নতুন জায়গায় কাজ করতে। প্রকোপিচ তাকে সাবধান করে দিল:

‘দেখিস, দানিলা, যেন খুব চটপট কাজ করিস না! নিজেকে জাহির করিস না।’

প্রথম দিকে দানিলা সাবধান ছিল। এটা-ওটা সে পরখ করত, এদিক-ওদিক করত মাপজোপ। কিন্তু তাতে তার একঘেয়ে আর বিরক্তি ধরে গেল। বেশী কাজই করুক আর কম কাজই করুক, সেখানে তাকে বসে থাকতে হত সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত। এতে সে এত বিরক্ত হয়ে উঠল যে আর বরদাস্ত করতে পারল না। কাজে লাগল পুরো দমে। পেয়ালাটা তার হাতে উৎরাল চমৎকার। গোমস্তা সেটা তাকিয়ে দেখল, যেন এমনটিই হওয়ার কথা, বলল:

‘এটার মতো আর একটা তৈরি কর!’

দানিলা তৈরি করল দ্বিতীয়টা, তারপর আরো একটা। তৃতীয়টা শেষ হয়ে যাবার পর গোমস্তা বলল:

‘এবার আর ফাঁকি দিতে হচ্ছে না। তোর আর প্রকোপিচ দুজনেরই চালাকিটা ধরে ফেলেছি। আমার চিঠি পড়ে কর্তা একটা পেয়ালার মেয়াদ দিয়েছিলেন, আর সেই সময়ের মধ্যে তুই বানিয়েছিস তিনটে। আমাকে আর বোকা বানাতে হবে না। তোকে সামলাবার জন্যে উচিত শিক্ষা দেব ঐ বুড়ো শয়তানটাকে। অন্যদেরও শিক্ষা হবে!’

কর্তাকে সবকিছু লেখে সে, আর তিনটে পেয়ালাই পাঠিয়ে দিল। কর্তা কিন্তু — হয়তো তাঁর মতিভ্রম হয়েছিল, হয়তো বা কোনো কারণে গোমস্তার উপর চটেছিলেন — করলেন ঠিক উল্টোটি।

দানিলার উপর তিনি চাপালেন খালাসি-খাজনা এত কম যে ধর্তব্যই নয়। প্রকোপিচের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে মানা করলেন — তারা একসঙ্গে কাজ করলে হয়তো নতুন কিছু ভেবে বার করতে পারবে। চিঠির সঙ্গে তিনি পাঠালেন আরেকটা পেয়ালার ছক, তাতে নানা ধরনের নক্সা। তার একটা ধার হবে খোদাই-করা, মাঝখানে থাকবে আরো খোদাই-করা ফিতে আর নীচের সবটা হবে লতা-পাতা দেওয়া। মোট কথা, সুন্দর ছিল সেই নক্সাটা। কর্তা লিখেছিলেন: ‘পাঁচ বছর লাগুক তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু ঠিক এইরকমই যেন বানায়।’

গোমস্তাকে তাই কথা ঘোরাতে হল। দানিলাকে কর্তার কথা জানাল, নক্সা দিয়ে পাঠাল তাকে প্রকোপিচের কাছে।

দানিলা আর প্রকোপিচের আনন্দ আর ধরে না। কাজ চলল চটপট। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নতুন পেয়ালাটা তৈরি করার কাজে লাগল দানিলা। কাজটা কঠিন, একটা বেঠিক ঘা দিলেই সবটা মাটি — আবার শুরু করতে হবে একেবারে গোড়া থেকে। কিন্তু দানিলার চোখ নির্ভুল, হাত নিখুঁত, জোরও যথেষ্ট। কাজ তাই চলল ভালোই। শুধু একটা ব্যাপারে তার মন ধরল না। কাজটায় কারিগরি অনেক, কিন্তু কোনো সৌন্দর্যই নেই। কথাটা সে প্রকোপিচকে বললও। বুড়ো কিন্তু অবাক মানল।

'এ নিয়ে তোর মাথা ব্যথা কেন? ওরা যখন ঐভাবে এঁকেছে তখন ওরকমটাই চায়, আমি নিজেও কত কী খোদাই আর পালিশের কাজ করেছি, কিন্তু তাতে কী লাভ হয়েছে জানি না।'

গোমস্তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল দানিলা, কিন্তু কোথায়! লোকটা মাটিতে পা ঠুকে ঘুষি পাকিয়ে তেড়ে এল:

'তুই কি একেবারে পাগল হলি? ঐ নক্সা আঁকাতে এক ঝুড়ি টাকা খরচ হয়েছে। খুব সম্ভব শহরের সবচেয়ে বড় শিল্পীকে দিয়ে ওটা আঁকানো, আর তুই কিনা তার খুঁত ধরতে চাস?'

তারপর বোধ হয় কিন্তু কর্তার কথাটা তার মনে পড়েছিল — দুজনে তারা একসঙ্গে কাজ করলে হয়তো নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারবে। তাই বলল:

'আচ্ছা, তবে কর্তার নক্সার মতো এই পেয়ালাটা কর, তারপর তোর ইচ্ছে হলে তৈরি কর আর একটা তোর মনের মতো। যেমন ইচ্ছে সেরকমই বানাস। আপত্তি করব না। পাথর তো আমাদের অনেক। যেমন দরকার দেব।'

এদিকে দানিলা পড়ল মহা ফাঁপরে। লোকে বলে, অন্যের কাজের খুঁত ধরা সহজ, কিন্তু নিজে একবার নতুন কিছু ভেবে বার কর দেখি নি! তার জন্যে অনেক রাত চোখে ঘুম আসবে না। যে-পেয়ালার নক্সা তাকে দেওয়া হয়েছিল, দানিলা সেটা নিয়ে কাজ করে যায়, কিন্তু মন তার চলে যায় অনেক দূরে, ভাবে, কোন ফুলটা, কোন পাতাটা মালাকাইট পাথরে খুলবে সবচেয়ে ভালো। সবসময়ই কী যেন ভাবে, কেমন যেন মনমরা। প্রকোপিচের চোখে পড়ল, বলল:

'দানিলা, বাছা, তোর কি অসুখ করেছে? পেয়ালাটায় একটু ঢিলে দে। অত তাড়াহুড়োর দরকার কী? খানিক বেড়িয়ে এলে পারিস, ঐ কাজ নিয়ে সমস্ত দিন বসে আছিস তো আছিস।'

দানিলা বলল, 'হ্যাঁ, তাই যাব। কিছুক্ষণের জন্যে বনে যেতে পারি। যা চাইছি, তার দেখা হয়তো সেখানে পাব।'

তারপর থেকে প্রায় রোজই সে বনে যেতে শুরু করল। তখন ঘাস কাটার সময়, চতুর্দিকেই বুনো ফুল আর বেরি ফল। দানিলা মাঠের মধ্যে খানিক থামে, কিম্বা বনের ফাঁকায় গিয়ে চারিদিকে তাকায়। তারপর আবার ফিরে আসে মাঠে, আর তাকিয়ে থাকে ঘাস আর ফুলগুলোর দিকে, কী যেন খোঁজে। সে সময় মাঠে তো বহুলোক বসে, তারা তাকে শুধায়, কিছু সে হারিয়েছে নাকি। মনমরার মতো হেসে সে বলে:

'হারাবার তো কিছু নেই, কিন্তু যা চাই খুঁজে পাচ্ছি না।'

মানে, কেউ কেউ তো বলেই বসল ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ও ওদিকে বাড়ী ফিরে সোজা যায় চৌকির কাছে, আর বসে থাকে ভোর না হওয়া পর্যন্ত। সূর্য যখন ওঠে, আবার ফিরে যায় বনে আর মাঠে। শুরু করল যত ফুল আর পাতা বাড়ীতে আনতে, অধিকাংশই সেগুলো বিষাক্ত — বুনো রশুন আর হেমলক, ধুতুরা আর জলার চা, নানা ধরনের গাছগাছড়া। তার মুখ উঠল শুকিয়ে আর চোখ হয়ে উঠল পাগলের মতো। তার হাতের নির্ভুল দক্ষতা গেল হারিয়ে। প্রকোপিচ বাস্তবিক দুর্ভাবনায় পড়ল। দানিলা কিন্তু তাকে বলল:

'ঐ পেয়ালাটার জন্যে মনে আমার শান্তি নেই। এমনভাবে ওটা বানাতে চাই যাতে পাথরের তেজ পুরো ফোটে।'

প্রকোপিচ চেষ্টা করল তাকে বোঝাতে:

'ওটা নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছিস? খেতে পরতে পারছিস, আবার কী? যতদিন আমাদের শান্তিতে থাকতে দেন ততদিন বড়লোকরা নিজেদের খামখেয়াল নিয়ে থাকুন। তাঁদের মাথায় যদি কোনো নক্সা খেলে করে দেব। আমরা মাথা ঘামাব কেন? এটা ঘাড় পেতে বাড়তি বোঝা নেওয়া।'

দানিলা কিন্তু সেটা নিয়ে লেগেই রইল।

বলল, 'কর্তার জন্যে নয়। কিছুতেই এটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। মানে, দেখছি তো কেমন আমাদের পাথর, কী করছি তা দিয়ে? কাটি, খোদাই করি, ঘষি — সব বেফায়দা। এখন তাই ইচ্ছে চেপেছে, এমনভাবে বানাই যাতে পাথরের পুরো তেজ নিজেও দেখি, অন্যকেও দেখাই।'

কয়েক দিন পরে কর্তা যে-পেয়ালটা তৈরি করার আদেশ দিয়েছিলেন সেটা নিয়ে দানিলা আবার কাজে বসে। কাজ করে আর মনে মনে হাসে:

'পোকায় খাওয়া এক পাথরের ফিতে, কিনারটা ইঁদুরে কেটেছে।'

তারপর হঠাৎ সেই কাজ একপাশে সরিয়ে সে অন্য একটা কাজ শুরু করল। চৌকির কাছে দাঁড়িয়ে রইল, এমন কি বিশ্রাম নেওয়ার জন্যেও থামল না। প্রকোপিচকে বলল:

'আমার পেয়ালাটা আমি তৈরি করব ধুতুরা ফুলের গড়নে।'

বুড়ো তাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করল। প্রথমে দানিলা একটা কথাও শুনতে চাইল না, কিন্তু তিনদিন কিম্বা হয়তো চারদিন পরে, যখন সে আটকে গেল কাজটা দিল ছেড়ে। প্রকোপিচকে বলল:

'বেশ, তাই সই, প্রথমে আমি কর্তার পেয়ালা শেষ করব। আমারটা নিয়ে কাজ করব পরে। তখন কিন্তু আমায় বোঝাতে এসো না, মাথা থেকে কিছুতেই ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলতে পারছি না।'

প্রকোপিচ বলল:

'বেশ কথা। তোকে বিরক্ত করব না।' কিন্তু মনে মনে সে ভাবল: 'ছেলেটা ওটা নিয়ে হয়রান হয়ে পড়বে, যাবে ভুলে। বিয়ে দেওয়া দরকার, এই হল আসল ব্যাপার। সংসার পাতুক, তাহলে মাথা থেকে এলোমেলো ভাবনা সব দূর হবে।'

দানিলা আবার পেয়ালা নিয়ে কাজ শুরু করল। কাজ অনেক, একবছরেও শেষ হবার নয়। খাটতে লাগল জোর। সেই ধুতুরার কথাটা কখনো মনেও পড়ে না। প্রকোপিচ বিয়ের কথা পাড়ল:

'ওই তো ধর কাতিয়া লেতেমিনা রয়েছে, অপচ্ছন্দের কী আছে? ভালো মেয়ে। নিন্দের কিছু নেই।'

প্রকোপিচের কথার পিছনে ছিল খানিকটা চালাকি। মানে, হয়েছে কী, বহুকাল

থেকেই দানিলাকে সে তাকাতে দেখেছে কাতিয়ার দিকে, আর কাতিয়াও মুখ ফেরায় নি। তাই যেন হঠাৎই প্রকোপিচ তার সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করল। দানিলা কিন্তু গোঁ ছাড়ে না:

'আরে দাঁড়াও-না! আগে পেয়ালাটা শেষ করি। তিতি-বিরক্ত ধরে গেল এটায়। দেখো-না, হাতুড়ি ঠুকছি, আর উনি আবার বিয়ের কথা তুলছেন! কাতিয়ার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, সে সবুর করবে।'

তাই দানিলা কর্তার নক্সা-মাফিক পেয়ালাটা শেষ করল। গোমস্তাকে সে অবশ্য জানাল না। ভাবল, বাড়ীতে খানিক আমোদ-আহ্লাদ করা যাক। কাতিয়া, মানে তার ঐ কনে — সেও এল তার বাবা-মার সঙ্গে, তারা ছাড়া আরো কয়েকজনও এল। অধিকাংশই তারা মালাকাইট কারিগর। পেয়ালা দেখে কাতিয়া অবাক।

বলল, 'কী করে পাথরটা না ভেঙে ওরকম নক্সা খোদাই করতে পারলে, বলো তো। কী চিকন, কী মিহি কাজ!'

কারিগররাও প্রশংসা করল:

'নক্সার প্রতিটি লাইনের সঙ্গে মিলে গেছে। কোথাও একটি ভুল নেই। ভারি পরিষ্কার কাজ। এর চেয়ে ভালো আর হয় না। করেছও তাড়াতাড়ি। তা সত্যি, এইভাবে এগোলে তোমার সঙ্গে তাল রাখা আমাদের কঠিন হয়ে পড়বে।'

দানিলা অনেকক্ষণ শুনল, তারপর বলল:

'খুঁত নেই, এইটেই তো ওর দোষ। মিহি, চিকন, তকতকে নক্সা, যেমনটি আঁকা ঠিক তেমনিটি কাটা, কিন্তু সৌন্দর্য কোথায়? এই দ্যাখো একটা ফুল, একেবারে সাধারণ আগাছা, কিন্তু এর দিকে তাকালে আনন্দে বুক ভরে ওঠে। কিন্তু পেয়ালাটা — কে ওতে আনন্দ পাবে? এর মধ্যে ভালোটা কী? লোকে দেখে অবাক হবে এই কাতিয়ার মতো, বলবে — কী চোখ ওস্তাদের, কী হাত, পাথরটা না ভেঙে এই ধরনের নিখুঁত কাজ করার ধৈর্য কত?'

কারিগররা হেসে বলল, 'আর যদি কোথাও চটা উঠিয়েই থাকো, তাহলেও এমন জুড়ে তা পালিশ করেছ যে ধরাই যায় না।'

'হ্যাঁ, ঠিক কথা... কিন্তু সৌন্দর্যটা কোথায় — সেকথা বলো? এইখান দিয়ে একটা শির নেমে গেছে, আর সেটা কিনা ফুটো করেছি, ফুল খোদাই করেছি। কিন্তু

কী লাভ তাতে? পাথরটা নষ্ট করা। অথচ দ্যাখো, পাথরখানা কী! সেরা পাথর, বুঝেছেন, সেরা!'

খেপে উঠতে লাগল। দু'এক গেলাশ টেনেছিল হয়তো।

প্রকোপিচ যা বলত, অন্যান্য ওস্তাদরাও দানিলাকে সেই কথাগুলিই বলতে শুরু করল:

'পাথর পাথরই। কী আর হবে তাতে? আমাদের কাজ ঘষা আর খোদাই করা, ব্যস।'

কিন্তু সেখানে ছিল বুড়ো একটি লোক। প্রকোপিচ, তার শাগরেদ, অন্যরাও সবাই তাকে ডাকে দাদু। বয়েস হয়েছে খুব, সর্বাঙ্গ কাঁপে, কিন্তু কী নিয়ে যে কথা হচ্ছে তা সে বুঝতে পারল। দানিলাকে বলল:

তুই, বাছা, ওধরনের চিন্তা মাথায় আনিস না। মাথা থেকে এগুলো তাড়া। নইলে হয়তো ঠাকরুনের পাহাড়ে কারিগর বনবি...'

'তারা কারা, দাদু?'

'মানে, থাকে পাহাড়ে, কোনো মানুষ তাদের দেখতে পায় না। ঠাকরুন যা চান তৈরি করে দেয়। একবার তাদের কাজ আমি খানিক দেখেছিলাম। ওঃ, সে কী কাজ! এখানে সেরকম কাজ তোরা কখনোই দেখতে পাবি না।'

কথাটা শুনে সবাই কান খাড়া করে রইল। জানতে চাইল, কী সে দেখেছে।

বুড়ো বলল, 'নাগ-বলয়। কঙ্কণের জন্যে তোরা যেমন তৈরি করিস।'

'তাই নাকি, দেখতে কেমন?'

'এখানকার কোনোটার মতোই নয়, তোদের তো বলেছি। যেকোনো কারিগর দেখলেই বুঝবে আমাদের হাতের কাজ নয়। আমাদের তৈরি নাগ-বলয় যত ভালোই হোক না কেন, পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু এটা যেন জীবন্ত। সেটার পিঠের ওপর দিয়ে কালো একটা ডোরা, আর চোখ কী — এই বুঝি ফণা তুলে ছোবল মারবে। ওদের আর কী! ওরা যে দেখেছে পাথরের ফুল, জানে সৌন্দর্য কাকে বলে।'

দানিলা পাথরের ফুলের কথা শুনতেই ছেঁকে ধরল বুড়োকে। বুড়ো তাকে সত্যি কথাই বলল:

'তোকে, বাছা, বলতে পারব না। ওধরনের ফুলের কথা শ‍ুনেছি। কিন্তু সে ফুল আমাদের চোখে দেখার জন্যে নয়। দেখলে জীবন আর স‍ুখের হয় না।'

দানিলা শ‍ুধ‍ু বলল:

'আমার কিন্তু দেখতে ইচ্ছে করছে।'

সেকথা শ‍ুনে কাতিয়া — তার ঐ কনেটি — দার‍ুণ ঘাবড়ে গেল:

'সে কী, দানিলা, বলছ কী! জীবনে তোমার এতই বিরক্তি ধরে গেল?' কান্নায় সে ভেঙে পড়ল। প্রকোপিচ আর সবাই চেষ্টা করল কথাটা উড়িয়ে দিতে। ব‍ুড়োকে তারা উপহাস করতে লাগল:

'তোমার ভিমরতি ধরেছে, দাদ‍ু। একদম বাজে কথা। মাথা বিগড়ে দিচ্ছ ছেলেটার?'

শ‍ুনে ব‍ুড়ো চটে উঠে টেবিলে ঘ‍ুষি মারল:

'ওই ফুল আছে! ছেলেটা যা বলছে তা সত্যি — পাথরের মর্ম ব‍ুঝি না আমরা। সৌন্দর্য আছে সেই ফুলের মধ্যে।'

কারিগররা হাসাহাসি করে:

'একটু বেশী টেনেছ, দাদ‍ু!'

ব‍ুড়োর কিন্তু একই কথা:

'পাথরের ফুল আছেই!'

অতিথিরা যে যার পথে চলে গেল, কিন্তু পাথরের ফুলের কথাটা দানিলার মনে লেগে রইল। আবার সে শ‍ুর‍ু করল বনে বনে ঘ‍ুরে বেড়াতে, তার ধ‍ুতুরার দিকে চেয়ে থাকে, বিয়ের কথা মনেও পড়ে না। প্রকোপিচ তাকে তাগাদা দিতে শ‍ুর‍ু করল:

'কেন তুই মেয়েটাকে লজ্জায় ফেলছিস? আইবুড় হয়ে আরো কত বছর তাকে কাটাতে হবে? শীগ্‌গীরই তাকে নিয়ে গাঁয়ের লোক হাসিঠাট্টা করবে। গ‍ুজব যে কেমন জিনিস তা কি জানিস না?'

দানিলার ম‍ুখে কিন্তু সেই একই ব‍ুলি:

'একটু সব‍ুর করো, আগে ভাবনাটা প‍ুরো করে য‍ুতসই পাথর জোগাড় করি।'

গ‍ুমেশ্‌কির সেই তামার খনির কাছে সে ঘ‍ুরঘ‍ুর করতে শ‍ুর‍ু করল। বার

বার নীচে নামে, বার বার পাথর ওঠাবার সময় তাদের মধ্যে খ্ঁজে চলে। একদিন সে একটুকরো পাথর কুড়িয়ে হাতে ঘ্রিয়ে ঘ্রিয়ে দেখছিল, আপন মনে বললে:

'না, এটা সে জিনিস নয়...'

এমন সময় হঠাৎ শ্নতে পেল কে যেন বলছে:

'অন্য জায়গায় খোঁজ, সাপ-পাহাড়ে।'

দানিলা তাকিয়ে দেখে — কেউ নেই। কে হতে পারে? কেউ কি তামাসা করছিল?.. কিন্তু সেখানে ল্কোবার কোনো জায়গা ছিল না। আরো খানিক তাকিয়ে দেখল, তারপর ফিরল বাড়ী ম্খো। পিছন থেকে আবার সেই স্বর শোনা গেল:

'শ্নছ, দানিলা-কারিগর, বলছি সাপ-পাহাড়ে।'

আবার সে ফিরে তাকাল। আবছা দেখা গেল একটি মেয়ে, যেন নীল কুয়াশা। তারপর আর কিছ্ই নেই।

'এটা আবার কী?' দানিলা ভাবল। 'এ কি সেই ঠাকর্ন নয় তো? সাপ-পাহাড়ে গেলে কেমন হয়?'

জায়গাটা দানিলা ভালো করে চিনত, কারণ সেটা গ্মেশ্কির কাছেই। বহ্কাল আগেই সেটা গেছে শেষ হয়ে, সবকিছ্ নিয়ে যাওয়া হয়েছে খ্ঁড়ে। কিন্তু অতীতে ঠিক তার উপর থেকেই লোকে পাথর পেত।

পরের দিন দানিলা গেল সেখানে। নীচু পাহাড়, কিন্তু খাড়া। একটা পাশ সোজা নেমে গেছে, যেন কেউ সেটা থেকে একটা টুকরো কেটে নিয়েছে। নজর করার মতো এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হয় না। সবকটা স্তর দেখা যাচ্ছে।

সেই কাটা দিকটার কাছে দানিলা গেল। এক চাঙ্গড় মালাকাইট সেখানে উপর থেকে খসে পড়েছে। টুকরোটা বড়, এতো ভারি যে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। গড়নটি ঝোপের মতো। দানিলা বারবার সেটা দেখতে লাগল। ঠিক এই ধরনের জিনিসই সে চেয়েছিল — তলার দিকটা গাড়, শিরাগ্লো গেছে যেমনটি চাই। মানে, সবই ঠিক। খ্সি হয়ে উঠল দানিলা। ছ্টল ঘোড়া আনতে, পাথরটা নিয়ে এল বাড়ীতে। প্রকোপিচকে বলল:

'দ্যাখো, কেমন পাথর! শ্ধ্ আমার জন্যেই যেন তৈরি। শীগ্গীরই এবার পেয়ালাটা বানিয়ে ফেলব। আর তারপর করব বিয়ে। সত্যি, বহ্দিন কাতিয়া কাল

গ্নণছে। আর আমার পক্ষেও সেটা সহজ হয় নি। শ্নধ্ন এই কাজটাই আমাকে আটকে রাখছে। তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারলে হয়!'

পাথরটা নিয়ে দানিলা কাজ শ্নর্ন করে দিল। দিন আর রাত তার কাছে সমান। প্রকোপিচ কোনো কথা বলল না। সম্ভবত এটা শেষ হলে ছেলেটা শান্ত হবে... কাজ চলল এগিয়ে। তলার দিকটা দানিলা চেঁচে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গেই তা হয়ে উঠল যেন একটা আসল ধ্নতুরার ঝাড়। থোকা থোকা চওড়া পাতা, ঝাঁঝরিকাটা ধার, শিরা — সবকিছ্নই যেন আসল। এমন কি প্রকোপিচও বলল, একেবারে জীবন্ত ফুল, হাত বোলাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু উপরের দিকে যখন সে পেঁছিল তখন শ্নর্ন হল ম্নশকিল। পাশে সে খোদাই করল ডাঁটি আর পাতলা পাতা — পড়ে যে যায় না আশ্চর্য! পেয়ালাটা হল ঠিক ধ্নতুরার মতো। তাহলেও ঠিক তেমনটি নয়... গেছে নিষ্প্রাণ হয়ে, সৌন্দর্য গেছে হারিয়ে। দানিলার ঘ্নম গেল, তার পেয়ালাটার পাশে বসে ভাবে, কী করে ঠিক করা যায়, কী করে করা যায় আরো ভালো। প্রকোপিচ আর অন্য যেসব কারিগররা দেখতে এসেছিল সবাই খ্নব অবাক, — আর কী চায় ছেলেটা? দিব্যি হয়েছে পেয়ালাটা, কেউই কখনো অমন বানাতে পারে নি, আর তব্ন কিনা খ্নসি নয়। রোগে ধরেছে, চিকিৎসা দরকার। এইসব কথা শ্ননে কাতিয়া কাঁদতে শ্নর্ন করল। এতে দানিলার সম্বিত ফিরে এল। বলল:

'যাক গে, যথেষ্ট হয়েছে। দেখছি, আর উঁচুতে ওঠা আমার সাধ্যিতে নেই, পাথরের তাকত ধরতে পারলাম না।' নিজেই সে বিয়ের তাড়া দিতে লাগল। তবে তাড়া দেবার কী আছে, কনের তো সবকিছ্ন বহ্নকাল তৈরি। বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। দানিলা আবার ফিরে পেল মনের ফুর্তি। গোমস্তাকে বলল পেয়ালাটার কথা। সে এসে দেখে — বাঃ, কী অদ্ভুত কাজ! তক্ষ্ননি সে চাইল সেটা কর্তার কাছে পাঠাতে, কিন্তু দানিলা রাজী হল না:

'একটু সব্নর কর্নন, আরো খানিক করার আছে।'

তখন শরৎকাল, বিয়ের দিন স্থির হয়েছিল সর্প-ভোজ'এর কাছাকাছি। কে যেন বলল — অল্পদিনের মধ্যেই সব সাপ জড়ো হবে। দানিলা কথাটা শ্ননল, মনে হল যেন এটা একটা শ্নভ লক্ষণ। ফের মনে পড়ল মালাকাইট ফুলের কথা। কী যেন তাকে টানছে। ভাবল: 'সাপ-পাহাড়ে আর একবার শেষ বারের মতো গেলে কেমন

হয়, হয়তো কিছু জানা যাবে।' মনে পড়ল সেই পাথরের টুকরোটার কথা। 'যেন সেখানে রাখা হয়েছিল তারই জন্যে! আর খনির ভিতরকার সেই স্বর — তাকে বলেছিল সাপ-পাহাড়ে যেতে।'

দানিলা তাই গেল। মাটি তখন জমতে শুরু করেছে। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে সামান্য তুষার। সেই খাড়াই জায়গাটার কাছে গেল দানিলা, যেখানে পেয়েছিল পাথরটা। দেখে বিরাট একটা খোঁদল, কেউ যেন সেখানে খনি থেকে পাথর তুলেছে। কে খুঁড়েছে না ভেবেচিন্তে ভিতরে গেল। সে ভাবল: 'এখানে খানিকক্ষণ থেকে বাতাসের হাত এড়াব। জায়গাটা গরম...' চারদিক দেখতে লাগল সে, খোঁদলের গায়ে ধূসর একটা পাথর, যেন একটা চেয়ার। দানিলা সেটার উপর বসে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল আপন মনে। মাথা থেকে সেই পাথরের ফুলের কথাটা আর কিছুতেই যায় না। ভাবে: 'শুধু যদি সেটা এক ঝলক দেখতে পেতাম!' হঠাৎ তার বেশ গরম বোধ হতে লাগল, যেন গ্রীষ্মকাল ফিরে এসেছে। মাথা তুলতেই দেখে ঠিক তার উল্টো দিকে বসে রয়েছে তামা পাহাড়ের ঠাকরুন। তার রূপ আর মালাকাইটের পোষাক দেখে দানিলা সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারল সে কে। কিন্তু ভাবল:

'সম্ভবত এটা শুধুই আমার কল্পনা, বাস্তবিকই সেখানে কিছুই নেই।' তাই সে চুপ করে বসে থাকে, কিন্তু কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছে না। ঠাকরুনও বসে রইল চুপ করে, কী যেন ভাবে। তারপর জিজ্ঞেস করল:

'তা, কী গো দানিলা-কারিগর, তোমার ধুতুরা-পেয়ালাটা আর হল না?'

বলে, 'না, হল না।'

'ভেঙে পড়ো না, আবার চেষ্টা করো। মনের মতো পাথর তুমি পাবে।'

দানিলা বলে, 'না, আর পারব না। একেবারে জেরবার হয়ে গেছি। আমাকে সেই পাথরের ফুল দেখাও।'

ঠাকরুন বলল, 'সেটা তো খুবই সহজ, পরে কিন্তু আপসোস করবে।'

'পাহাড় থেকে ফিরতে দেবে না, নাকি?'

'কেন দেব না? পথ তো খোলাই আছে। তবে সব পথই আমার কাছে ফিরে আসে।'

'দেখাও আমায়! দয়া করো!'

কিন্তু ঠাকরুন তখনো তাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করল:

'চেষ্টা করো-না, নিজেই হয়তো বানাবে।' প্রকোপিচের কথাটাও মনে করিয়ে দিল ঠাকরুন। 'সে যে তোমার যত্ন আত্তি করেছে, এখন তার সেবা যত্ন করা তোমার উচিত।' তারপর বলল তার কনের কথা। 'মেয়েটি তোমায় মনে প্রাণে ভালোবেসেছে, কিন্তু তোমার মন পড়ে রয়েছে অন্য জিনিসে।'

দানিলা চিৎকার করে উঠল, 'ওসব কথা জানি! কিন্তু সেই ফুল না দেখলে আমার কাছে জীবনের মানে নেই। দেখাও আমাকে!'

ঠাকরুন বলল, 'তাই যদি চাও, তাহলে এসো, দানিলা-কারিগর, আমার বাগানে।'

বলতে বলতে ঠাকরুন উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে কী একটা আওয়াজ করে উঠল, যেন ধস নেমেছে। দানিলা দেখে কোনো দেয়ালই নেই। চারিধারে তার লম্বা লম্বা গাছ, কিন্তু আমাদের বনের গাছের মতো নয়, সব পাথরের। কোনোটা শ্বেত পাথর, কোনোটা সার্পেনটাইন — মানে, সবরকম পাথরের... কিন্তু জীবন্ত ডালপালা, পাতা। বাতাস বইলে দোলে আর একমুঠো নুড়ি ছুঁড়ে ফেললে যেরকম আওয়াজ হয়, তেমনি শব্দ করে। নীচের ঘাসও পাথরের, নীলচে, লাল — নানা ধরনের... সূর্য নেই, কিন্তু আলো ঠিক সূর্যাস্তের আগেকার মতো। গাছের ফাঁকে ফাঁকে সোনালী সাপ দুলছে আর মোচড়াচ্ছে, যেন নাচছে। তাদের থেকেই আসছে আলোটা।

তারপর ঠাকরুন দানিলাকে নিয়ে গেল বনের মধ্যেকার বিরাট এক ফাঁকা জায়গায়। জমিটা সাধারণ মাটির মতো। কিন্তু তার উপর রয়েছে মখমলের মতো কালো কালো ঝোপ। ঝোপ থেকে দুলছে মালাকাইটের বড় বড় সবুজ ঘণ্টা, আর তাদের প্রত্যেকটার ভিতরে সোনালী সুর্মার একটা করে তারা। ফুলের উপর উড়ছে আগুনে মৌমাছি আর তারাগুলো মৃদু টুংটাং করছে, যেন গান।

ঠাকরুন জিজ্ঞেস করে, 'কী গো, দানিলা-কারিগর, আশ মিটিয়ে দেখা হল?'

দানিলা বলে, 'এমনধারা জিনিস তৈরি করার মতো পাথর যে পাওয়া যায় না।'

'ওগুলোর কথা তুমি নিজে থেকে ভাবতে পারলে আমি পাথর দিতাম, কিন্তু এখন আর পারি না,' বলে ঠাকরুন হাত নাড়ল। আবার শোনা গেল সেই একই ধরনের শব্দ, আর দানিলাও ফিরে এল সেই গর্তে, সেই পাথরটার উপর। কী শনশনে বাতাস! মানে, শরৎকাল তো।

বাড়ী ফিরল দানিলা। আর ঠিক সেই দিনই কনের বাড়ীতে ধুমধাম। প্রথমে দানিলা ফুর্তির ভাব করল। গান গাইল, নাচল। কিন্তু তারপর যেন কুয়াশা নামল চোখে। ভয় পেয়ে গেল কাতিয়া:

'কী হয়েছে, দানিলা? যেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এসেছ।'

'আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। আর চোখে শুধুই লাল, সবুজ আর কালো ফুলকি। আলো দেখতে পাচ্ছি না,' বলল সে।

মজলিস ভেঙে গেল। প্রথা হচ্ছে, কনে আর তার সখিরা বরকে বাড়ী পৌঁছে দেবে। কিন্তু বর যখন মাত্র দু'তিনটে বাড়ীর পরেই থাকে, তখন সে পথ আর কতটুকুই বা। কাতিয়া তাই বলল:

'অনেক ঘুরে যাওয়া যাক। আমাদের রাস্তার শেষ পর্যন্ত যাব, তারপর ফিরব ইয়েলানস্কায়া দিয়ে।'

মনে মনে ভাবল: 'হয়তো তাজা বাতাসে দানিলার কি আর উপকার হবে-না।'

সখিদের আর কী — আহ্লাদে আটখান।

চেঁচিয়ে উঠল, 'নিশ্চয়ই, আমরা ওকে ভালো করে বাড়ী পৌঁছে দেব। ভারি কাছে থাকে, বেশ গান গেয়ে একটা বিদায়ও দেওয়া হল না।'

শান্ত রাত, সামান্য তুষার পড়ছে। ঠিক বেড়াবার মতো সময়টি। তারাও রওনা দিলে। বর-কনে সামনে, কাতিয়ার সখিরা আর যেসব ছোকরা এসেছিল নিমন্ত্রণে, তারা চলল খানিক পিছিয়ে। মেয়েরা গাইতে শুরু করল এক বিদায় সঙ্গীত। টানা টানা, করুণ, যেন মরা-কান্না। কাতিয়া দেখে: 'এটা একেবারেই ঠিক হচ্ছে না। দানিলার মন একেই খারাপ, আর ওরা কিনা এই বিলাপ শুরু করেছে।'

দানিলার মন ফেরাতে চেষ্টা করল সে। খানিক সে কথা বলে, তারপর আবার হয়ে ওঠে মনমরা। কাতিয়ার সখিরা ততক্ষণে তাদের বিদায় সঙ্গীত শেষ করে শুরু করেছে ফুর্তি করতে, ছোটাছুটি করছে, হাসছে। কিন্তু দানিলা চলল মুখ ভার করে, মাথা নামিয়ে। কত চেষ্টা করল কাতিয়া, চাঙ্গা করে তুলতে পারল না। বাড়ী পর্যন্ত এইভাবেই চলল। মেয়েরা আর ছোকরারা চলে গেল, কেউ এদিকে কেউ ওদিকে। দানিলা কিন্তু কোনো নিয়ম-রেওয়াজের পরোয়া না করে কনেকে এগিয়ে দিয়ে একলা বাড়ী ফিরল।

বহুক্ষণ আগে প্রকোপিচ ঘুমিয়ে পড়েছিল। দানিলা খুব চুপিসারে বাতি জ্বালিয়ে তার পেয়ালাগুলো ঘরের মাঝখানে নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ঠিক তখনই প্রকোপিচের কাশির দমক উঠল। কাশতে কাশতে প্রায় তার দম বন্ধ হয়ে এল। মানে, জানো তো, ততদিনে ভারি কাহিল হয়ে পড়েছিল বুড়ো। তার সেই কাশি দানিলার বুকে বিঁধল ছুরির মতো। পুরনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ল তার। বুড়ো লোকটির জন্যে ভারি কষ্ট হল। প্রকোপিচের কাশির দমক থামলে দানিলাকে জিজ্ঞেস করল:

'কী করছিস পেয়ালা নিয়ে?'

'এমনি দেখছি। দিয়ে দেবার সময় হয় নি কি?'

'বহুকাল খামকা জায়গা জুড়ে আছে। যতই করিস ওর চেয়ে আর ভালো করতে পারবি না।'

মানে, খানিক কথাবার্তা কইল, তারপর প্রকোপিচ আবার পড়ল ঘুমিয়ে। দানিলা শুল বটে, কিন্তু ঘুম আর কিছুতেই এল না। বিছানায় সে এপাশ-ওপাশ করে ফের উঠে পড়ল, আলো জ্বালিয়ে আবার পেয়ালাগুলো দেখে প্রকোপিচের কাছে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল...

তারপর সে একটা বড় হাতুড়ি নিয়ে ধুতুরার উপর প্রচণ্ড বাড়ি মারল। সেটা হয়ে গেল টুকরো টুকরো। কিন্তু অন্য পেয়ালাটা, কর্তার নক্সা মাফিক যেটা করা, সেটাকে সে ছুঁলেও না। শুধু তার মাঝখানে সে থুথু ফেলে বেরিয়ে গেল। সেই থেকে দানিলাকে আর পাওয়া যায় নি।

কেউ বলে তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, মারা গেছে বনের মধ্যে কোনোখানে। কিন্তু কেউ আবার বলে, ঠাকরুন তাকে তার পাহাড়ের কারখানায় কারিগর বানিয়েছে।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় একেবারে অন্য রকম। সে আরেক কাহিনী।

পাহাড়ের কারিগর

নিলা অদৃশ্য হবার পর তার বাগদত্তা কাতিয়া আইবুড় হয়ে রইল। দু'বছর কেটে গেল, হয়তো তিন বছরও। তার বিয়ের বয়েস যেতে লাগল পেরিয়ে। আমাদের অঞ্চলে বছর কুড়ি পেরিয়ে গেলেই মেয়েদের বলা হয় বুড়ি। ছোকরারা তাদের কাছে ঘটক পাঠায় কদাচিৎ, তাদের কথা শুধু ভাবে বিপত্নীক লোকেরাই। কিন্তু কাতিয়া বাস্তবিকই সুন্দরী ছিল, ছেলের দল তখনো লেগে রইল তার পিছনে। কিন্তু কাউকেই সে বিয়ে করল না।

বলত, 'আমি দানিলার কাছে কথা দিয়েছি।'

লোকেরা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল:

'কথা দিয়েছ, কিন্তু কিছুই তো হল না। একথা ভেবে এখন আর লাভ নেই। লোকটা মরে গেছে অনেকদিন।'

কিন্তু কাতিয়া ওধরনের কোনো কথাই শুনল না:

'দানিলার কাছে কথা দিয়েছি। হয়তো সে ফিরে আসবে।'

তাকে বোঝায়:

'বেঁচে নেই। নিশ্চয়ই মরে গেছে।'

কিন্তু তাকে টলানো গেল না:

'কেউ তাকে মরতে দেখে নি। আমার কাছে সে বেঁচে।'

তারা ভাবল মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বিরক্ত আর করল না। কেউ কেউ এমন কি তাকে ঠাট্টাও করল, নাম দিল তার 'মরালোকের কনে'। এই ঠাট্টার নামটা চালু হয়ে গেল, লোকে তাকে ডাকত 'কাতিয়া মের্তভিয়াকোভা', যেন তার অন্য কোনো নাম নেই।

সেই সময় একটা মড়ক লাগল, কাতিয়ার বাবা-মা দুজনেই গেল মরে। আত্মীয়স্বজন তার অনেক। তিন ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে, আর বোনেরাও কত কে জানে। কিন্তু সবাই তারা সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া বাধাল — কে বাপের বাড়ীতে থাকবে, কাতিয়া দেখল গোলমেলে ব্যাপার।

বলল, 'আমি গিয়ে দানিলার বাড়ীতে থাকব। প্রকোপিচ একেবারে বুড়ো হয়েছে, তার খানিক দেখাশোনা করতে পারব।'

ভাই-বোনেরা অবশ্য বোঝাতে লাগল:

'এটা ভালো দেখায় না। সত্যি বটে প্রকোপিচ বুড়ো, কিন্তু তাহলেও লোকেরা কানাঘুষা করতে পারে।'

সে বলল, 'আমার তাতে কী আসে যায়? আমার তো আর জিভ নোংরা হবে না। আর প্রকোপিচ আমার পর নয়, সে আমার দানিলার ধর্ম বাপ। তাকে তো আমি বাবা বলেই ডাকি।'

চলে গেল সে। সত্যি বলতে কি তার পরিবারের লোকেরা তাকে নিরস্ত করতেও খুব একটা চেষ্টা করে নি। ভাবল, একজন কমা মানে একটা ঝামেলা কমা। আর প্রকোপিচের কী, তাকে পেয়ে সে খুব খুসি হল।

বলল, 'আমার কথা যে মনে রেখেছ, কাতিয়া, তার জন্যে ধন্যবাদ।'

একসঙ্গে তারা ঘর-সংসার শুরু করল। প্রকোপিচ তার চৌকিতে বসে কাজ করে, আর এদিকে কাতিয়া ব্যস্ত থাকে বাগান, রান্না কিম্বা রুটি সেঁকা এইসব নিয়ে। দুজনের জন্যে বিশেষ কিছু করার নেই, তাছাড়া কাতিয়া চটপটে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার সব কাজ সারা। তারপর বসে সেলাই কিম্বা বোনা নিয়ে — করবার তো কত কী আছে। প্রথম দিকটা সবকিছু বেশ চলল, কিন্তু পরে প্রকোপিচ ভুগতে শুরু করল। একদিন কাজ করে তো দু'দিন শুয়ে থাকে বিছানায়। বুড়ো হয়েছে তো, খেটে খেটে কাহিল। কী করে তাদের চলবে এই নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল কাতিয়া।

'মেয়েদের সেলাই-ফোঁড়াই দিয়ে তো আর আমাদের খাবার জুটবে না। অন্য কাজ জানিও না।'

প্রকোপিচকে তাই বলল:

'বাবা, তোমার কাজ কিছু আমায় শেখাও-না, সহজ কিছু।'

প্রকোপিচের হাসি পেল।

'তুই ভাবছিস কী! মালাকাইট মেয়েদের কাজ নয়। সারা জীবনেও একথা শুনি নি।'

তা সত্ত্বেও প্রকোপিচ যখন কাজ করে, তাকে লক্ষ্য করতে সে শুরু করল। সামান্য সাহায্যও করে, যতটা সাধ্য। এখানটা খানিক উকো দিয়ে ঘষে দেওয়া, ওখানটা পালিশ করা। প্রকোপিচ তাকে দেখায় এটা-সেটা। অবশ্যই আসল সূক্ষ্ম কাজ নয়। ব্রোচের ধার ঘষা, ছুরি-কাঁটার জন্যে হাতল লাগানো, এধরনের জিনিস, যেসব ফরমাশ সে পায়। সস্তা জিনিস। তা দিয়ে সামান্য পয়সাই পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দুর্দিনে খানিকটা সুরাহা হয় তো।

প্রকোপিচ বেশী দিন বাঁচল না। তারপর কাতিয়ার ভাই-বোনেরা আবার তাকে নিয়ে পড়ল:

'তোকে এবার বিয়ে করতেই হবে। এখানে একা থাকবি কী করে?'

কিন্তু কাতিয়া তাদের থামিয়ে দিল:

'এটা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাবার কথা নয়। তোমাদের পছন্দসই কোনোরকম পাত্রেই আমার দরকার নেই। কোনো না কোনো দিন দানিলা ফিরে আসবেই। ঐ পাহাড়ে যা শিখতে চায়, তা শিখে আসবে।'

আতঙ্কিত হয়ে তার ভাই-বোনেরা চমকে উঠল:

'তোর মাথার ঠিক আছে তো, কাতিয়া? এসব কথা মুখে আনাও পাপ। বহুকাল আগেই মরে গেছে লোকটা, আর ও তার পথ চেয়ে আছে! এরপরে তুই ভূত দেখতে পাবি।'

বলল, 'তা নিয়ে আমার ভয় নেই।'

ওরা তখন বলল:

'কিন্তু তোর দিন চলবে কী করে?'

বলল, 'সেটা নিয়েও তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। আমি একাই চালিয়ে নেব।'

ভাই-বোনেরা তখন ভাবল, প্রকোপিচ নিশ্চয়ই কিছু টাকা রেখে গেছে। আবার সেই পুরনো ধুয়ো ধরল তারা:

'তুই একটা বোকা, টাকা যখন আছে, তখন বাড়ীতে মরদ থাকতেই হবে। সময় তো সুবিধের নয়, কেউ আসবে চুরি করতে। মুরগিছানার মতো তোর ঘাড় দেবে মটকে। তাতেই মরবি।'

'কপালে যা লেখা আছে ততদিনই বাঁচব।'

ভাই-বোনরা অনেকক্ষণ রইল, কেউ ধমকায়, কেউ বোঝায়, কেউ কাঁদে। কিন্তু কাতিয়া নিজের গোঁ ছাড়ে না:

'একাই চালিয়ে নেব। তোমাদের কোনো পাত্রেই আমার দরকার নেই। সে আমার আছে।'

তারাও চটে উঠল বৈকি:

'তাহলে আমাদের কাছে আসিস না কখনো!'

বলে, 'আমার আদরের ভাইয়েরা, সোহাগের বোনেরা, ধন্যবাদ তোমাদের। কথাটা মনে থাকবে। আর তোমরাও ভুলো না; পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া করো।'

ঠাট্টা করছে আর কি। তারাও দুম করে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

একেবারে একলা-একলাটি হয়ে পড়ল কাতিয়া। প্রথমে অবশ্য খানিক কাঁদল, কিন্তু পরে বলল:

'না! হাল ছাড়ব না!'

চোখ মুছে সে তার গৃহস্থালির কাজ শুরু করে দিল। ধোয়া-পাকলা, মাজা-ঘষা, সব পরিষ্কার করতে তো হয়। কাজ শেষ হতেই সে গেল চৌকির কাছে। সেখানেও সবকিছু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখল। যে-জিনিসটার তার দরকার নেই, সেটা সে সরিয়ে ফেলল আর যেটা সর্বদাই দরকার সেটা রাখল হাতের কাছে। সব গুছিয়ে গাছিয়ে সে বসল কাজে।

'দেখি, নিজেই অন্তত একটা তকমা তৈরি করতে পারি কিনা।'

বসল তো, কিন্তু যুতসই পাথর নেই। দানিলার ধুতুরা-পেয়ালার টুকরোগুলো অবশ্য তখনো ছিল। সেগুলো সে মূল্যবান সম্পত্তির মতো জমিয়ে রেখেছিল একটা

আলাদা পোঁটলা করে। প্রকোপিচের অবশ্য প্রচুর পাথর ছিল। তবে সবার আগে সে করত বড় বড় কাজ। তাই পাথরগুলো ছিল বড় বড় টুকরোয়। ছোট্ট সবগুলোই সে লাগায় সাজাবার জিনিস তৈরি করতে। কাতিয়া মনে মনে বলল:

'দেখছি, খনির ধসে যেতে হচ্ছে। যুতসই পাথর কি আর পাব না?'

দানিলা আর প্রকোপিচের কাছ থেকে সে শুনেছিল পাথরের জন্যে তারা যায় সাপ-পাহাড়ে, তাই সেখানেই গেল।

গুমেশ্‌কিতে তো বরাবরই অনেক লোক, কেউ পাথর কুড়িয়ে বেড়ায়, কিম্বা নিয়ে যায় বয়ে। কাতিয়ার দিকে সবাই চেয়ে চেয়ে দেখে, ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছে কোথায়। কাতিয়ার সেটা পছন্দ হল না। তাই ঢিবিটা পেরিয়ে পাহাড়ের অন্য পাশে চলে গেল। তখন সেখানে বন। তার ভিতর দিয়ে কাতিয়া সোজা চলে গেল সাপ-পাহাড়ে। তারপর বসল একটা পাথরের উপর। দানিলার কথা মনে পড়ায় তার বুক ব্যথা করে উঠল, অঝোরে গাল বেয়ে পড়তে লাগল চোখের জল। চারিদিকে কেবল বন, লোকজন নেই, তাই চোখের জল সে আর সামলাল না। ফোঁটা ফোঁটা করে সেগুলো পড়তে লাগল মাটির উপর। খানিক কাঁদার পর সে নীচের দিকে তাকাতেই দেখে — ঠিক তার পায়ের কাছে একটা মালাকাইট পাথর একেবারে মাটির মধ্যে পোঁতা। কোনো রকম গাঁতি নেই, শাবল নেই, খুঁড়ে তুলবে কী করে? কিন্তু দেখল হাত দিয়ে সামান্য নড়াতে পারছে। সেটা খুব শক্ত করে আটকে ছিল না। একটা গাছের ডাল নিয়ে পাথরটার চারিপাশের মাটি খুঁড়তে শুরু করল সে। খানিকটা খোঁড়াখুঁড়ি করার পর সহজেই সেটা বেরিয়ে এল মট্ করে — শুকনো ডাল ভাঙলে যেরকম আওয়াজ হয়। পাথরের টুকরোটা চ্যাপটা ধরনের, খুব বড় নয় — তিন আঙুল পুরু, চওড়ায় তোমার হাতের চেটোর মতো, লম্বায় আধ-হাতের বেশী নয়। অবাক হয়ে গেল কাতিয়া।

'ঠিক যেন আমার জন্যেই। কেটে-কুটে তকমা হবে কত। কিছুই প্রায় লোকসান যাবে না।'

পাথরটা সে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কাটতে বসল। তাড়াতাড়ির কাজ নয়, গেরস্থালিও আছে। তাই সমস্ত দিনই তাকে থাকতে হত ব্যস্ত, শোক করার সময় ছিল না। কিন্তু চৌকিতে বসলেই মনে পড়ত কেবল দানিলার কথা:

'নতুন এই কারিগরটিকে যদি দানিলা শুধু একবার দেখতে পেত! দানিলার আর প্রকোপিচের জায়গা নিয়েছে যে!'

অনেকেই অবশ্য ঠাট্টা করত, সে কি আর বাদ যায়।

কোন এক পরবের আগে কাতিয়া যখন অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করছিল, তিনটে ছোকরা এল তার বেড়া টপকে। হয়তো ভয় দেখাতে চেয়েছিল, হয়তো আরো কিছু, ওরাই জানে। তবে সবাই তারা ছিল মাতাল। কাতিয়া করাত চালাচ্ছিল, তাই শুনতেই পায় নি যে অলিন্দে লোক। টের পেল যখন তারা ভিতরের দরজায় ঘা দিতে শুরু করেছে:

'এই, দরজা খোলো, মরালোকের কনে! জ্যান্ত কয়েকজন এসেছে, তাদের ডেকে বসাও!'

প্রথমে কাতিয়া চেষ্টা করল ভালো কথা বলতে:

'চলে যাও, বাপু, তোমরা!'

কিন্তু লাভ হল না। ক্রমাগতই তারা চলল দরজায় ধাক্কা দিয়ে, এই ভাঙে ভাঙে। কাতিয়া তখন হুড়কো সরিয়ে দরজা খুলে দিল।

'সাহস থাকে তো ভিতরে এসো। কার ঘাড়ে এটা প্রথম পড়বে?'

তারা দেখে, কাতিয়া দাঁড়িয়ে আছে কুড়ুল নিয়ে।

বলল, 'এই, ঠাট্টা রাখো।'

কাতিয়া বলল, 'ঠাট্টা? যেই ঘরে পা দেবে, তার মাথায় এটা পড়বে।'

নেশা করে এলেও ওরা বুঝল ব্যাপারটা ঠাট্টার নয়। মেয়েটি লম্বা, কাঁধদুটো সোজা, আর চোখে কড়া চাউনি। বোঝা যাচ্ছে কুড়ুল চালাতে জানে। তাই ঢুকতে সাহস করল না। খানিক চেঁচামেচি করল, তারপর গেল পালিয়ে। নিজেরাই ব্যাপারটা অন্যদের বললে। তারা টিটকারি দিল, তিন জোয়ান কিনা পালিয়ে এল একটা মেয়ের কাছ থেকে। তাদের অবিশ্যি এটা ভালো লাগল না, তাই তারা এক গল্প ফাঁদল: কাতিয়া নাকি একা ছিল না, তার পিছনে দাঁড়িয়েছিল সেই মরালোকটি।

'আর এমন সে ভয়ংকর যে আপনা থেকেই পা ছুটতে থাকে।'

অন্য লোকে হয়তো কথাটা বিশ্বাস করে, হয়তো করে নি, কিন্তু সেই থেকে লোকের মধ্যে রটে গেল:

'বাড়ীটা ভালো নয়। একলা-একলাটি যে মেয়েটা রয়েছে সেকি আর অমনি।'

কথাটা কাতিয়ার কানে উঠল, কিন্তু কোনোই পরোয়া করল না। ভাবল: 'রটাক না, ভালোই তো যদি সামান্য ভয় পেয়ে থাকে। আর কখনো তাহলে ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করবে না।'

পড়শীরা তাকে কারিগরি করতে দেখে অবাক হল। ঠাট্টা করতে লাগল:

'পুরুষ মানুষের কাজে নেমেছে! কী পারবে!'

এটা আরো খারাপ। নিজেই কাতিয়া ভাবছিল: 'আমি কি একলা কিছু পারব?' কিন্তু তারপর আবার সাহসে বুক বাঁধল। 'বাজারের জিনিস — তাতে আর কতটা কারিগরি লাগে? শুধু চিকন হলেই হল। সেটুকু কি আর পারব না!'

পাথরটা কাতিয়া করাত দিয়ে চিরতেই দেখে আশ্চর্য তার নক্সা। একদৃষ্টিতেই পরিষ্কার বোঝা গেল, কোনখান থেকে তার কাটা উচিত। কাজটা কী রকম ভালো এগিয়ে চলছে দেখে অবাক হয়ে গেল কাতিয়া। যেসব জায়গায় কাটা উচিত বলে মনে হচ্ছিল, সেইসব জায়গায় পাথরটা সে কাটল। তারপর শুরু করল ঘষতে। সেটা শক্ত কাজ নয়, কিন্তু তার জন্যে দরকার অভ্যেস। প্রথম দিকে অসুবিধা হচ্ছিল, তারপর রপ্ত হয়ে গেল। কী সুন্দর হয়ে দাঁড়াল তকমাগুলো, অথচ একটুকরোও নষ্ট হয় নি, শুধু ঘষবার সময় যেটুকু ঝরে গেছে সেটুকু ছাড়া।

তকমাগুলো শেষ করল কাতিয়া, অবাক হল কী যুতসই পাথর। তারপর ভাবতে শুরু করল কোথায় সেগুলো বিক্রি করা যায়। প্রকোপিচ ওধরনের জিনিস শহরে নিয়ে গিয়ে একটা দোকানে দিত। বহুবার কাতিয়া কথাটা শুনেছিল। তাই, স্থির করল সেখানে যাবে।

ভাবল: 'জিজ্ঞেস করব, আমার তৈরি জিনিস তারা নেবে কিনা।'

কুঁড়ে বন্ধ করে সে পায়ে হেঁটে রওনা দিল। পোলেভায়ার কেউই লক্ষ্য করল না সে শহরে গেছে। যে-বেনে প্রকোপিচের জিনিস কিনত, তার দোকান সে খুঁজে বার করল, তারপর সোজা চলে গেল তার কাছে। দেখে, দোকানটা পাথরের জিনিসে ভরা, একটা পুরো কাঁচের আলমারি-ভরা রয়েছে শুধু মালাকাইটের তকমা। অনেক

লোক সেখানে, কেউ কিনছে, কেউ মাল দিতে এসেছে। দোকানীর চেহারা ভারি গুরু-গম্ভীর আর ভারিক্কি।

প্রথমে কাতিয়ার ভয় হল। কিন্তু তারপর সাহস করে গেল এগিয়ে, জিজ্ঞেস করল:

'মালাকাইটের তকমা নেবেন কি?'

দোকানী আলমারির দিকে আঙুল তুলে দেখাল:

'দেখতে পাচ্ছ না ও মাল আমার কত?'

অন্যান্য কারিগররা, নিজেদের জিনিস বিক্রি করতে এসেছিল যারা, ধুয়ো ধরল কথাটার:

'অনেকেই এখন ওধরনের জিনিস তৈরি করতে যায়। কেবল পাথর নষ্ট করে। জানেই না যে তকমার জন্যে দরকার ভালো নক্সার।'

এক কারিগর এসেছিল পোলেভায়া থেকে। দোকানীকে কানে কানে সে বলল:

'মেয়েটা বোকা গোছের। পড়শীরা ওকে দেখেছে কারিগরি করতে। দেখো-না, কী কিসিম বানিয়েছে।'

দোকানী তখন বলল:

'বেশ, দেখাও কী তোমার আছে?'

কাতিয়া তার হাতে একটা তকমা তুলে দিল। সেটার দিকে একবার তাকিয়েই কাতিয়াকে চেপে ধরল।

'কোথা থেকে চুরি করে এনেছ?'

কাতিয়ার রাগ হল বৈকি। এবার অন্য সুরে বলল:

'লোকটাকে জানো না, চেনো না, তাকে একথা বলার কী অধিকার আছে তোমার? চোখ থাকলে এই দ্যাখো! কোথা থেকে এই সমস্ত তকমা চুরি করতে পারি, সবগুলো একই নক্সার? কী বলো?' জিনিস-বিক্রির জায়গায় সেগুলো সে উজাড় করে ঢেলে দিল।

দোকানী আর কারিগররাও দেখে — সত্যি, সবগুলো একই নক্সার। আর এমন ধরনের যা সচরাচর দেখা যায় না। যেন মাঝখানে একটা গাছ, ডালে পাখি, আরো

একটা পাখি রয়েছে তলায়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কাজটাও পরিষ্কার। খদ্দেররা কথাটা শুনে দেখার জন্যে ভিড় করে এল, দোকানী কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে তকমাগুলো ঢেকে ফেলল। একটা ছুতোও দিল।

'গাদাগাদির মধ্যে ওগুলো ভালো করে আপনারা দেখতে পাবেন না। এক্ষুনি কাঁচের তলায় সাজিয়ে রাখছি। তখন পছন্দ মতো বেছে নিতে পারেন।' কাতিয়াকে বলল, 'ওই দরজা দিয়ে যাও। এক মিনিটের মধ্যেই টাকা পাবে।'

কাতিয়া চলল, পিছন পিছন এল দোকানী। দরজাটা বন্ধ করে তাকে জিজ্ঞেস করল:

'কী দাম চাও?'

কাতিয়া জানত প্রকোপিচ কী দাম পেত। সেই দামের কথাই সে বলল। দোকানী কিন্তু হেসে উঠল হো-হো করে:

'সে কী? এ দর, বলছ-টা কী, পোলেভায়ার- কারিগর প্রকোপিচ আর তার পোষ্য পুত্র দানিলা ছাড়া আর কাউকে কখনো দিই নি। কিন্তু তারা যে ছিল ওস্তাদ কারিগর!'

কাতিয়া বলল, 'তাদের কাছেই শুনেছি। আমি সেই পরিবারেরই মেয়ে।'

আশ্চর্য হয়ে গেল দোকানী, 'বটে! জিনিসগুলো তাহলে দানিলা রেখে গেছে তোমার কাছে?'

বলল, 'না, এগুলো আমারই হাতের কাজ।'

'পাথর হয়তো তারই?'

'পাথরটাও নিজেই পেয়েছি।'

বোঝা গেল দোকানী তার কথা বিশ্বাস করে নি, তাহলেও সে আর দরাদরি করল না, তাকে সৎভাবেই হিসেব চুকিয়ে দিল। এমন কি বললও:

'যদি ওরকম আরো তৈরি করতে পারো, তাহলে নিয়ে এসো। বিনা আপত্তিতে কিনে নেব, দামও দেব ভালো।'

চলে গেল কাতিয়া খুসি হয়ে — ভাব একবার, কতগুলো টাকা! দোকানী ওদিকে কাঁচের তলায় তকমাগুলো রাখল। খদ্দেররা এল দৌড়ে।

'কত দাম?'

সে অবশ্যি ভুল করে নি — যা দিয়েছে তার দশ গুণ দাম হাঁকল। লোকদের বলতে লাগল:

'এধরনের নক্সা সত্যি আপনারা কখনো দেখেন নি। পোলেভায়ার ওস্তাদ কারিগর দানিলার তৈরি। এর জুড়ি নেই।'

বাড়ী ফিরল কাতিয়া। কেবলি অবাক লাগে তার।

'দ্যাখো কাণ্ড, আমার তকমাই দেখছি সবচেয়ে ভালো! হঠাৎ একটুকরো ভালো পাথর পেয়ে গিয়েছিলাম। ভাগ্যি ভালো।' কিন্তু তারপর হঠাৎ টনক নড়ল: 'ওটা আমায় দানিলা দেয় নি তো?'

কথাটা ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই সময় নষ্ট না করে সে ছুটল সাপ-পাহাড়ে।

এদিকে হয়েছে কি, সেই মালাকাইট খোদাইকারী, দোকানীর কাছে কাতিয়াকে যে অপদস্ত করতে চেয়েছিল, সেও ফিরল বাড়ী। কাতিয়া ওধরনের দুর্লভ নক্সা পাওয়ায় হিংসে হয়েছিল তার। ভাবল:

'দেখতে হবে কোথা থেকে সে পাথর পায়। হয়তো প্রকোপিচ কিম্বা দানিলা তাকে কোনো নতুন জায়গা দেখিয়ে গেছে।'

দেখল, কাতিয়া কোথায় যেন ছুটে চলেছে, সেও পিছু নিল। কাতিয়া গুমেশ্‌কির একপাশ ঘুরে সাপ-পাহাড়ের উপর কোথায় যেন গেল। কারিগরও তার পিছু পিছু, ভাবল: 'ওখানে তো শুধুই জঙ্গল। গর্তটা পর্যন্ত গুড়ি মেরে যেতে পারব।'

বনের মধ্যে ঢুকল তারা। কাতিয়ার কাছেই সে, কাতিয়া কিন্তু কিছুই সন্দেহ করল না, একবারও পিছন ফিরে তাকাল না কিম্বা থামল না কান পেতে। এরকম সহজে একটা নতুন জায়গা আবিষ্কার করতে চলেছে ভেবে কারিগর খুবই খুসি হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ একপাশে একটা শব্দ শোনা গেল, ভয় পেয়ে গেল কারিগর। কিসের শব্দ? যখন সে সেখানে ভাবছিল, ততক্ষণে কাতিয়া হয়ে গেল অদৃশ্য। সে শুরু করল দৌড়তে বনের মধ্যে, গুমেশ্‌কি থেকে প্রায় একটা ক্রোশ দূরে সেভেরনা'র পুকুরে গিয়ে উঠল।

কাতিয়া স্বপ্নেও ভাবে নি কেউ তার ওপর নজর রেখেছে। যেখানে সে প্রথম পাথরের টুকরো পেয়েছিল, পাহাড়ের উপর চড়ে ঠিক সেই জায়গায় এল। মনে হল

গর্তটা যেন বড় হয়ে গেছে। তার পাশে প্রথম পাথরের টুকরোটার মতো সে আর একটা পাথর দেখতে পেল। ঝাঁকাতেই সেটা নড়ল, তারপর আবার গাছের ছোট ডালের মতো মট্ করে ভেঙে গেল। কাতিয়া পাথরটা তুলে নিল। তারপর কাঁদতে লাগল, শোক করতে লাগল, মানে, সোহাগের লোকটি মরা গেলে যা করে আর কি:

'ওগো আমার মনের মানুষ, কোথায় চলে গেলে, ছেড়ে গেলে কেন আমাকে?' এই সব...

খানিক কাঁদার পর একটু সুস্থ বোধ করল; খনির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে, জায়গাটা বনের মধ্যে একটা ফাঁকার মতো, চারিদিকে বিজিবিজি গাছ। কিন্তু খনির দিককার গাছ ছোট ছোট। তখন সূর্যাস্ত হবার সময়। ঢালু জায়গাটার নীচে ঘন বনের দরুন পথ অন্ধকার হয়ে গেছে। কিন্তু যেদিকে তাকিয়েছিল, তার উপর তখনো রোদ জ্বলজ্বল করছে। যেন আগুন লেগেছে সেটায় আর পাথর যেন জ্বলছে।

ব্যাপারটা তার অদ্ভুত মনে হল। ইচ্ছে হল আরো একটু কাছে যেতে। পা বাড়াতেই তলায় কী যেন ফেটে গেল। পা টেনে নিয়ে নীচের দিকে তাকাতেই দেখল, তার পায়ের তলায় মাটি নেই, সে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিরাট একটা গাছের একেবারে চূড়ায়। চারিদিকেই সেরকম আরো নানা গাছের চূড়া। সেগুলোর ভিতর দিয়ে নীচের ঘাস আর ফুল সে দেখতে পেল, কিন্তু সেগুলো একেবারেই এখানকার মতো নয়।

অন্য কেউ হলে ভয় পেয়ে যেত, শুরু করত উঁহ-আঁহ করতে, কিন্তু কাতিয়া ভাবছিল অন্য কথা:

'এই তো পাহাড়টা খুলে গেছে! যদি শুধু দানিলাকে একবার দেখতে পেতাম!'

কথাটা ভাবতে না ভাবতেই দেখল, নীচে কে যেন হাঁটছে; চেহারাটা তার দানিলার মতো। হাত তুলল সে, যেন কিছু বলতে চায়। কাতিয়ার চোখ ঝাপসা হয়ে গেল, নীচে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল — গাছের একেবারে চূড়া থেকে! নীচে পড়ল জমির ঠিক সেই জায়গাটায়, আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিল। সম্বিত ফিরলে ভাবল:

'নিশ্চয়ই ভূত দেখছি। বাড়ী ফেরাই ভালো।'

ফেরা তো উচিতই, অথচ বসেই রইল সে, হয়তো পাহাড়টা আবার খুলে যাবে, দানিলাকে আর একবার কি দেখা যাবে না। তাই অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত সেখানে বসে রইল। শেষে বাড়ী ফিরল, কিন্তু সমস্ত পথ কেবলই ভাবতে লাগল: 'দানিলাকে তো দেখেছি।'

যে-লোকটা কাতিয়ার পিছু নিয়েছিল, সে ফিরে এল। দেখে কাতিয়ার কুঁড়ে তখনো বন্ধ। তাই লুকিয়ে পড়ল, দেখবে কাতিয়া কী আনে। কাতিয়া আসতেই সে তার পথ আগলে দাঁড়াল:

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'সাপ-পাহাড়ে।'

'রাত্রিবেলায়? কিসের জন্যে?'

'দানিলাকে দেখার জন্যে।'

লোকটা আঁৎকে পিছিয়ে গেল। পরের দিন সারা খনিতে রটে গেল।

'মরালোকের কনেটার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। রাতে সে সাপ-পাহাড়ে এমন এক মানুষের খোঁজে যায়, যে কিনা মরা। পাগলামির ঝোঁকে আবার বসতিতে আগুন ধরিয়ে না দেয়!'

তার ভাই-বোনদের কানে গেল কথাগুলো, আবার দৌড়ে এল তারা কাতিয়ার কাছে, বকা-ঝকা শুরু করল। কাতিয়া কিন্তু কান দিল না। তাদের শুধু টাকা দেখিয়ে বলে:

'এ টাকা কোথা থেকে পেলাম জানো? ভালো কারিগরের মালও তারা নেয় না, কিন্তু আমার প্রথম কাজের জন্যেই কত দিয়েছে! কেন দিল?'

ভাইয়েরা তার ঘটনাটির কথা শুনেছিল। বলল:

'তোমার শুধু কপাল ভালো। তাতে অবাক হবার কী আছে।'

কাতিয়া বলে, 'কপাল ভালোর ব্যাপার নয়। দানিলাই আমার জন্যে পাথরটায় নক্সা তুলে ওখানে রেখেছিল।'

ভাইরা হাসে, বোনরা হাত ওলটায়:

'একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গেছে! গোমস্তাকে কথাটা বলা দরকার, কে জানে, এলাকায় আবার আগুন লাগিয়ে না দেয়।'

গোমস্তাকে অবশ্য বলল না। বোনের নিন্দে করতে লজ্জা হল। কিন্তু বেরিয়ে এসে তারা ঠিক করল:

'ওর ওপর আমাদের নজর রাখতে হবে। যেখানেই যাক আমাদের কেউ না কেউ তার পিছু নেবে।'

কাতিয়া ওদের এগিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করল, তারপর নতুন পাথরের টুকরোটায় উকো ঘষতে লাগল। উকো ঘষে আর ভাগ্য গণনা করে:

'এটা যদি ঐরকম উৎরায়, তাহলে ভূত দেখি নি, দানিলাকেই দেখেছি।'

তাই তাড়াতাড়ি করে সে। দেখতে চাইল সেটায় সত্যিকারের নক্সা বেরয় কিনা। কাজ করেই চলল সে অনেক রাত পর্যন্ত। বোনেদের একজনের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে দেখল কুঁড়েতে একটা বাতি জ্বলছে। দৌড়ে সে এল জানালার কাছে, ফাটল দিয়ে উঁকি মেরে দেখে। অবাক হয়ে গেল সে:

'ঘুময়ও না! বাস্তবিক ওর অবস্থাটা সাংঘাতিক!'

পাথরের টুকরোটা কেটে ফেলল কাতিয়া — ফুটে উঠল নক্সা। প্রথমটার চেয়েও ভালো। গাছ থেকে পাখি উড়ে নামছে, তার ডানা মেলা, আর অন্য পাখিটি মাটি থেকে ওপরে উঠছে প্রথমটির দিকে। পাঁচবার এই একই নক্সা। আড়াআড়ি ঠিক কোন জায়গা কাটা দরকার, কেটাও দেখানো আছে। কাতিয়া আর ভেবেও দেখল না। লাফিয়ে উঠেই বাইরে দৌড়ল। বোনও তার পিছন পিছন, যাওয়ার পথেই ভাইদের দরজা ধাক্কা দিয়ে গেল — তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, দৌড়ও! ছুটে এল ভাইয়েরা, অন্য লোকরাও জুটল। তখন ফর্সা হতে শুরু করেছে। গুমেশ্কি পেরিয়ে ছুটে যাচ্ছে কাতিয়া। সবাই ছুটল তার পিছন পিছন, কাতিয়ার কিন্তু খেয়ালই নেই যে লোকে তার পিছু নিয়েছে। দৌড়ে সে খনি পার হয়ে গেল। তারপর সামান্য ধীরে ধীরে ঘুরে গেল সাপ-পাহাড়ে। অন্যেরাও ছোটা কমাল, বলে, দেখি-না কী করে।

যে-পথে যায় সেই পথ ধরেই কাতিয়া উঠল পাহাড়ে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে, বনটা কেমন অদ্ভুত। একটা গাছ ছুঁল সে। পালিশ-করা পাথরের কাজের মতো সেটা ঠাণ্ডা আর মসৃণ। পায়ের নীচেকার ঘাসও পাথরের, তখনো জায়গাটা অন্ধকার। সে ভাবল: 'নিশ্চয়ই পাহাড়ের গহ্বরে পড়েছি।'

ওদিকে আত্মীয়স্বজন আর লোকদের মধ্যে সোরগোল পড়ে গেছে:

'কোথায় গেল? এই তো একেবারে কাছেই ছিল; এখন কিনা মিলিয়ে গেল!'

ছোটাছুটি করে: কেউ পাহাড়ে ওঠে, কেউ চক্কর দেয়, হাঁকাহাঁকি করে: 'ওখানে রয়েছে নাকি?'

কাতিয়া কিন্তু তখন হাঁটছে পাথরের বনের ভিতর দিয়ে আর ভাবছে দানিলাকে কী করে খুঁজে বার করা যায়। হেঁটে হেঁটে শেষ পর্যন্ত সে ডাকতে লাগল:

'সাড়া দাও, দানিলা!'

গমগম করে উঠল বন। ডালপালা খটখটে বলতে লাগল: 'নেই সে! নেই! নেই!' কাতিয়া কিন্তু হাল ছাড়ল না:

'সাড়া দাও, দানিলা!'

বন হতে আবার সেই: 'নেই সে! নেই! নেই!'

'সাড়া দাও, দানিলা!'

তখন পাহাড়ের ঠাকরুন হঠাৎ হাজির হল তার সামনে। জিজ্ঞেস করল:

'কেন তুমি এসেছ আমার বনে? কী চাও? ভালো পাথর? তোমার যেটা খুসি পছন্দ করে নিয়ে শীগ্‌গীর চলে যাও!'

কাতিয়া কিন্তু উত্তর দিল:

'তোমার মরা পাথর চাই না! আমার জীবন্ত দানিলাকে দাও। কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছ? অন্যের বরকে ভুলিয়ে আনার কী অধিকার আছে তোমার?'

মানে, সাহস ছিল মেয়েটির। তার উপর সে নাছোড়বান্দার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঐ ঠাকরুনের ওপর! তার কিন্তু বিকার নেই। দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চিন্তে।

'আর কী বলবে শুনি?'

'বলব — দানিলাকে দাও! তোমার কাছেই সে আছে...'

হাসিতে ফেটে পড়ল ঠাকরুন। বলে:

'বোকা মেয়ে, কার সঙ্গে কথা বলছ জানো?'

কাতিয়া গলা চড়ায়, 'কানা তো নই। তুমি কে তা দেখতেই পাচ্ছি। তোমাকে ভয় করি না, মায়াবিনী! এক ফোঁটাও নয়! যতই তোমার চাতুরী থাক, দানিলার টান আমার দিকেই। নিজেই তা দেখেছি। কী, ঠিক নয়?'

ঠাকরুন তখন বলল:

'বেশ, শোনা যাক নিজেই সে কী বলে।'

এতক্ষণ বন অন্ধকার ছিল, হঠাৎ যেন তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আলো ফুটে উঠল, নানা ছটায় ঝলমল করে উঠল ঘাস; গাছগুলোর এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। তাদের মধ্যে একটা ফাঁকায় পাথরের ফুল, আর আগুনের ফুলকির মতো সোনালী মৌমাছি তাদের উপর উড়ছে চোখ ধাঁধিয়ে। মানে, জানো তো, এমন সুন্দর যে, যুগ যুগ ধরে দেখেও সাধ মিটবে না। হঠাৎ কাতিয়া দেখল বনের ভিতর দিয়ে ছুটে আসছে দানিলা। সোজা তার দিকেই। কাতিয়াও ঝাঁপিয়ে গেল তার দিকে:

'দানিলা!'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' বলে ঠাকরুন, দানিলাকে জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে দানিলা-কারিগর, বেছে নাও কী চাও। তুমি যদি ওর সঙ্গে চলে যাও, আমার এখানে যাকিছু দেখেছ সব ভুলে যাবে। আর এখানে যদি থাকো, তাহলে একে আর বাইরের লোকজনকে তোমায় ভুলে যেতে হবে।'

দানিলা বলে, 'বাইরের লোকদের ভুলতে পারব না। আর একে আমার মনে পড়ে প্রতি দণ্ডে।'

তখন ঠাকরুন ভারি মিষ্টি হাসল:

'তুমিই জিতেছ, কাতিয়া! নিয়ে যাও তোমার কারিগরকে। আর তোমার সাহস আর বিশ্বাসের জন্যে একটা বর দিচ্ছি: এখানে যাকিছু দানিলা শিখেছে, সবকিছুই তার মনে থাকবে, শুধু চিরকালের জন্যে ভুলে যাক এইটে।' সঙ্গে সঙ্গেই সেই আশ্চর্য ফুলের মাঠটা মিলিয়ে গেল। 'এবার বাইরের পৃথিবীতে চলে যাও,' বলল ঠাকরুন, দানিলাকে সাবধান করে দিল, 'দানিলা, লোককে কিন্তু এই পাহাড়ের কথা কিছু বলবে না। লোকদের বলবে, অনেক দূরের এক ওস্তাদ কারিগরের কাছে গিয়েছিলে তার বিদ্যে শেখবার জন্যে। আর শোনো, কাতিয়া, কখনো ভেবো না, তোমার বরকে আমি ভুলিয়ে এনেছিলাম। নিজই সে এসেছিল যার জন্যে এখন থেকে সেটা আর তার মনে থাকবে না।'

কাতিয়া তখন নীচু হয়ে অভিবাদন জানাল:

'আমার কড়া কথার জন্যে ক্ষমা করো।'

ঠাকরুন বলল, 'যাক গে, ওতে পাথরের আর কী হয়? আর তোমায় বলছি, কখনো তোমাদের ভালোবাসা যেন না কমে।'

বনের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলল কাতিয়া আর দানিলা; আর বন কেবলি অন্ধকার আর অন্ধকার, এবড়োখেবড়ো জমি, কেবল ঢিবি আর গর্ত। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে, তারা রয়েছে খনিতে, গুমেশ্‌কিতে। তখনো সময় হয় নি, কেউই সেখানে নেই। চুপচাপ বাড়ী ফিরে গেল তারা। কাতিয়ার পিছন পিছন যারা ছুটেছিল, তারা তখনো বনের মধ্যে ঘুরছে আর ডাকাডাকি করছে: 'দেখতে পেলে?'

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পেল না। ফিরে এল বাড়ী। এসে দেখে দানিলা জানালার পাশে বসে আছে।

ভয় পেয়ে গেল বৈকি। দূরে সরে নানা রকম মন্ত্র-তন্ত্র আওড়াতে লাগল। কিন্তু তারপর দেখল দানিলা তার পাইপে তামাক ভরছে। তখন সম্বিত ফিরল আর কি।

ভাবল: 'মরালোক তো আর পাইপ টানে না।'

গুটি গুটি তারা একে একে এগিয়ে আসতে লাগল। দেখে কাতিয়াও আছে কুটীরে, ভারি ফুর্তিতে উনুন ধরাচ্ছে। বহুকাল তাকে তারা অমন দেখে নি। তখন একেবারেই ভয় কেটে গেল তাদের। এল ভিতরে। শুরু করল জিজ্ঞাসাবাদ:

'এতদিন তোমার দেখা নেই যে, দানিলা?'

সে বলল, 'গিয়েছিলাম কোলিভানে। শুনেছিলাম এক ওস্তাদ কারিগরের কথা, লোকে বলে তার জুড়ি কেউ নেই। ভাবলাম গিয়ে কিছু শিখি। বাবা আমায় যেতে দিতে চায় নি। তাই কাউকে কোনো কথা না বলে চলে যাই। শুধু কাতিয়াকে কথাটা বলেছিলাম।'

ওরা জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু তোমার সেই পেয়ালাটা কেন ভেঙেছিলে?'

'মানে, কতই তো ঘটে... ফুর্তি করে সবে বাড়ী ফিরেছিলাম... হয়তো কিছুটা বেশীই টেনে ফেলেছিলাম... যেরকম চেয়েছিলাম, সেরকমটা ঠিক উৎরায় নি, তাই ভেঙে ফেললাম। কী জানো, কারিগরদের বেলায় এরকম কত হয়। এটা এমন কিছু বলার কথা নয়।'

তখন কাতিয়ার ভাই-বোনেরা তাকে নিয়ে পড়ল। কেন সে তাদের কোলিভানের কথা বলে নি? কিন্তু তারা তার কাছ থেকে বিশেষ কোনো কথা বার করতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে কড়া করে সে শুনিয়ে দিল:

'কারো গরু হাম্বা করে, আমারটা থাকে চুপ করে। তোমাদের কি বারবার বলি নি দানিলা বেঁচে আছে। আর তোমরা? আমার ঘাড়ে একের পর এক পাত্র গছাতে চেয়েছিলে, চেষ্টা করেছিলে আমাকে ভুল পথে চালাতে। তার চেয়ে বরং টেবিলে এসে বসো, ডিম সবে ভাজা হয়েছে।'

এইভাবে ব্যাপারটা চুকে গেল। আত্মীয়স্বজনেরা সব বসল, গল্প-গুজব হল। তারপর যে যার পথে চলে গেল। সন্ধেয় দানিলা গিয়ে গোমস্তাকে জানাল, সে ফিরে এসেছে। লোকটা অবশ্য খানিক হম্বিতম্বি করল, তবে সবকিছুই ঠিকঠাক হয়ে গেল।

এইভাবে দানিলা আর কাতিয়া দিন কাটাতে লাগল তাদের কুঁড়েটায়। লোকে বলে তারা ভালোই ছিল, মিলেমিশে। তার কাজের জন্যে দানিলাকে লোকে বলত 'পাহাড়ের কারিগর', কেউ তার কাছেও ঘেঁষতে পারত না। কিছু টাকা-কড়িও তাদের হল। শুধু মাঝে মাঝে দানিলা কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ত। কাতিয়া অবশ্য টের পেত, সে কী ভাবছে, কিন্তু কোনো কথা বলত না।

ঠুনকো ডাল

দানিলা আর কাতিয়ার — সেই কাতিয়া যে স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিল পাহাড়ের ঠাকরুনের কাছ থেকে — হয়েছিল অনেকগুলি সন্তান। আট-আটটি, আর জানো, সবকটিই ছেলে। তাদের মা মাঝে মাঝে দুঃখু করত, অন্তত চোখ জুড়াবার মতো একটি মেয়ে হলেও হত? বাবা কিন্তু শুধু হাসত:

'মনে হচ্ছে ওই আমাদের ভাগ্য।'

ছেলেগুলি সুস্থ সবল হয়ে বড় হল। তাদের মধ্যে মাত্র একজনের একটা দুর্ঘটনা ঘটে। যখন সে ছোট ছিল, তখন দাওয়া না কোনখান থেকে পড়ে চোট খায়। একটা কুঁজ গজাতে লাগল তার পিঠে। নানা ঝাড়ফুঁক জানা বুড়িদের কাছে নিয়ে যাওয়া হল বটে, কিন্তু কোনো উপকারই হল না। তাকে কুঁজো হয়েই থাকতে হল।

আমি দেখেছি, এধরনের ছেলেরা খিটখিটে আর হিংসুটে হয়ে থাকে। এ ছেলেটি কিন্তু ছিল হাসিখুসি, ভারি তার বুদ্ধি আর মাথা খেলে ভালো। ভাইদের মধ্যে সে সেজ, কিন্তু অন্য সবাই তার পরামর্শ নিত, তাকে জিজ্ঞেস করত:

'তোর কী মনে হয়, মিতিয়া? আচ্ছা মিতিয়া, ওটা কী জন্যে বল তো?'

তার বাবা-মাও প্রায়ই তাকে ডাকত:

'এটা একবার দেখ তো, মিতিয়া! ঠিক হচ্ছে কিনা?'

'মিতিয়া, তুই দেখেছিস, উকোটা কোথায় রেখেছি?'

যখন ছোট ছিল তখন সুন্দর বাঁশী বাজাত দানিলা। মিতিয়াও হয়েছিল তার মতো। নিজের জন্যে সে একটা বাঁশী বানায়। আপনা হতেই তা থেকে যেন গান বেরুত।

হাতের কাজে দানিলা রোজগার করত ভালোই। কাতিয়াও হাত গ্‌টিয়ে বসে থাকত না। তাই সংসার ভালোই চলত, কার্‌র কাছেই কখনো হাত পাততে হয় নি। কাতিয়া লক্ষ্য রাখত যাতে ছেলেদের জামাকাপড় ভালো হয়, গরম কোট, ফেল্টের ব্‌ট-টুট তাদের যেন থাকে। গ্রীষ্মকালে অবশ্য দৌড়াদৌড়ি করত, খালি পায়েই ঘ্‌রত, নিজেদের চামড়া, কেনা তো নয়। কিন্তু মিতিয়ার উঁচু ব্‌ট ছিল, কারণ সে র্‌গ্‌ণ, সবারই তার জন্যে মায়া। বড় ছেলেরা তাতে হিংসে করে নি। আর ছোটরা মার কাছে এসে বলত:

'মা, মিতিয়াকে নতুন ব্‌ট দেবার সময় হয়েছে। দ্যাখো-না, ও জোড়াটা তার পায়ে হয় না, কিন্তু আমার পায়ে ঠিক হয়।'

মানে, ছোটদের চালাকি আর কি। মিতিয়ার ব্‌টজোড়াটি পেতে চায়। এইভাবে তো তারা বেশ মিলেমিশে ছিল। পড়শীরা অবাক হয়ে বলাবলি করত:

'কাতিয়ার ছেলেদের একবার দেখ! কখনোই মারামারি ঝগড়া করে না!'

কিন্তু মিতিয়াই তার প্রধান কারণ। সে যেন বনের মধ্যে এক আলো, কাউকে তা আনন্দ দেয়, কাউকে গরম করে তোলে, কাউকে ভাবতে বসায়।

অল্প বয়েসেই তার ছেলেদের কারিগরি বিদ্যা শিখতে দানিলা দিল না। বলল, 'ওরা আগে বড় হয়ে উঠুক, মালাকাইটের গ্‌ঁড়ো গেলবার সময় ওরা অনেক পাবে।'

কাতিয়ারও এক মত — তাদের কাজে লাগাবার বয়েস এখনো হয় নি। কাতিয়া এমন কি ভেবেছিল, তাদের বিদ্বান্‌ও করবে, মানে এই খানিক লিখতে পারা, খানিক পড়া, খানিক অংক বোঝা। তখন অবশ্য কোনো ইস্কুল ছিল না। তাই বড় ভাইরা কোন একজন দিদিমণির কাছে যেতে শ্‌র্‌ করল। মিতিয়াও তাদের সঙ্গে। বড় ছেলেদের যথেষ্টই ব্‌দ্ধি, মেয়েটি তাদের প্রশংসা করত, কিন্তু মিতিয়া — সে ছিল সবাইকার চেয়ে এগিয়ে। তখনকার দিনে লেখাপড়া শেখাবার পদ্ধতি কঠিন ছিল। সে কিন্তু চট করেই ব্‌ঝে নিত। শিক্ষয়িত্রী তাকে দেখাতে না দেখাতেই শিখে ফেলত। তার ভাইরা তখনো অক্ষর শিখছে, সে তখন চলেছে গড়গড় করে পড়ে — তার সঙ্গে তাল বজায় রাখা যায় না। শিক্ষয়িত্রী প্রায়ই বলতেন:

'এরকম ছেলে কখনো দেখি নি!'

কথাটা শুনে তার বাবা-মার খানিক গর্ব হল। মিতিয়ার জন্যে বানান হল সুন্দর দেখে বুট। সেই বুট জোড়া থেকেই তার জীবন গেল একেবারে বদলে।

মানে, ব্যাপার কী জানো, সে বছর কর্তা ছিলেন এখানে। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে বোধ হয় তাঁর সব টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিলেন। খনিতে এলেন আরো কিছু আদায় করতে।

এসব ব্যাপারে অবিশ্যি একটু মাথা খাটালে টাকা তোলা কঠিন নয়। শুধু ঐ গোমস্তা আর কেরানীরাই লুটছে কত। কিন্তু সেদিকটা কর্তা চেয়েও দেখলেন না।

একদিন তিনি যখন পথ দিয়ে গাড়ী চেপে আসছেন, কুঁড়ের সামনে তিনটি ছেলে খেলা করছে। তাদের প্রত্যেকের পায়েই বুট। কর্তা তাদের ইশারায় ডাকলেন — আয় তো এখানে।

মিতিয়া আগে কখনো কর্তাকে দেখে নি। সে কিন্তু চিনতে পারল ইনি কে। মানে, বোঝোই তো, ঘোড়াগুলো চিকন, গাড়োয়ানের গায়ে চাপরাশ, গাড়ী ঝকঝক করছে আর তার ভিতরে যিনি বসে তিনিও বেশ হোমরাচোমরা, চর্বি ফেটে পড়ছে যে প্রায় নড়তেই পারেন না। পেটের সামনে একটা ছড়ি ধরে, ওপরটা সোনা দিয়ে বাঁধান।

মিতিয়ার একটু ভয় করল, তাহলেও সে ছোটদের হাত ধরে গেল গাড়ীর কাছে। হাঁসফাঁস করে কর্তা প্রশ্ন করলেন:

'কাদের ছেলে তোরা?'

তাদের মধ্যে মিতিয়াই ছিল বয়েসে বড়, তাই সে খুব শান্তভাবে বলল:

'পাথর খোদাইকর দানিলার ছেলে। আমার নাম মিতিয়া আর এরা আমার ভাই।'

কথাটা শুনে নীল হয়ে উঠে কর্তার প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়, শুধু বলেন:

'উঃ! উঃ! কী কাণ্ড হচ্ছে! কী কাণ্ড! উঃ! উঃ!'

তারপর খানিকটা দম ফিরে পেয়ে ভালুকের মতো গাঁকগাঁক করে উঠলেন:

'ওগুলো কী? এ্যাঁ?' লাঠি দিয়ে তিনি ছেলেদের পায়ের দিকে দেখালেন। বুঝতেই পারছ, ছোটরা দারুণ ভয় পেয়ে দৌড়ে ঢুকে পড়ল ফটকে। মিতিয়া কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়েই রইল, ভেবেই পেল না — কী জানতে চাইছেন কর্তা?

কর্তা ওদিকে রেগে গলা ভেঙে চেঁচিয়ে চললেন:

'ওটা কী?'

মিতিয়া এবার একেবারেই ঘাবড়ে গেল, বলল:

'মাটি।'

দেখে মনে হল কর্তার বুঝি পক্ষাঘাত হয়েছে। একেবারেই গলা ভেঙে:

'হর্-র-র্! হর্-র-র! কী আস্পর্ধা! কী সব কাণ্ড! হর্-র্-র্! হর্-র্-র্!'

এই সময় দানিলা নিজেই বাড়ী থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল, কিন্তু তার সঙ্গে কথা কইবার জন্যে কর্তা অপেক্ষা করলেন না, ছড়ির বাঁট দিয়ে গাড়োয়ানের গলায় দিলেন খোঁচা — হাঁকাও!

এই কর্তার মাথাটা খানিক খারাপ ছিল। ছেলেবেলা থেকেই তেমন লক্ষণ দেখা দেয়, বুড়ো বয়েসে তো একেবারেই পাগলামীটা বেড়ে উঠল। কারুর ওপর হয়তো দারুণ হম্বিতম্বি করেন, আর তারপর নিজেই ভুলে যান কী চাইছিলেন। দানিলা আর কাতিয়া তাই ভাবল, ব্যাপারটা হয়তো তেমন গড়াবে না, বাড়ী ফিরতে ফিরতেই ছেলেদের কথা তিনি ভুলে যাবেন। এবার কিন্তু তা ঘটল না — ছেলেদের পায়ের বুট-জুতোর কথা তিনি ভুললেন না। পেঁছেই গোমস্তার উপর হম্বিতম্বি শুরু করলেন:

'তোমার চোখদুটো কোথায়? এখানে রয়েছ কী জন্যে? কর্তার জুতো কেনার টাকা জোটে না, আর ভূমিদাসের ছেলেরা কিনা উঁচু বুট পরে বেড়ায়! নিজেকে তুমি গোমস্তা বল?'

লোকটা সাফাই গাইতে চেষ্টা করল:

'আপনার দয়াতেই, কর্তা বাবু, দানিলাকে খালাসি-খাজনায় দেওয়া হয়েছে, কত দেবে তাও ধার্য করা আছে। সর্বদাই সে খাজনা দিয়ে যায়, তাই ভাবলাম...'

'ভাবাটা তোমার কাজ নয়! তোমার কাজ নজর রাখা!' হুঙ্কার ছাড়লেন কর্তা। 'চেয়ে দেখো এখানে কী সব ঘটছে! একেবারে সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার! ওর ঘাড়ে চারগুণো খালাসি-খাজনা চাপাও!'

তারপর দানিলাকে ডেকে পাঠিয়ে নিজেই নতুন খাজনাটার কথা বললেন। দানিলা দেখে, একেবারেই বিদঘুটে ব্যাপার।

সে বলল, ‘কর্তার হুকুম না মেনেও পারি না, আবার অত খাজনা দেবারও সাধ্যি নেই। অন্যদের মতো আপনার ফরমাশ খেটে কাজ করব।’

এটা কর্তার একেবারে মনে ধরল না। এমনিতেই টাকার টানাটানি, খোদাই পাথর নিয়ে কী হবে। আগের কালের যেগুলো রয়েছে, সেগুলোই বরং বিক্রি করা তাঁর ইচ্ছে। আবার পাথর খোদাইকরকে অন্য কাজে লাগানো — সেটারও কোনো মানে হয় না। তাই দরাদরি করতে শুরু করলেন। দানিলা কত আপত্তি করতে চেষ্টা করল, কিন্তু কর্তা তার খাজনা দ্বিগুণ করে দিলেন। না চাও তাহলে খনিতে গিয়ে কাজ করো গে। দ্যাখো, কেমন কাণ্ড!

বোঝাই যায়, দানিলা আর কাতিয়ার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তাদের সবারই কষ্ট, ছেলেদেরই বেশী: বড় হয়ে ওঠার আগেই তাদের কাজ শুরু করতে হল। তাই শিক্ষা তাদের আর শেষ হল না। মিতিয়ার মনে হল অন্য সবাইকার চেয়ে তার দোষটাই বেশী — নিজেই গিয়ে কাজ নিতে চায়, বলে বাবা-মাকে সাহায্য করবে। ওরা কিন্তু আগেকার মতোই ভাবে:

‘এমনিতেই ও রুগ্ণ, মালাকাইট নিয়ে তাকে কাজ করতে দিলে একেবারে টেঁসে যাবে। কাজটার সবকিছুই খারাপ। সিমেণ্ট তৈরি করতে হলে ধুলোয় পটল তুলতে হবে, পাথর ভাঙতে হলে সামলাও চোখ, আর পালিশ তৈরির জন্যে কড়া ভোদকায় সিসে গলাতে গেলে ভাপে দম বন্ধ হয়ে আসে।’ অনেক মাথা ঘামাল তারা, শেষ পর্যন্ত ঠিক করল মিতিয়াকে মণিকারের কাজে শিক্ষানবীশিতে দেবে।

তার চোখ নির্ভুল, আঙুলও চটপটে, বেশী শক্তির প্রয়োজন নেই — কাজটা ঠিক ওরই উপযুক্ত।

আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এক মণিকারও ছিল বৈকি। তাই তারা ছেলেকে তার কাছে পাঠাল। সেও খুব খুসি হল, কারণ জানত মিতিয়ার বুদ্ধি আছে, কাজেও ফাঁকি দেয় না।

মণিকারটি ছিল এই চলনসই গোছের, মাঝারি। দ্বিতীয় অথবা মাঝে মাঝে তৃতীয় শ্রেণীর পাথর নিয়ে কাজ করত। তা সত্ত্বেও সে যা শেখাতে পারল মিতিয়া সবকিছুই শিখে নিল। তারপর সে লোকটি দানিলাকে বলল:

‘ছেলেটাকে তোমার শহরে পাঠান উচিত। সে কাজ শিখুক। হাত ওর খুবই ভালো।’

তাই করা হল। শহরে ওধরনের কাজ যারা করে, সেরকম লোকের সঙ্গে আলাপ দানিলার তো কম ছিল না। পছন্দসই লোক বেছে সে মিতিয়াকে দিল তার কাছে। এ এক ওস্তাদ বুড়ো কারিগর। তৈরি করত সে বেরি। জানো তো, যতরকম পাথর দিয়ে বেরি বানানো তখনকার ফ্যাশন। আঙুর, ব্ল্যাক-কারাণ্ট, রাস্‌প-বেরি, কত কী। প্রত্যেক ধরনের জন্যেই কী পাথর ব্যবহার করতে হবে তা ঠিক ছিল। ব্ল্যাক-কারাণ্ট’এর জন্যে লাগত হ্যাগেট, শাদার জন্যে স্ফটিক, লাল জাস্‌পার দিয়ে বানাত স্ট্র-বেরি। মানে, প্রত্যেক বেরিরই ছিল নিজস্ব পাথর। আর ডাল এবং পাতার বেলাতেও তাই — কতক হত মালাকাইটের, কতক রঙীন কোয়ার্ট্‌জ এবং আরো কত কী পাথরের।

বাঁধা নিয়মগুলো মিতিয়া সবই শিখল, কিন্তু থেকে থেকেই নিজেই নিজের মতো করে তা ভাবতে বসে। ওস্তাদ প্রথমে গজগজ করত, পরে কিন্তু ছেলেটার প্রশংসাই করল।

‘তা বটে, ওভাবে এটা আরো বেশী জীবন্ত দেখাচ্ছে।’

পরে সে সোজাসুজিই বলল:

‘দেখতে পাচ্ছি, বাছা, কাজের তোর খুবই গুণ। এমন কি আমার মতো বুড়োও তোর কাছে শিখতে পারে। মোটের ওপর তুই ওস্তাদ হয়ে উঠেছিস। মাথায় তোর অনেক কল্পনা খেলে।’

খানিক ভেবে সে আবার বলল:

‘শুধু খেয়াল রাখিস, ওগুলোকে যেন বেরতে দিস নে! তোর ঐ কল্পনাগুলোকে! নইলে হয়তো বিপদে ফেলবে। এধরনের ব্যাপার ঘটেছে।’

মিতিয়া ছিল ছেলেমানুষ, সে ওতে কানই দিল না, শুধু হাসতে লাগল:

‘কল্পনাটা ভালো হলেই বাঁচি। তার জন্যে কে আমাকে বিপদে ফেলবে?’

এইভাবে মিতিয়া হয়ে উঠল এক ওস্তাদ কারিগর। তখনো সে বেশ ছেলেমানুষ, সবে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। প্রচুর ফরমাশ পেত সে, কাজ ওর সব সময়েই অঢেল। যেসব দোকানী ঐধরনের জিনিস বিক্রি করত, শীগ্‌গীরই গন্ধ পেল যে,

ছেলেটার হাতের কাজ থেকে তারা প্রচুর টাকা করতে পারবে। কাড়াকাড়ি করে তাকে ফরমাশ দিয়ে যায় তারা। করো-না কত করবে। এই সময় মিতিয়া মনে মনে ভাবল:

'বাড়ী ফিরব। আমার কাজের যখন চাহিদা আছে, তখন লোকে আমার বাড়ীতেই আসবে। পথটাও সামান্য, মালও ভারি নয়, মালমসলা এনে দিক, তৈরি জিনিস নিয়ে যাক।'

তাই সে করল। বাবা-মা যে খুসি হল তা আর বলতে! — মিতিয়া ফিরে এসেছে। সেও সবাইকে খুসি করতে চায়, কিন্তু নিজের কেমন কষ্ট হল। সমস্ত বাড়ীটাই যেন মালাকাইটের একটা কারখানা হয়ে গেছে। তার বাবা আর দুই বড় ভাই বসে চৌকির কাছে। ছোটরাও চারিপাশেই: কেউ চালাচ্ছে উকো, কেউ পালিশ করছে। মার কোলে বহু দিনের পথ চাওয়া একবছরের একটি মেয়ে। কিন্তু সংসারে আনন্দ নেই। দানিলাকে দেখাচ্ছে বুড়ো, বড় ছেলেরা কাশছে, ছোটদেরও কষ্ট হয়। সমস্ত দিন তারা পরিশ্রম করে চলেছে, আর সব যাচ্ছে জমিদারের খালাসি-খাজনায়।

মিতিয়া মনে মনে ভাবল: এ সবেরই কারণ ঐ উঁচু বুট।

তাড়াতাড়ি নিজের কাজে লাগল সে। কাজ তার ছোট হলেও যন্ত্রপাতি তো আর একটা নয়। সবই টুকিটাকি অবিশ্যি, কিন্তু কাজের জায়গা তো দরকার।

জানালার পাশে সে একটা জায়গা বেছে নিয়ে কাজ শুরু করে দিল। মনে মনে ভাবতে লাগল:

'এখানকার পাথর দিয়ে বেরি তৈরি করা যায় কী করে? তাহলে ছোট ভাইদেরও এ কাজে লাগানো যায়।' ভাবে আর ভাবে, কিন্তু কোনো পথ আর পায় না। আমাদের জায়গাটায় বেশীর ভাগই তো কেবল ক্রিসোলাইট আর মালাকাইট। ক্রিসোলাইটও অত সস্তা নয়। সেটা দিয়ে কাজও হবে না। এদিকে মালাকাইট দিয়ে শুধু তৈরি করা যাবে পাতা, তাও মোটেই জুত হয় না, নানাভাবে সিমেণ্ট দিয়ে তা জুড়তে হয়।

একদিন সে কাজে বসেছে। তখন গ্রীষ্মকাল। জানালা খোলা। বাড়ীতে আর কেউ নেই। মা বাইরে কোথায় গেছে, ছোটরাও, তার বাবা আর বড় ছেলেরা রয়েছে চৌকির কাছে। কোনো কথাবার্তাই শোনা যাচ্ছে না। জানোই তো, মালাকাইট ঘষবার সময় গান গাইতে বা গল্প করতে কারুরই বিশেষ ইচ্ছে করে না।

দোকানীদের দেওয়া পাথরগুলো কুঁদে বেরি বানাচ্ছে মিতিয়া, আর মনে মনে কেবল একই কথা:

'এধরনের জিনিস বানানোর জন্যে কোথায় সে পেতে পারে সস্তা পাথর?'

হঠাৎ জানালার ভিতর দিয়ে এগিয়ে এল একটি মেয়েলী হাত, কে জানে বয়েস কতো, হাতে চুড়ি আর আঙুলে আঙটি। চৌকির উপর থালার মতো বড় সার্পেণ্টাইন পাথরের এক চাঙ্গড় রাখল সে। তার উপর খানিকটা ধাতুমল, রাস্তা তৈরি করার জন্যে যা লাগে।

মিতিয়া লাফিয়ে জানালার কাছে গেল — কেউ সেখানে নেই, রাস্তাও ফাঁকা, জনপ্রাণী নেই।

এটা কী? কেউ কি ঠাট্টা করছে, নাকি এটা স্বপ্ন? আর একবার সে সার্পেণ্টাইন আর তার উপরকার ধাতুমলের দিকে তাকাল। তারপর আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল। ওধরনের জিনিস গাড়ী গাড়ী পাওয়া যায়। যত্ন করে খুঁজে চেষ্টা করলে ওগুলো দিয়ে বানানো যায় নানা জিনিস। কিন্তু কী?

ভাবতে শুরু করল কোন ধরনের বেরি এতে ভালো উৎরাবে। যেখানে হাত দেখা গিয়েছিল, সেই দিকেই রইল তাকিয়ে। হঠাৎ আবার সেই হাত এল ভিতরে আর চৌকির উপর রাখল একটি বার্দোক পাতা। তাতে তিনটি ডাল আর সেই ডালে বেরি: একটা বার্ড-চেরি, দ্বিতীয়টা চেরি আর শেষেরটা পাকা গুসবেরি, এতো পাকা যে মনে হল বুঝি ফেটে পড়বে।

মিতিয়া আর পারল না, দৌড়ে বাইরে দেখতে গেল কে তার সঙ্গে তামাসা করছে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, জনপ্রাণী নেই, একেবারে নিথর। ঝাঁ ঝাঁ গরম, কে সে সময় বাইরে আসবে?

সেখানে খানিক দাঁড়িয়ে সে গেল জানালার কাছে, চৌকি থেকে কুড়িয়ে নিল পাতা আর ডাল। নানাভাবে দেখতে লাগল সেগুলো, আসল বেরি, একেবারে টাটকা, কিন্তু আশ্চর্যের কথা চেরি এল কোথা থেকে। বার্ড-চেরি পাওয়া অবশ্য বেশ সহজ, জমিদার বাড়ীতে কর্তার বাগানে গুসবেরিও প্রচুর। কিন্তু কোথা থেকে চেরি এল, এগুলো তো আমাদের অঞ্চলে জন্মায় না? অথচ মনে হয় যেন সবে গাছ থেকে পাড়া।

চৌরিগুলোর দিকে সে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল, কিন্তু তাহলেও গুসবেরিকেই তার সবচেয়ে বেশী পছন্দ হল, এ পাথরের পক্ষে সবচেয়ে যুতসই। কথাটা ভাবতেই হাতটা তার কাঁধ চাপড়ে, যেন বলল:

'সাবাস ছেলে! কাজ বোঝো তুমি!'

আর অন্ধ লোকও তো বুঝতে পারে হাতটা কার। মিতিয়া মানুষ হয়েছে পোলে-ভায়ায়, পাহাড়ের ঠাকরুনের কথা বহু সে শুনেছে। ভাবল: শুধু যদি আমাকে একবার দেখা দেয়। কিন্তু দিল না। হয়তো এই কুঁজো ছেলেটার উপর তার করুণা হয়েছিল, নিজের রূপ দেখিয়ে তাকে পাগল করতে চায় নি — দেখা দিল না।

সঙ্গে সঙ্গে সেই ধাতুমল আর সার্পেণ্টাইন নিয়ে মিতিয়া কাজে বসে গেল। যুতসই টুকরো খোঁজাখুঁজি করলে কম নয়। তবে পেলে সেটা, কাজ শুরু করে দিল মাথা আর হাত খাটিয়ে। ঘেমে উঠল সে। প্রথমে সে গুসবেরি আধখানা করে কাটল, তারপর একটা ফুটো করল মাঝখানে আর এখানে কাটল একটা খাত আর ওখানে একটা গিণ্ট। তারপর এই আধাআধি অংশগুলো সিমেণ্ট দিয়ে জুড়ে সেটা ঘষে পালিশ করে নিখুঁত করল। দাঁড়াল একেবারে যেন জীবন্ত। সার্পেণ্টাইন কেটে সে বানাল মিহি পাতা, এমন কি তার বোঁটায় দিল ছোট ছোট কাঁটা। কাজটা হল একেবারে খাসা। প্রত্যেকটা বেরির ভিতরের বীচি পর্যন্ত দেখা যায়, পাতাগুলোও মনে হয় জীবন্ত, সেখানে এমন কি ছোট-খাটো খুঁতও রেখেছিল, কোনোটা যেন পোকায় কাটা, কোনোটায় মরচের দাগ, মানে ঠিক আসল পাতার মতো।

দানিলা আর তার ছেলেরা অন্য ধরনের পাথর নিয়ে কাজ করে, তাহলেও এ কাজটা তারা বোঝে। মাও একসময় পাথর নিয়ে কাজ করেছিল। সবাই তারা মিতিয়ার কাজ দেখে চোখ আর ফেরাতে পারে না। সবচেয়ে আশ্চর্য, এটা সে করেছ সাধারণ সার্পেণ্টাইন আর পথ-বাঁধানোর ধাতুমল থেকে। মিতিয়া নিজেও খুসি। মানে, একেই বলে কাজ! কী মিহি। অবশ্য যারা সমঝদার তাদের কাছে।

তারপর মিতিয়া ধাতুমল আর সার্পেণ্টাইন থেকে আরো অনেক জিনিস বানাল। দারুণ সাহায্য হল সংসারের। দোকানীরা সেসব জিনিস লুফে নিতে লাগল। আসল পাথরের জিনিসের মতো দাম দিত সেগুলোর জন্যে, খদ্দেররা সর্বদাই প্রথমে নিত মিতিয়ার জিনিস — সেরা জিনিস তো। মিতিয়া তাই বেরি বানিয়ে চলল। বার্ড-

চোরিও বানাল, বাগানের চোরি, পাকা গুসবেরি। কিন্তু প্রথমটা সে কখনো বিক্রি করে নি। নিজের কাছে রেখে দিল। একটি মেয়ে ছিল, ভেবেছিল তাকে দেবে, কিন্তু সাহস হয় নি।

ব্যাপারটা কী জানো, মেয়েরাও মিতিয়ার জানালার দিকে পিছন ফিরে থাকে না। কুঁজো হলে হবে কি, কথা বলতে পারত চমৎকার, বুদ্ধিও ছিল ধারাল। কাজটাও চমৎকার। কৃপণও নয়। মালা গাঁথার জন্যে মুঠো মুঠো পুঁতি বানিয়ে দেয় তাদের। তাই থেকে থেকেই তারা আসে। তবে কাজের ছুতোয় তার জানালার পাশ দিয়ে বেশী যাবার তাড়া সেই মেয়েটির। যখনই যায়, একগাল হাসে, বিনুনি দোলায়। মিতিয়ার ইচ্ছে হল তাকে সেই ডালটা দেয়। কিন্তু তার কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকে।

'ওকে নিয়ে সবাই হয়তো হাসাহাসি করবে। নিজেও হয়তো অপমান বোধ করবে।'

এদিকে সেই কর্তা, দানিলার সংসারে যে ওলট-পালট ঘটিয়েছে, তখনো সে পৃথিবীতে হাঁসফাঁস করে বেঁচে আছে। সে বছর তার মেয়ের কোনো এক রাজা-বাহাদুর নাকি কারবারীর সঙ্গে বিয়ে দেবে। তার জন্যে যৌতুকের দরকার। পোলেভায়ার গোমস্তা ভাবল কর্তাকে একটু তোয়াজ করবে। মিতিয়ার ডালটা সে দেখেছিল। বোঝা যায় এধরনের জিনিসের কদর খানিকটা বুঝত। তাই সেটার জন্যে সে লোক পাঠাল:

'না দিলে জোর করে নিয়ে আসবে।'

তাদের আর কী? এমন তো কত করেছে? মিতিয়ার কাছ থেকে ডালটা তারা জোর করে কেড়ে নিয়ে এল গোমস্তার কাছে। গোমস্তাও সেটা ভরল একটা মখমলের বাক্সে। কর্তা পোলেভায়ায় আসতেই গোমস্তা অমনি:

'দয়া করে, এই নিন কনের জন্যে একটা উপহার। ভারি সুন্দর জিনিস!'

কর্তা সেটা দেখে প্রথমে প্রচুর প্রশংসা করল, তারপর জিজ্ঞেস করল:

'কী পাথরে তৈরি; দামই বা কত?'

গোমস্তা বলল, 'সেটাই আশ্চর্যের কথা, একেবারে সাধারণ জিনিস থেকে তৈরি, সার্পেণ্টাইন আর ধাতুমল।'

রেগে কর্তার দম বন্ধ হয় আর কি।

‘সে কী? এ্যাঁ? ধাতুমল? আমার মেয়ের জন্যে?’

গোমস্তা দেখল তার ব্যাপার সুবিধার নয়, তাই মিতিয়াকে দোষ দিল:

‘ওই বদমাসটা আমাকে এটা গছিয়েছে, যত আজেবাজে বকেছে; তা নইলে কখনোই সাহস করতাম না।’

কর্তা ঘোঁৎঘোঁৎ করতে লাগল:

‘নিয়ে এসো তাকে! নিয়ে এসো!’

বুঝতেই পারছ, টানতে টানতে নিয়ে আসল মিতিয়াকে, কর্তা সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পারল।

‘এটা সেই ছোঁড়া... সেই বুট পরা...’

ছড়ি নিয়ে মিতিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

‘তোর এতো সাহস?’

মিতিয়া প্রথমে বুঝতেই পারল না ব্যাপারটা কী; তারপর খানিকটা আন্দাজ করে সোজাসুজি বলল:

‘আপনার গোমস্তা এটা জোর করে কেড়ে নিয়ে গেছে, জবাবদিহি সেই করুক।’

তবে কর্তার সঙ্গে কথা বলে আর লাভ কী। কেবলি তিনি ঘোঁৎঘোঁৎ করতে লাগলেন:

‘দেখাচ্ছি তোকে!’

ডালটা তিনি টেবিল থেকে তুলে মেঝের উপর আছড়ে ফেলে তার উপর পা ঠুকতে শুরু করলেন। বুঝতেই পারছ, গুঁড়ো হয়ে গেল সব।

খুবই প্রাণে লাগল মিতিয়ার, প্রায় খেপেই উঠল সে। তা আর বলতে, নিজের সবচেয়ে দরদের কাজটা পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যেতে দেখলে কারই বা ভালো লাগে।

মিতিয়া তাই কর্তার ছড়ির ডগাটা ধরে ছিনিয়ে নিয়ে তার বাঁট দিয়ে এমন বাড়ি বসাল কর্তার মাথায় যে কর্তা মেঝেয় বসে পড়ল, চোখ এল ঠিকরে বেরিয়ে।

আর আশ্চর্যের ব্যাপার — ঘরে ছিল গোমস্তা, চাকরবাকর কত চাই, তারা সবাই কেমন আড়ষ্ট হয়ে রইল। মিতিয়া বেরিয়ে গিয়ে উধাও হয়ে গেল। তারপর থেকে

কেউ তাকে খুঁজে পায় নি। কিন্তু লোকের চোখে পড়ত তার কাজ, যারা সমঝদার তারাই চিনতে পারত।

আরো একটা ব্যাপার। যে মেয়েটি মিতিয়ার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে হাসত, সেও হয়ে গেল অদৃশ্য, সেও কখনো ফেরে নি।

বহুকাল ধরে মেয়েটিকে খোঁজাখুঁজি করল। হয়তো ভেবেছিল খুঁজে বার করা সহজ হবে, মেয়েরা তো আর ঘর ছেড়ে বেশী দূরে যায় না। তার বাবা-মাকে জমিদারের লোকেরা ব্যস্ত করে তুলল:

'বলো, কোথায় সে আছে!'

কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না।

দানিলা আর ছেলেদের ওপরেও তারা হামলা করেছিল বৈকি, কিন্তু তারপর সম্ভবত মোটা খালাসি-খাজনার কথা ভেবে মায়া হল, তাই ছেড়ে দিল। আর সেই কর্তা, আরো কিছুদিন সে খানিক হাঁসফাঁস করে নিজের চর্বিতেই দম বন্ধ হয়ে মরল।

জীবনের ফুলকি
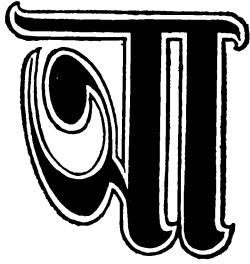
মার বুড়ো বাবা-মা গল্পটা আমায় বলেছিলেন। তাই সবকিছুই ঘটে নিশ্চয়ই বহুকাল আগে। তবে ভূমিদাস-প্রথা উচ্ছেদ হবার পর।

তখনকার দিনে আমাদের খনিতে একটি লোক ছিল, লোকে তাকে ডাকত তিমোখা 'খাটো-হাত' বলে। এই ঠাট্টার নামটা সে পেয়েছিল যখন বুড়ো হয়।

সত্যি বলতে কি, তার হাতের কোনো দোষ ছিল না। লোকে যা বলে, এর চেয়ে খারাপ হাত ভগবান সবাইকে দেন না, তার মতো হাত থাকলে ভালুক শিকারে যাওয়া যায় কেবল একটা ছুরি নিয়ে। একই ধাঁচে তার বাকি শরীরটাও তৈরি — চওড়া কাঁধ, চওড়া বুক, শক্ত পা আর এমন একটা ঘাড় যা বাঁশ দিয়ে নোয়ানোও কঠিন। আগের কালে ছুটির দিনে লোকে ঘুষোঘুষি করত, এক সারি লোকের সঙ্গে আরেক সারি, এধরনের লোককে বলত লড়াকু, কারণ যেখানেই তারা ঘা দেবে সেখানটাই ভাঙে। কিন্তু সবচেয়ে ভালো লড়িয়েরাও' তিমোখার কাছ ঘেঁষত না, পাছে সে চটে ওঠে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় ব্যাপারটা তার বিশেষ প্রিয় ছিল না। লোকে ঠিকই বলে — শক্তিমান হলে কেউ মারামারি করে বেড়ায় না।

তিমোখা ছিল খুব কাজের লোক। কাজ করত খুব আর মগজও চালাত। কোনো কিছু একবার দেখিয়ে দিলেই সে সেটা সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলবে। কারো চেয়ে খারাপ নয়।

আমাদের এলাকায় নানা ধরনের পেশা আছে।

কেউ খনি থেকে খনিজ নিয়ে আসে, অন্যরা সেটা গলায়। কেউ মাটি ধুয়ে সোনা বের করে, প্ল্যাটিনাম কুড়োয়, রঙীন পাথরের জন্যে মাটি খোঁড়ে, পাথরের

খনিতে কাজ করে। কেউ আবার জহরত খোঁজে, পালিশ করে সেগুলো। তারপর রয়েছে গাছ কেটে নদীতে ভাসানো। গলাবার কাজের জন্যে লোকে তৈরি করে কাঠকয়লা। কেউ শিকার করে, ফাঁদ পাতে, মাছ ধরে। কোনো ঘরে গেলেই দেখা যাবে কেউ একজন উনুনের পাশে বসে ছুরি-কাঁটার ওপর হাতুড়ি পিটিয়ে নক্সা তুলছে, আরেকজন হয়তো জানালার পাশে বসে পালিশ করছে পাথর, আরেকজন আবার বেঞ্চিতে বসে বুনছে গাছের ছালের মাদুর। অবিশ্যি চাষবাস, গরুবাছুর তাও আছে। যেখানেই পাহাড় রাজী হয়েছে সেখানেই রয়েছে ক্ষেত কি ঘেসো মাঠ। বাস্তবিকই জায়গাটায় নানা ধরনের কাজ। আর প্রত্যেক ধরনের কাজের জন্যেই চাই তা করতে পারার কায়দা আর দরকার জীবনের ফুলকি।

এই ফুলকি এমন একটা জিনিস যে, এমন কি আজকের দিনেও সবাই ভালো করে সে-কথা বোঝে না। কিন্তু তিমোখার ব্যাপারে একটা অদ্ভুত জিনিস ঘটল। তাতে সবাইকারই টনক নড়ল।

এই তিমোখা — কাঁচা বয়েস নাকি মাথায় পোকা নড়ত কে জানে, ভাবল এখানকার সব কাজ সে নিজের হাতে করে দেখবে। বড়াই করত:

'সবকিছু পুরোপুরি জানব।'

বাড়ির লোকজন, বন্ধুবান্ধবেরা বোঝাত:

'ওতে কোনো লাভ নেই। বরং একটা পেশা খুঁটিয়ে শেখা ভালো। নিজের হাতে সব পেশা পরখ করতে হলে সারা জীবনেও কুলবে না।'

তিমোখা তার গোঁ ছাড়ে না, বলে:

'কাঠ কাটা — দুই শীতকাল, কাঠ ভাসানো — দুই বসন্তকাল, সোনা খোঁজা — দুই গ্রীষ্মকাল, খনিতে কাজ করা — এক বছর, ধাতু গলানো — সেটা নেবে দশ বছর। আর তারপর রয়েছে কাঠকয়লা পোড়ানো আর জমি চষা, শিকার করা আর মাছ ধরা। সেগুলো তো শুধুই খেলা। যখন বুড়ো হব তখন করব পাথর-খোদাই, কিম্বা হব ছাঁচ বানিয়ে, কিম্বা দমকল আপিসের জিন-মিস্ত্রী। বসে থাকব গরমের মধ্যে, ঘোরাব চাকা, পালিশ করার পাথরটা চালাব কিম্বা তুরপুন দিয়ে করব ফুটো।'

বুড়ো লোকরা শুনে অবশ্যি হাসত:

'বেশী বড়াই করো না, লম্বা ঠাংওলা সারস! যতদিন না হাড়ে খানিক ব্যথা ধরে ততদিন সবুর করো।'

কিন্তু তিমোখা তাদের কথায় কান দিত না।

বলত, 'সব গাছে চড়ব, পেঁছব মগডালে।'

বুড়োরা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল। ডাল দিয়ে তো সব মাপা যায় না। যেটা ছিল চুড়ো সেটা হয়ে পড়তে পারে মাঝামাঝি জায়গা। চুড়োগুলোও তো নানা ধরনের — কোনোটা উঁচু, কোনোটা নীচু।

কিন্তু কোনো ফল হল না, কেউ তাকে পারল না বোঝাতে। তাই তারা হাল ছেড়ে দিল। যা খুসি তাই করো। কিন্তু বলো না যেন আমরা তোমাকে সাবধান করে দিই নি।

তিমোখা আমাদের এলাকার সবরকম পেশাই শিখতে শুরু করে দিল।

গায়ে তার ছিল জোর, কাজে ঢিল নেই, এমন লোক পেলে সবাই খুসি হয়ে ওঠে। গাছ কাটাই হোক আর খনিজ ভাঙাই হোক — এসো, এসো। আর সূক্ষ্ম কাজ — তা পেতেও তার অসুবিধে হল না, কারণ তার মাথার ভিতরে মগজ ছিল ভালো আর হাতের আঙুলও ছিল খাসা — আড়ষ্ট নয়, চটপটে।

নানা রকম হাতের কাজ করে বেড়াল তিমোখা, সবই বেশ উৎরাল। কারুর চেয়েই খারাপ নয়।

এর মধ্যে তার বিয়ে হয়ে গেছে, একঘর ছেলেমেয়ে, কিন্তু তবু সে বদলাল না। একটা কাজ সে খুঁটিয়ে শেখে, আর শেখা হলেই শুরু করে দেয় আর একটা। অবশ্যই রোজগার তাতে কমে যেত, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাত না, যেন সেইটাই ঠিক, সাধারণ জিনিস। তার ধরন-ধারনে খনির লোকেরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। দেখা হলে তারা বলত:

'কী তিমোখা, এখনো তুমি তালার কারিগর, নাকি দমকলের আপিসে গিয়েছ জিন-মিস্ত্রী হতে?'

তাদের ঠাট্টা-তামাসা তিমোখা গায়ে মাখত না, একই ভাবে জবাব দিত:

'সময় আসবে যখন এমন কোনো কাজ থাকবে না যেটা করি নি।'

তারপর একদিন বউকে বলল, সে যাচ্ছে কাঠকয়লা পোড়াবার কাজে। বউ তো প্রায় কেঁদে ফেলে:

‘ওগো, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এর চেয়ে খারাপ কিছু পেলে না! সমস্ত কুঁড়ের মধ্যে ধোঁয়ার গন্ধ ছাড়বে! কখনোই তোমার কামিজ পরিষ্কার করতে পারব না! ওধরনের কাজের মধ্যে কিছুই নেই, শেখবার কী আছে?’

বউ এসব বলল, কারণ সে জানত না। এখনকার দিনে চুল্লি থাকায় ও কাজ সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু তখনকার দিনে কাঠকয়লা পোড়ানো হত ভাটির মধ্যে, তার জন্যে মাথা খাটাতে হত, কায়দা জানতে হত। অনেকেই সারা জীবন ধরে চেষ্টা করেও কখনোই সত্যিকারের ভালো কাঠকয়লা পায় নি। কোনো কোনো বাড়ীর লোকেরা বলত:

‘বাবা আমাদের খাটিয়ে মারে, একেবারে বিশ্রাম কিম্বা শান্তি দেয় না। কিন্তু পায় শুধু পোড়া ধরা বিশ্রী কাঠ। অথচ পড়শীরা দিব্যি গান ধরে, কাঠকয়লায় তাদের সুন্দর পরিষ্কার একটা খটখটে আওয়াজ। বেশী পোড়াও নয়, কম পোড়াও নয়। খারাপ কয়লা বলতে গেলে একটাও টুকরো নেই।’

যত খুসি তিমোখার স্ত্রী বিলাপ করুক না কেন, কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারল না। তিমোখা তাকে শুধু একটা সান্ত্বনা দিল:

‘বেশী দিন ধরে কালিঝুলি মেখে থাকব না।’

নিজের দাম অবিশ্যি জানত তিমোখা। যখন চাইত কাজ বদলাবে, তখন প্রথমে খুঁজে বার করত এমন একজন যে তাকে পরের কাজটা শেখাতে পারে। সবচেয়ে ভালো লোক বার করার দিকে সে নজর রাখত।

কাঠকয়লা পোড়ানোর ব্যাপারে নেফিওদ দাদু কাছেপিঠে সবাইকার কাছেই চেনা। তার কাঠকয়লাই সবচেয়ে ভালো। লোকে সেটার নাম দিয়েছিল ‘নেফিওদের কাঠকয়লা’। গুদামঘরে সে কাঠকয়লা অন্যদের চেয়ে আলাদা করে রাখা হত। সেটা দেওয়া হত সবচেয়ে সূক্ষ্ম কাজের জন্যে।

তিমোখা তাই গেল নেফিওদ দাদুর কাছে। বুড়ো নেফিওদ তার সম্বন্ধে সব কথাই জানত, জানত তার ছিটের কথা।

বলল, ‘তোমাকে আমার শাগরেদ হিসেবে নেব, সবকিছুই শেখাব, কিছুই লুকোব

না — কিন্তু এক শর্তে। যতদিন না তুমি আমার চেয়ে ভালো কাঠকয়লা বানাতে পারছ, ততদিন আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না।'

তা যে সে বানাতে পারবে, সে সম্বন্ধে তিমোখার কোনো সন্দেহ ছিল না।

বলল, 'বেশ, কথা দিলাম।'

ব্যস, রাজী হয়ে গেল। গেল কাঠকয়লার চালায়।

নেফিওদ দাদু, জানো তো, এমন জাতের লোক যারা সব খুঁটিনাটির কথা ভেবে থাকে, কিসে সবচেয়ে ভালো করে কাজ করা যায়। এমন কি গাছের গুঁড়ি ফালি ফালি করার মতো সহজ কাজ সম্বন্ধেও তার বলার কথা আছে:

'শোনো, বাপু। আমি বুড়ো লোক, আমার শক্তি শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু তোমার চেয়ে খারাপ কাটি না। এর কারণ কী বলো তো?'

তিমোখা উত্তর দিল, একটা ধারাল কুড়ুল আর একজোড়া তালিম পাওয়া হাত।

বুড়ো বলল, 'শুধুই কুড়ুল আর হাত নয়, কোপ দেবার পক্ষে সবচেয়ে ভালো জায়গাটা খুঁজে বার করি।'

তিমোখাও তাই সবচেয়ে ভালো জায়গা খুঁজতে শুরু করল।

নেফিওদ দাদু এ ব্যাপারের সবকিছু বুঝিয়ে দিল। তিমোখা দেখল ঠিক কথাই বলেছে সে। এ কাজে সে আনন্দও পেল। কতক গুঁড়ি আধখানা হয়ে এমন ছিটকে যায় যে দেখতেও ভালো লাগে। তারপর কিন্তু ভাবল — অন্যভাবে কাটলে হয়তো আরো ভালো হত।

শুরু থেকে একেবারে নিখুঁত জায়গা ধরার ভাবনা তিমোখাকে পেয়ে বসল।

যখন ভাটির মধ্যে চেলা কাঠ পোরার সময় এল তখন দেখা গেল নানা জিনিস ভাবতে হচ্ছে। একেক ধরনের কাঠ একেক ভাবে সাজানোটাই শেষ কথা নয়, এমন কি এক জাতের কাঠ সাজাবার বেলাতেও মাথা ঘামাতে হয়। ভিজে জায়গার পাইন কাঠ একভাবে হয় বাঁকিয়ে রাখতে, শুকনো জায়গার পাইন কাঠ হয় অন্যভাবে। যে গাছ আগে কাটা হয়েছে তাকে রাখতে হবে এইভাবে, পরের কাটা গাছ — ঐভাবে। মোটা চেলার জন্যে দরকার এইরকম বাতাসের, সরুর জন্যে অন্য ধরনের, চেলা বাঁশের জন্যে আবার ভিন্ন জাতের। এসব ভালো করে বুঝলে। মাটি চাপা দেবার বেলাতেও তাই।

নৈফিওদ দাদু সবকিছুই সহজ করে সৎভাবে বুঝিয়ে বলত, মাঝে মাঝে শোনাত কোথা থেকে এটা সে নিজে শিখেছিল।

'এক শিকারী শিখিয়েছিল ধোঁয়ার গন্ধ কী করে শুঁকতে হয়। শিকারীদের নাক তো। এতে আমার খুব উপকার হয়েছে। যেই না ঐ টকটক গন্ধ পাই অমনি বাতাসের ঝাপটা করি জোরালো। সবকিছুই ঠিক হয়ে যায়।'

আর একদিন একটি মেয়ে যাচ্ছিল। খানিক গরম হবার জন্যে ভাটির পাশে দাঁড়ায়। বলে, 'এই-পাশটা বেশী গরম হয়ে পুড়ছে।'

'কী করে জানলে?' জিজ্ঞেস করলাম।

বলে, 'ঘুরে যাও-না, নিজেই বুঝতে পারবে।'

ঘুরে এলাম। বাস্তবিকই তার কথাই ঠিক। আরো কিছু কাঠ গুঁজে ঠিক করে দিলাম। সেই মেয়েটির কথা কখনো ভুলি নি। মেয়েরা সব সময়ই উনুনের পাশে থাকে তো, আঁচ সম্পর্কে ওদের টনটনে জ্ঞান।

একথা-সেকথা সে বলত বটে, তবে প্রতিবারেই ফিরে আসত জীবনের ফুলকির কথাটায়।

'এইসব বাতাস যাবার গর্তের ভিতর দিয়ে আমাদের ফুলকি অন্ধকারে লাফিয়ে বেরোয়। খেয়াল রেখো যাতে সেটা সর্বনেশে আগুন হয়ে না ওঠে, ডুবে না যায় অনর্থক বাজে ধোঁয়ায়। তখন যদি একটি ভুল করো তাহলে দেখবে কাঠ হয় বেশী পুড়েছে, নয় কম। কিন্তু সব গর্ত যদি ভালোভাবে তৈরি করা যায় তাহলে তোমার কাঠকয়লার মধ্যে থাকবে ভালো, পরিষ্কার খটখটে আওয়াজ।'

তিমোখার সবটাই ভারি মনে ধরল। দেখল, কাজটা একেবারেই সহজ নয়, খাটতে হবে। কিন্তু তাহলেও ঐ ফুলকির কথাটায় তেমন কান দিল না।

যে কাঠকয়লা তারা বানাল তার সবটাই হল পয়লা নম্বরের, কিন্তু গাদার থেকে যখন বাছতে লাগল, দেখা গেল সেগুলো মোটেই একধরনের নয়।

'এগুলো এরকম হল কেন?' জিজ্ঞেস করল নৈফিওদ দাদু। তিমোখা নিজেই মাথা ঘামাতে লাগল: কোথায় ভুল করেছে?

তিমোখা সমস্ত কাজ একা করতে শেখে। মাঝে মাঝে তার কাঠকয়লা হত

নেফিওদের চেয়েও ভালো, কিন্তু তা সত্ত্বেও কাজটা সে ছেড়ে গেল না। বুড়ো তাকে দেখে হাসত:

'বাছা, আর কখনোই অন্য কোথাও যাবে না। জীবনের ফুলকির কথাটা তোমার মাথায় ঢুকেছে। মরার সময় পর্যন্ত এটা তোমার মাথায় থাকবে।'

তিমোখার কাছেও ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগত। এমন তো তার জীবনে আগে কখনো ঘটে নি?

নেফিওদ দাদু বুঝিয়ে বলল, 'তার কারণ সবসময় তুমি নীচু দিকে তাকাতে, দেখতে কী কী করেছ। কিন্তু যখন ওপর দিকে তাকাতে শুরু করলে, চেষ্টা করলে কাজ ভালো করে করতে, তখনি ফুলকিটা তোমায় ধরে ফেলল। সবরকম কাজের মধ্যেই তা আছে, নিখুঁত কায়দা যে জানে, তার সামনে সামনে সেটা ছুটে যায়, পিছন পিছন ডেকে নিয়ে যায় মানুষকে। ব্যাপারটা, ভায়া, এই!'

আর সত্যিই তাই। কাঠকয়লা-পুড়িয়ে হয়েই তিমোখা রয়ে গেল। আরো একটা ঠাট্টার নাম জুটল তার। ছোকরাদের সে উপদেশ দিতে ভালোবাসত। সর্বদাই তাদের বলত নিজের কথা, কেমন করে যখন সে জোয়ান ছিল তখন চায় সবরকম কাজ শিখতে, কিন্তু অবশেষে থেমেছে কাঠকয়লা পোড়ানোর কাজে।

বলত, 'আমার কাজের মধ্যে কখনোই ঐ ফুলকিটাকে ধরতে পারি না। আমার চেয়ে অনেক আগে সেটা ছোটে। আমার হাতদুটো খাটো, এই হল ব্যাপার।'

বলে বাড়িয়ে দিত তার বিরাট হাতদুটো। লোকেরা অবশ্য হাসত। এই জন্যেই লোকে তাকে ডাকত 'খাটো-হাত' বলে। তবে শুধুই সেটা ঠাট্টা করে, কারণ সর্বত্রই তার সম্বন্ধে লোকের ধারণা ছিল ভালো।

নেফিওদ দাদু মারা যাবার পর 'খাটো-হাত' ছিল সবচেয়ে ভালো কাঠকয়লা-পুড়িয়ে। গুদামের মধ্যে তার কাঠকয়লা রাখা হত আলাদা করে। নিজের কাজে সে ছিল বাস্তবিকই ওস্তাদ, তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

এখনো আমাদের এলাকায় তার নাতি আর নাতির ছেলেরা বেঁচে আছে। তারাও সেই ফুলকিটা খোঁজে নিজের নিজের কাজের মধ্যে। তবে তারা কেউ নিজেদের হাত নিয়ে আপসোস করে না। হয়তো তারাও জানে তালিম মানুষের হাতকে এত বড় করতে পারে যে, তা পেঁছিতে পারে মেঘ পর্যন্ত।

ঝেলেজ্‌কোর
মলাট

সালের কিছু পরের কথা। জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধের আগেকার ঘটনা।

সে সময় পাথর খোদাইকরদের কাজে ভারি মন্দা চলছে। বিশেষ করে মালাকাইটের। ভালো পাথর, জানো তো, প্রায় পাওয়াই যেত না। গুমেশ্‌কি খনি, যেখানে সবচেয়ে ভালো মালাকাইট পাওয়া যেত, নিঃশেষ হয়ে গেছে। গাদাগুলো বহুবার হয়েছে খুঁজে দেখা। তাগিল তামা খনিতে কখন-সখন এক খণ্ড হয়তো দেখা যায়, কিন্তু খুব ঘন ঘন নয়। যাদের গরজ, তারা ঐরকম টুকরো খুঁজে বেড়াত, যেন দামী জহরত। শহরে একটা বিদেশী দপ্তর ছিল। পাথরগুলো তারা কিনে নিত। আর বোঝোই তো, আমাদের কারিগরদের জন্যে সে দপ্তরের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তাই যা মিলত, সবই চলে যেত বিদেশে।

তার ওপর আবার মালাকাইটের তখন আর চলনও ছিল না। পাথরের ব্যাপারেও ওধরনের ব্যাপার তো ঘটে। সারা জীবন ধরে বুড়ো দাদু কোনো একটা পাথর নিয়ে কাজ করে গেল, কিন্তু নাতিদের কালে কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। শুধু গির্জে আর প্রাসাদ সাজাবার জন্যে জাস্‌পার আর রঙীন কোয়ার্ট্‌জ'এর চাহিদা ছিল। কিন্তু পাথরের কাজের দোকানগুলো নিত শুধু সস্তার জিনিস। চলত শুধু জার্মান ধাঁচে বানানো যত বাজে জিনিস: সোনা রুপোয় বাঁধানো রঙচঙে পাথর হলেই হত। সোজা কথায়, ভালো কারিগরের তাতে কোনো আনন্দই নেই। কাজ শেষ করে সে, পাইপ টানে, তারপর থুথু ফেলে শুরু করে আর একটা। একেবারেই বাজারের জিনিস। সমঝদার লোকের চেয়ে দেখতেও ঘেন্না হবে।

তাহলেও জোয়ান থেকে যেসব বুড়োর রক্তে রয়েছে মালাকাইটের নক্সা, তারা পেশাটা ছাড়ে নি। যেমন করেই হোক, তারা পাথর আর বুঝদার খদ্দের খুঁজে বার করে।

আমাদের খনিতে সেধরনের একটি লোক ছিল। লোকে তাকে ডাকত ইয়েভলাখা ঝেলেজ্‌কো বলে। লোকে বলত সে এক গুপ্ত জায়গা খুঁজে পেয়েছে, যেখান থেকে মালাকাইট পায়। কথাটা সত্যি না মিথ্যে তা বলতে চাই না। তবে তার সম্বন্ধে এই একটা গল্প বলত লোকে।

রানীর জন্যে কী এক বিরাট উৎসব হবার কথা। সেটা শুধুই নাম-দিন বা জন্মদিন নয়, এমন ব্যাপার আজকাল লোকে যাকে জয়ন্তী বলে। মানে, হয়তো সাত নম্বর মেয়ে জন্মেছিল বা অমনি কিছু। সেটা বড়ো কথা নয়। শুধু রাজ পরিবারের বৈঠকে ঠিক হল রানীকে একটা চমৎকার উপহার দিতে হবে।

জানোই তো, রাজাদের অবস্থা: একবার হাঁচল তো অমনি একটা রুমাল হাজির। মদ খেতে ইচ্ছে হল, ছুটে এল এক ঠিকাদার, জলখাবার খেতে চায়, ধেয়ে এল আরেক ঠিকাদার। আর উপহারের ব্যাপারে ছিল ফরাসী একটি লোক, নাম ফাবের্‌ঝেই। নিজের কাজ সে ভালোই বুঝত। জহরত আর পাথর খোদাই'এর জন্যে তার ছিল নিজস্ব এক বিরাট কারখানা। ভালো ভালো তার কারিগর। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ আর মস্কো দুই রাজধানীতেই তার বিরাট ব্যবসা।

এই ফাবের্‌ঝেইকে রাজা ডেকে পাঠিয়ে বললেন, অমুক দিনে রানীর জন্যে একটা সুন্দর উপহার দিতে হবে, দেখে যেন সবাই অবাক হয়ে যায়। বুঝতেই পারছ, ফাবের্‌ঝেই কুর্নিশ করে বলল: 'তাই হবে।' কিন্তু মনে মনে ভাবল: 'ঠ্যালা বটে!' কিসে কে খুসি হয়, সে কথা সে ভালোই জানত, এটা কিন্তু ওধরনের সহজ নয়। হীরে, পান্না, জহরত দিয়ে তো রানীকে অবাক করা যায় না, সে সব রত্নে তার সিন্দুক ভরা, রত্নগুলোও খুব উঁচু জাতের। মিহি কাজ বা নক্সাতেও চলবে না — সমঝদার তো নয়। তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার — ফরাসী লোকটি জানত যে, উনিশশো-পাঁচ সালের পর থেকে লাল পাথর রানী দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। হয়তো সেগুলো তাঁকে লাল ঝাণ্ডার কথা মনে করিয়ে দেয়, কিম্বা হয়তো অন্য কোনো কারণ আছে, কে জানে। মানে, হয়তো-বা সেই ইস্তাহারের ছবির কথা মনে

পড়ে, লোকে যা লুকিয়ে বিলি করত, রক্ত মাখা হাতে যাতে রাজা আর রানীকে দেখানো হয়েছিল, হাতড়ে হাতড়ে রত্ন খুঁজছেন। কী কারণ তা জানি না। সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবারও দরকার নেই। তবে উনিশশো-পাঁচের পর থেকে রানীর কাছে কোনো লাল পাথর না নিয়ে যাওয়াই ভালো। নিয়ে গেলে আর্তনাদ করে তিনি গলা ফাটাবেন, ভুলে যাবেন রুশ ভাষা এবং জার্মান ভাষায় করবেন গালিগালাজ। তারপর, জানোই তো, জেরা আর জেরা — ঐ পাথর রানীকে দেখানোর কী উদ্দেশ্য ছিল, কে রয়েছে তোমার পিছনে, কে ছিল তোমার সঙ্গে। এধরনের বিপদে পড়তে কে চায়।

দারুণ মাথা ঘামাতে লাগল এই ফরাসী ফাবের্ঝেই, কী জিনিস হতে পারে যা রানীকে অবাক করে দেবে, যার মধ্যে লালের ছিটেফোঁটাও নেই। অনেক ভেবেচিন্তে সে গেল তার ওস্তাদ কারিগরদের কাছে। সবকিছু তাদের খোলাখুলি জানিয়ে সে বলল:

'তোমরা কী বলো?'

আর বোঝোই তো, কারিগরদের সবারই আপন আপন মত; কিন্তু সেখানে এক বুড়ো ছিল। সে বলল:

'আমার মতে মালাকাইট পাথরই এখানে চলবে। আনন্দের পাথর, ভারি তার তেজ। সবচেয়ে মনমরা হাঁদাটাও দেখে খুসি হয়ে উঠবে।'

কর্তা অবশ্য বুড়ো লোকটিকে ধমকাল — সবচেয়ে মনমরা হাঁদার কথা আসে কোত্থেকে, প্রশ্নটা যে হচ্ছে রানীকে উপহার দেওয়া নিয়ে। ওসব কথায় সে বিপদে পড়বে। কিন্তু পাথর সম্বন্ধে সে একমত হল:

'তবে ঠিকই বলেছ, এ উপলক্ষে মালাকাইট সম্ভবত খুব ভালোই হবে।'

অন্যান্য কারিগরদের কিন্তু সন্দেহ ছিল:

'আজকাল সত্যিকারের ভালো পাথর পাওয়া যায় না।'

নিজের অর্থবলের উপর কর্তার বিশ্বাস ছিল।

বলল, 'দাম নিয়ে দরাদরি না করলে যেকোনো ধরনের পাথরই পাওয়া যাবে।'

এইভাবে ঠিক হল — মালাকাইটের মলাট দেওয়া একটা এ্যালবাম তারা বানাবে। নক্সা কী হবে সেটাও স্থির করে ফেলল।

যেমন কথা, তেমনি কাজ। সেই দিনই ফাবের্‌ঝেই তার দালাল পাঠাল আমাদের এলাকায়। হুকুম দিল:

'ঠাণ্ডা রঙের আসল পাথর পেলে টাকার পরোয়া করো না।'

ফাবের্‌ঝেইয়ের সেই দালাল এসে খোঁজখবর শুরু করল। প্রথমে অবশ্য সে চেষ্টা করল গুমেশ্‌কিতে। কিন্তু সেখানকার পাথর খোদাইকারীরা তাকে কিছুই দিতে পারল না — কোনো ভালো পাথরই পাওয়া গেল না। গেল তাগিলে — সেখানে পেল ছোট ছোট টুকরো টুকরো পাথর, কিন্তু ভালো জাতের নয়। সে একটা লোক লাগাল বিদেশী দপ্তরটায় খোঁজ নিতে, তবে ওরা কি আর বিক্রি করে, যখন টুকরোটাকরা যা পায়, নিজেরাই কিনে নেয় বিদেশের জন্যে। যখন সে দমে এসেছে তখন ভাগ্যি ভালো, এক খনির মজুর তাকে বলল:

'চলে যাও ইয়েভলাখা ঝেলেজ্‌কোর কাছে। তার কাছে নিশ্চয়ই পাথর আছে। দিন কয়েক আগে, এক খদ্দেরকে সে এমন একটা কাজ দেয় যে এখানকার সব কারবারী বিদেশী দপ্তর পর্যন্ত এক সপ্তাহ ধরে ঘুষি পাকিয়ে, পা ঠুকে হুমকি দিয়েছে:

'তার সওদা নিয়ে ইয়েভলাখা এখানে যেন না আসে। যতই সস্তা হোক না কেন, আমরা নেব না!'

ইয়েভলাখা কিন্তু শুধু হেসে মুখের মতো জবাব দেয়:

'চোরদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বাঁচা গেল। একদিন আমাকে তাদের সামনে দাঁড়াতে হত টুপি খুলে, সেকথা আমিও ভুলি নি। সেটি আর হবে না। আমার পাথরের কারুর দরকার পড়লে আমার কাছেই তারা আসতে পারে। দেখব, কাকে বাধিত করার দরকার, কাকে দরকার দরজা দেখানো। কিন্তু তোমাদের ঐ কারবারীরা — এখানে আসার কষ্ট করার কোনো দরকার নেই। আমি বুড়ো লোক, কিন্তু এমন ঘুষি মারতে পারি যাতে দশমনী পাথুরে বিবেক সমেত সে পাখির মতো উড়ে যাবে।'

ফাবের্‌ঝেইয়ের দালাল একথা শুনে সামান্য চিন্তিত হয়ে পড়ল। জিজ্ঞেস করল:

'মনে হচ্ছে এই ইয়েভলাখা লোকটার টাকার দরকার নেই। খুব ধনী নাকি?'

লোকটি বলল, 'না, ধন-দৌলত বিশেষ দেখা যায় না। শুধু নিজের শিল্প কাজের কদর জানে। তার কাছে সেটা টাকার চেয়ে দামী। যদি ওর ইচ্ছে না হয়, তাহলে রুবল দিয়ে লোভ দেখানো যাবে না; কিন্তু যদি তার কৌতূহল জাগানো

হয়, তাহলে সে বেশী দর হাঁকবে না। আর কাজটা — সেটা দেখাও প্রদর্শনীতে, দেখাবার জন্যে পাঠাও রাজবাড়ীতে, কোথাও বেমানান হবে না।'

দালাল কিছু আস্বস্ত হল... ভাবল: 'এই ইয়েভলাখাকে লোভ দেখাবার মতো কিছু আমার কাছে আছে। তাকে বলব পাথরটা দরকার রাজবাড়ীর জন্যে।' ঠিকই ভেবেছিল সে, কিসের জন্যে পাথরটা দরকার জানার সঙ্গে সঙ্গে ইয়েভলাখা রাজী হয়ে গেল। শুধু জিজ্ঞেস করল:

'কোন মাপের পাথর চান, আর কোন নক্সার?'

দালাল তাকে বলল প্রত্যেকটা মলাট লম্বায় অন্তত হবে চোদ্দ ইঞ্চি আর চওড়ায় পাঁচের চেয়ে সামান্য বেশী; নক্সা হবে তাদের নিজস্ব, দুটো মলাট যেন এক রকম না দেখতে হয়।

ইয়েভলাখা বলল:

'বেশ, তেমন পাথর খুঁজে বার করব। এক সপ্তাহ পরে এসো।'

সে তার দাম জানাল — প্রত্যেকটা টুকরো দু'শো রুবল করে। দালাল অবিশ্যি দরাদরি করল না। সে আরো কিছু আলাপ চালাতে চেয়েছিল, কিন্তু ইয়েভলাখা বাজে গল্প করার লোক নয়। তাই তাকে থামিয়ে দিল:

'বললাম, এক সপ্তাহ পরে এসো, তখন আলাপ করা যাবে। যখন আমাদের হাতে কিছু নেই, তখন কথা বলে লাভ কী?'

এক সপ্তাহ পরে দালাল এল, মলাট তৈরি। আর শুধু দুটো নয়, সেরকম চারটে। দেখতে কেমন, জানো তো, বসন্ত কালের ঘাসের মতো, যখন তার উপর রোদ ঝলমল করে আর বাতাস ঢেউ খেলিয়ে যায়। তাদের প্রত্যেক মলাটেরই নিজস্ব নক্সা। একটি লতাপাতার সঙ্গেও আরেকটার মিল নেই। তাহলেও এমনভাবে বাছা যাতে পাথর সম্বন্ধে যার কোনো জ্ঞানই নেই, সেও বলতে পারে কোন দুটো জুড়ি। এককথায়, ওস্তাদি কাজ।

ইয়েভলাখা সেগুলো বাইরে রাখল।

'যে জোড়া দরকার বেছে নাও।'

ফাবের্‌ঝেইয়ের দালাল পাথর চিনত। মলাটগুলো ভালো করে দেখে, একটিও ত্রুটি বার করতে পারল না। নক্সা দেখে সে মুগ্ধ।

বলল, 'সবগুলোই কিনব।'

বুড়ো বলল, 'তা বেশ, দরকার থাকলে নাও। দামটা দিয়ে দাও।'

দালাল তাড়াতাড়ি কথা মতো দাম চুকিয়ে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে আবার ফিরে গেল। ফাবের্‌ঝেইয়ের কারিগরেরা সবাই মলাটগুলোর দারুণ প্রশংসা করল, কিন্তু যে-বুড়ো কারিগর মালাকাইটের পরামর্শ দিয়েছিল, তার মনে কিন্তু সন্দেহ জাগল।

বলল, 'মনে হয় যেন তৈরি করা পাথর। স্বাভাবিক পাথর নয়। হাতে বানানো।'

অন্য লোকরা হাসতে লাগল — বুড়োটা ভারি চালাক, বিদ্যে জাহির করতে চায়। কর্তা কিন্তু সোজাসুজি বলল:

'যদি তৈরি করা হয়, তাহলেও আসলের চেয়ে খারাপ নয়, কারিগরিতে তার কদর এমন কি আরো বেশী।'

এ্যালবাম তো তৈরি করল। দেখে সবাই অবাক। রাজা যেই শুনলেন আরো একজোড়া মলাট আছে, অমনি হুকুম দিলেন, তাঁর বিনা অনুমতিতে তা বাজারে ছাড়া চলবে না। তাই তা পড়েই রইল ফাবের্‌ঝেইয়ের মজুদে। এই সময় ফরাসী দেশ থেকে আসেন কোনো গণ্যমান্য লোক রাজার সঙ্গে দেখা করতে। এই গণ্যমান্য লোকটির সঙ্গে আসে একটি লোক, যে নকল হীরে তৈরি করার কাজে ওস্তাদ। পিটার্সহফ'এর পাথর পালিশ আর খোদাইকারীরা এবং ফাবের্‌ঝেইয়ের কারিগরেরা, সবারই খুব ইচ্ছে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু জানে। সবাই তার পিছনে পিছনে ঘুরঘুর করতে লাগল, সুন্দরী মেয়ের পিছনে যেন ছেলের দল, চেষ্টা করল তাকে নানাভাবে খুসি করতে। একজনের মাথায় এল রাজবাড়ীতে খোদাই-করা পাথর দেখাবে। অনুমতি মিলল। সেখানে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ছিল ইয়েভলাখার মলাটদুটো। ফরাসী ওস্তাদ সে পাথরের সৌন্দর্য দেখে অবাক হয়ে গেল, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল:

'বাঃ, আপনাদের কারিগরদের কপাল ভালো! কিছু না ভেবেচিন্তেও পাথরটা কাটলে দাঁড়ায় কেমন আশ্চর্য!'

আমাদের লোকরা তাকে বুঝিয়ে বলল ব্যাপারটা অতো সহজ নয়, পাথরের টুকরোগুলো একসঙ্গে জুড়তে হয়।

লোকটা বলল, 'তা জানি, কাজটাও নিশ্চয় একঘেয়ে, কিন্তু তাহলেও তৈরি করতে মাথা খেলাবার কিছু নেই, হাতের কাছেই তো সবধরনের নক্সার পাথর।'

তখন কারিগরদের মধ্যে একজন ঝট করে বলে বসল:

'কারখানায় মলাটটা নিয়ে আমাদের তর্ক হয়েছিল, পাথরটা আসল না নকল।'

কথাটা শুনে ফরাসী কারিগরটি লাফিয়ে উঠল যেন হুল ফুটেছে। নিজের সমস্ত চাল ভুলে সে হৈচৈ করে উঠল, জিজ্ঞেস করতে লাগল: কে এটা বলেছে? কেন বলল? কী চিহ্ন দেখে? কী নিষ্পত্তি হয়েছে? কিন্তু সবচেয়ে বেশী করে জানতে চাইল, যে ওগুলো বানিয়েছে সেই কারিগর থাকে কোথায়। অবাক হল সে, কারণ এ নিয়ে কেউই তাকে সঠিক কিছুই বলতে পারল না। শুধু জানাল যে, কোনো এক গ্রাম থেকে সেই দালাল এগুলো আনে। তারা শুনেছে কারিগর পাগলাটে ধরনের, তার সঙ্গে বেফাঁস কিছু করলে দারুণ ঘুষি মারতে পারে। কিন্তু তার নাম যে কী, তা শোনে নি। সেই দালাল অবশ্য বলতে পারে, কিন্তু কর্তার কোনো কাজে সে বাইরে গেছে।

পরের দিন সেই ফরাসী কারিগরটি কারখানায় ফাবের্‌ঝেইয়ের কাছে গিয়ে মলাট নিয়ে রাজ্যের প্রশ্ন করতে শুরু করল। বুড়ো মালাকাইট খোদাইকারী কোনো কথা লুকোল না, বলল কেন তার সন্দেহ হয়। সবাই আবার তর্ক করতে শুরু করল। প্রত্যেকেই দেখাতে চায় তার কথাই ঠিক, তখন ফাবের্‌ঝেই নিজে এসে সব কথা শুনে, নিজেদের ফরাসী ভাষায় কী যেন এ্যাঁ-ম্যাঁ করে বলল মলাটজোড়া নিয়ে আসতে।

'সময় নষ্ট করে লাভ কী। ডান দিকের কোণটা করাত দিয়ে কেটে পরীক্ষা করা যাক। এতে মলাটের ক্ষতি হবে না, ওগুলো আমরা গোল করে দিতে কিম্বা কোনোরকমের অলঙ্কার দিয়ে ঢেকে দিতে পারি। তার বদলে সঠিক জানতে তো পারব পাথরটা আসল না বানানো।'

চটপট কোণ কেটে এ্যাসিডে ডুবিয়ে, গুঁড়িয়ে ওজন করে পরীক্ষা চলল। মানে, সবকিছুই করল, কিন্তু কিছুই প্রমাণ হল না। এইটে বোঝা গেল যে উপাদান মালাকাইটের মতো, তবে ষোলআনা মিল নেই। সবারই ধারণা হল বুড়ো লোকটি বিশেষ মিথ্যে বলে নি, কী যেন ঠিক তেমনটি নয়।

এতে সবাইকার চেয়ে ফরাসী কারিগরটাই বেশী কৌতূহলী হয়ে উঠল। কত কী বই এনে পাতা ওল্টাতে লাগল। যখন স্থির হল পাথরটা হাতে তৈরি, তখন সে সোজা চলে গেল সেই দপ্তরে। সেখানে নিশ্চয়ই কারিগরের নাম কোথাও লেখা আছে। বাস্তবিকই একটা রসিদ বেরুল — অমুক অমুক মাপের চারটি মালাকাইট পাটার জন্যে পেয়েছি দু'হাজার রুবল। নীচে সইয়ের বদলে বাঁকা ধরনের একটা চিহ্ন, কারণ ইয়েভলাখা লিখতে জানত না। তার তলায় এক কেরানীর সই আর জেলার শীলমোহর। বোঝাই যায় দালাল যথারীতি মেরেছে। ইয়েভলাখাকে দিয়েছিল আটশো, কেরানীকে এক কি দু'শো, আর বাকীটা নিজের পকেটে।

যে-লোক রানীর এ্যালবামের মলাট তৈরি করেছে তার পুরো নাম-ধাম জানতে চেয়ে টেলিগ্রাম গেল দালালের কাজে। দালাল নিশ্চয়ই ভাবল, তার জুচ্চুরি বুঝি ধরা পড়েছে, তাই উত্তর আর দেয় না। গেল আবার টেলিগ্রাম, আবার পাঠাল, কিন্তু তবুও জবাব নেই। কর্তা তাই নিজেই পাঠাল কড়া একটা চিঠি, বাস্তবিক ব্যাপারটা কী? বিদেশী অতিথির সামনে আমাকে অপদস্থ করছ, এত আস্পর্ধা? দালাল তখন উত্তর দিল — অমুক খনি, প্রত্যেকেই সেখানে তাকে চেনে, তার পুরো নাম মনে নেই কিন্তু লোকে তাকে ডাকে ইয়েভলাখা বলে।

চিঠি এসে পেঁছবার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী লোকটি তাড়াতাড়ি জিনিসপত্তর গুছিয়ে ট্রেন ধরল। শহরে সে একটা ত্রয়কা ভাড়া করে সেই খনিতে গেল, উঠল একটা সরাইখানায় আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করল কোথায় সেই মালাকাইট খোদাইকারী থাকে। তক্ষুনি জবাব মিলল — থাকে পেনকোভ্কা গলিতে, বড় মোড়টার ডান দিকে, পাঁচ কি নয় নম্বর ফটক।

পরের দিন লোকটা সেই মতোই গেল। সাজ-পোষাক, সে তো বুঝতেই পারছ, ফরাসী ছাঁট, — হলদে জুতো, গ্রীষ্মকালে পরার সবুজ দস্তানা, আর মাথায় বালতির মতো টুপি একেবারে শাদা, চারিধারে কালো সাটিনের ফিতে জড়ানো। আমাদের এলাকায় ওরকমটি কেউ কখনো দেখে নি। সব ছেলেরা অবিশ্যি দৌড়ে এল শাদা টুপিপরা সেই বাবু লোকটিকে দেখতে।

ফরাসী লোকটি গেল পেনকোভ্কায়। দেখে, রাস্তাটায় তেমন ভালো বাড়ী-টারি নেই। সন্দেহ হল, জিজ্ঞেস করল:

‘যে-লোকটা মালাকাইট খোদাই করে সে কোথায় থাকে?’

ছেলেরা তো এক পায়ে খাড়া, একসঙ্গে সবাই চিৎকার শুরু করে আঙুল দিয়ে দেখায় — ঐখানে, ঐ কুঁড়েটায়, ওখানেই ইয়েভলাখা দাদু থাকে।

ফরাসী লোকটি দেখে কেমন যেন অবাকই হল। তাহলেও গেল বাড়ীটায়। অলিন্দতে দেখল এক বুড়ো বসে। লোকটা লম্বা, মুখখানা রোগাটে, চেহারা যেন অসুস্থ। কোদালের মতো চওড়া শাদা দাড়িতে খানিকটা সবুজের আভাস। পরনে, সে তো বুঝতেই পারছ, আটপৌরে পোষাক — মোটা সুতোর প্যাণ্ট, পায়ে রবারের জুতো, কামিজের উপর পুরনো একটা ওয়েস্ট কোট, তাতে এ্যাসিডের ছোপ।

তখন সে পাইন গাছের বাকল থেকে একটা ছুরি দিয়ে কি যেন চেঁচে বার করছে, আর একটি ছোট ছেলে, তার নাতি হতে পারে, বলছিল:

‘মিত্যুঙ্কার চেয়েও আমায় একটা ভালো নৌকো বানিয়ে দাও, দাদু, কেমন?’

বুড়ো লোকটির সংসারের যে-কয়েকজন আঙিনায় ছিল — তারা আগন্তুককে দেখে শশব্যস্ত হয়ে উঠল। ইয়েভলাখা কিন্তু বসেই রইল, গা করল না। শহুরে খদ্দেরদের তোয়াজ করা তার স্বভাব নয়। তাদের বিশেষ আমল দিত না সে।

বিদেশী সেই কারিগর বেড়ার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখতে লাগল। তারপর অলিন্দর কাছে গিয়ে শাদা টুপি খুলে ফরাসী ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করল — মঁসিয়ে কারিগর ইয়েফ্লিয়াখ’এর সঙ্গে দেখা করা যায় কি, যিনি মালাকাইট দিয়ে জিনিস বানান।

কথা শুনেই ইয়েভলাখা বুঝতে পারল লোকটা বিদেশী। তাই ভালো মনেই জবাব দিল:

‘দরকার থাকলে দ্যাখো-না। আমিই সেই মালাকাইট কারিগর। আমাদের খনিতে এখন আমিই একলা। বুড়োরা সব মরে গেছে আর জোয়ানরা এখনো পাকা হয়ে ওঠে নি। শুধু আমার নাম কিন্তু ফ্লিয়াক নয়, স্রেফ ইয়েভলাম্পি পেত্রোভিচ, ঝেলেজ্‌কো নামে লোকে ডাকে। সেরেস্তায় উপাধি লেখা আছে মেদভেদেভ।’

ফরাসী লোকটি কিন্তু কথার অর্ধেক কিম্বা চারভাগের একভাগও বুঝল না। তবুও ক্রমাগত মাথা নাড়িয়ে চলল, সবুজ দস্তানা খুলে ইয়েভলাখার করমর্দন করল, বলতে চায় যেন — তার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় সে সুখী, তার সঠিক নাম না জানায়

ভদ্রতার যদি কোন কসুর হয়ে থাকে, তাহলে দয়া করে তাকে যেন মাপ করা হয়। নিজে কে তাও সে বোঝাতে চেষ্টা করল, বলল সেও একজন ওস্তাদ কারিগর, হীরে নিয়ে কাজ করে।

ইয়েভলাখা কিছু তারিফ করল।

বলল, 'তা ও পাথরকে দুয়ো দেবার তো কিছু নেই। সবচেয়ে বেশী দামী, খামকা তো নয়, চোখ জুড়োয়। প্রত্যেক পাথরেরই নিজস্ব গুণ আছে। আমাদের পাথর অনেক সস্তা বটে, কিন্তু বুকের মধ্যে বসন্ত ফোটায়, মানুষকে খুসি করে।'

ফরাসী লোকটি ক্রমাগত মাথা নাড়িয়ে নিজের ধরনের বুকনি ঝেড়ে চলল — আলাপ করতে পেরে সে খুসি, শুধু এই জন্যেই বিশেষ করে ফরাসী দেশ থেকে এসেছে। ইয়েভলাখা কিন্তু ঠাট্টা করল:

'ভালো মনে এসে থাকলে, আসুন-না, বরণ করব, আর যদি খারাপ মনে, তাহলে বেড়ার দরজা খোলাই আছে — বেরিয়ে যেতে অসুবিধা হবে না।'

ইয়েভলাখা লোকটাকে ভিতরে নিয়ে এল। তার বৌমাকে বলল সামোভার জ্বালাতে। টেবিলের উপর রাখল বোতল। মানে, ভালো করেই বরণ করল অতিথিকে। খানিক কথাবার্তা কইল, কিন্তু বিদেশী কারিগরটি কেবলি চাইতে লাগল ইয়েভলাখার কারখানাটা দেখতে। এতে বুড়োর খানিক সন্দেহ হল, কিন্তু তা প্রকাশ করল না।

বলল, 'কেন দেখবেন না। নকল টাকা তো বানাই না। আসুন, যত খুসি দেখুন।'

সব্জিবাগানের ভিতর দিয়ে ইয়েভলাখা আগন্তুককে নিয়ে গেল তার কারখানায়। বুঝতেই পারছ, সাধারণ একটা চালাঘর, খুব বড় নয়। দরজা চওড়া হলেও ভিতরে ঢুকতে হয় গুড়ি মেরে। তাতে কিন্তু ফরাসী লোকটির আটকাল না। সুন্দর শাদা টুপিটা যে নোংরা হয়ে যাবে তা নিয়েও তার মাথা ব্যথা নেই, ঢুকল সে গৃহস্বামীর আগে আগেই। ইয়েভলাখা খুব খুসি হল না।

'দেখ একবার কী রকম তাড়া! ও ভেবেছে বুঝি ওকে সব কথা বলব!'

কারখানার মধ্যে যেমন হয়, সাধারণ চৌকি, ঘষবার পাথর আর লোহার চুল্লি। জায়গাটা, বোঝোই তো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, তবে সবকিছুই রয়েছে গোছানো,

এখানে পাথর, ওখানে সবুজ আকরিক গুঁড়ো, পেটানো গাদ, গুঁড়ো কয়লা এই সব। ফরাসী লোকটি সবকিছু দেখে এটা-ওটা হাত দিয়ে পরখ করল, মনে হল, কী খুঁজছে, পাচ্ছে না। ইয়েভলাখা শুধু হাসতে লাগল:

'সিমেণ্ট নেই। ওটা আমার লাগে না।'

ফরাসী লোকটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হল না। ইয়েভলাখা তখন তার কাজের জায়গার কাছে গিয়ে একটা বাক্স টেনে বার করল, তা থেকে অন্তত শতখানেক মালাকাইটের চাবড়া ঢেলে ফেলল। বলল:

'দ্যাখো মশাই, ঐ ধুলো-কাদা থেকে কী বানাই।'

ফরাসী লোকটি চাবড়াগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে শুরু করল। সবই নানান রঙের, নানান নক্সার। কী করে এমন হল তা নিয়ে অবাক মানলে ফরাসী, কিন্তু ইয়েভলাখা আবার মুচকি হাসল:

আমার জানালা দিয়ে ঐ মাঠ দেখি। সেখান থেকে পাই রঙ আর নক্সা। রোদ উঠলে হয় এই রকম, আর বর্ষা পড়লে হয় আরেক রকম। বসন্তে এক রকমের, গ্রীষ্মে অন্য রকম, শরতে আবার ভিন্ন ধরনের, কিন্তু সব সময়েই কী তার রূপ। শেষ আর নেই।'

কী করে পাথরগুলো তৈরি করা হয়েছে, তা নিয়ে আগন্তুক তার কাছ থেকে কথাটা বার করতে চেষ্টা করল অনেক, কিন্তু ইয়েভলাখা ওভাবে ধরা দেবার পাত্র নয়। এমন সব কথা বলে এড়িয়ে গেল যা থেকে কিছুই জানা গেল না।

'মালমসলা নানা রকমের। কখনো একটা বেশী নিতে হয়, কখনো অন্যটা, কখনো পোড়াতে হয়, কখনো সেদ্ধ করতে হয় আর কখনো কখনো শুধু মেশালেই চলে।'

'কিন্তু কী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন?' ফরাসী লোকটি প্রশ্ন করল।

'যন্ত্রপাতি তো এই — হাতদুটো,' জবাব দিল ইয়েভলাখা।

বিদেশী লোকটি মাথা নাড়িয়ে এক মুখ হেসে ইয়েভলাখাকে তারিফ করতে শুরু করল:

'যাদু-করা হাত, মঁসিয়ে! যাদু-করা হাত!'

'না, কোনো যাদু এর মধ্যে নেই, আফসোসও করি না তা নিয়ে।'

ফরাসী লোকটি দেখল, চালাকিতেও হবে না, তোষামোদেও না; তাই সে পকেট

থেকে মহামতি পিটারের ছবিযুক্ত দুটো নোট বার করল, প্রত্যেকটিই এক হাজারের। সেগুলো চৌকিতে রেখে বলল:

'সত্যি করে সব খুলে বললে হাজার দেব; আর দেখিয়ে দিলে দেব দ্বিগুণ।'

পিটারের ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে ইয়েভলাখা বলল:

'রাজা ছিল ভালোই, তাঁর মতো কেউ হয় নি, তবে একটা জিনিস তিনি আমাদের শেখান নি — আমাদের আত্মাকে বিকিয়ে দেওয়াটা। টাকা গুটিয়ে নাও, মশাই, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও।'

ফরাসী লোকটি অবশ্য হেন-তেন বলল। সে কী? রাগ হল কিসে?

ঝেলেজ্‌কো তখন তার স্বরূপ দেখাল। বলে:

'ছিঃ, শাদা-টুপি কোথাকার, আবার নাকি কারিগর! ওই টুপি আর দস্তানার জন্যে যার কাছে খুসি বিকিয়ে দেবে নিজেকে। সোনার ফ্রেমে ময়লা ভরে মালাকাইট বলে বেচে দেবে পাঁচ রুবলে। কথাটা মাথায় ঢুকল? আমাদের আপন পাথর পৃথিবীর সেরা, তার বদলে ওই ওঁছা মাল! কখনোই সে চলবে না! এ পাথর আমাদেরই কাজে লাগবে। রানীর এ্যালবামের মলাটের মতো জিনিসের জন্যে নয়, এমন সুন্দর সুন্দর জিনিস করব, যা দেখার জন্যে সারা দুনিয়ার লোক আসবে। সে হবে আমাদের কাজ! এই হাত দিয়ে গড়া!'

ঝেলেজ্‌কোর কাছ থেকে বিদেশী কারিগর কিছুই বার করতে পারল না। ফিরে গেল। কিন্তু ফাবের্‌ঝেইয়ের কাছ থেকে মলাটগুলো সে নিয়ে গেল। নিজের মুরুব্বী মারফত রাজাকে তোষামোদ করে ওটা সে উপহার হিসেবে আদায় করল।

ঝেলেজ্‌কো মারা যায় গৃহযুদ্ধের সময়। তখনো কিছু লোকের সন্দেহ ছিল, কে জানে কী হবে। ঝেলেজ্‌কো কিন্তু কেবলি বলত:

'ভাবনা নেই, মজুরের হাত সব পারে। কোনোটা গুঁড়ো করবে, কোনোটা দানা বানাবে, কোনোটায় পালিশ। ব্যস, গোটা একটা পাথর হবে ভারি আনন্দের। অবাক হবে সারা দুনিয়া। একটু শিক্ষাও পাবে।'

গোমস্তার জুতোর তলা

লেভায়ায় ছিল সেভেরিয়ান কন্দ্রাতিচ নামে এক গোমস্তা। উঃ, কী পাষণ্ড, কী পাষণ্ড! খনি হবার পর থেকে তার মতো কাউকে দেখা যায় নি। কুত্তার অধম। বুনো জানোয়ার।

কাজ সে যৎসামান্যই জানত, কিন্তু লোককে মারার বেলা ছিল দারুণ পটু। এসেছিল সে অভিজাত শ্রেণী থেকে, তার নিজের ছিল জমিদারী, কিন্তু সেগুলো খুইয়েছিল। তার প্রধান কারণ তার নিষ্ঠুর স্বভাব। বহু লোক সে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলে। তাদের মধ্যে কয়েকজন আবার অন্য জমিদারীর। তাই কথাটা জানাজানি হয়ে পড়ে, চাপতে পারা গেল না। বিচার হয়। জজ রায় দেয় — হয় সাইবেরিয়া, নয়তো আমাদের এখানকার খনি। আমাদের মালিকদের, তুর্চানিনভদের কাছে ঠিক ওধরনের খুনেই দরকার। সঙ্গে সঙ্গে তারা তাকে পাঠাল পোলেভায়ায়।

'দয়া করে ওখানকার লোকদের একটু দমিয়ে দিস। যদি কাউকে মেরেও ফেলিস, আদালতে কেউ দেবে না। শুধু লোকগুলোর মাথা খানিকটা ঠাণ্ডা হলে বাঁচি। নইলে দেখ-না। কী সব শুরু করেছে।'

এর আগে পোলেভায়ার লোকেরা আগের বুড়ো গোমস্তাকে টকটকে গরম লোহার উপর বসিয়ে রাখে, তাতে একঘণ্টার মধ্যেই মারা যায় সে। অবশ্যই তার জন্যে প্রচুর লোককে চাবকানো হয়েছিল, কিন্তু দোষীদের ধরা যায় নি।

'কেউ তাকে ওখানে বসায় নি। নিজেই বসেছিল। হয় ধোঁয়ায় মাথা ঘুরে যায় বা বেহুঁশ হয়ে পড়ে, ঠিক জানত না কী করছে। যত তাড়াতাড়ি পারি আমরা তাকে তুলে নিই, কিন্তু সমস্ত পাছা একেবারে ভিতর পর্যন্ত পুড়ে যায়। বোঝা যায় ভগবানের সেই ইচ্ছে ছিল, মরণ আসবে পিছন দিক থেকে।'

তারপর থেকে কর্তারা একটি খেঁকুরে ভাণ্ডা খুঁজছিল লোকরা যাতে ভয় পায়।

তাই খুনে-সেভেরিয়ান হল আমাদের গোমস্তা। সাহসী ছিল বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও জানত, খনি তো গ্রাম নয় — একটু সাবধান হওয়া দরকার। জানো তো, লোকে সবসময় জটলা পাকিয়ে আছে, ঘেঁষাঘেঁষি জায়গা, তার ওপর আগুন। প্রত্যেক লোকের হাতেই কোনো না কোনো হাতিয়ার। সাঁড়াশী দিয়ে মাথা ফাটাতে পারে, হাতুড়ি পারে দোলাতে, বিদে কিম্বা কাঠের গুঁড়ি পড়তে পারে মাথায়। খুবই সহজ ব্যাপার। ওলনা কি চুল্লিতে মাথা গুঁজে দিলেই হ'ল। বলবে ধোঁয়ায় লোকটার মাথা ঘুরে যায়, খুব কাছে যেতে গিয়ে পড়ে গেছে। ঐ গোমস্তাটাকে তো তারা পুড়িয়েই মারে।

সেভেরিয়ান তাই দেহ-রক্ষী নিযুক্ত করল। কোথা থেকে যে তাদের জোটাল! প্রত্যেকেই তারা ষণ্ডামার্ক, বেপরোয়া। একেবারে জঘন্য আবর্জনা। ভবঘুরে চোর-ছেঁচড়। এই দলটা নিয়ে খনিতে ঘুরত সে। নিজে যেত সামনে সামনে। তার হাতে থাকত দু'আঙুল চওড়া একটা চাবুক, ডগাটা বাঁকা। পকেটে থাকত গুলিভরা চার নলের পিস্তল — সেটা শুধু টেনে বার করলেই হল। পিছন পিছন সেই দলটা। কারুর হাতে লাঠি, কারুর তরোয়াল, কারুর কারুর আবার পিস্তল। ঠিক যেন কোথাও লড়াই করতে চলেছে।

গিয়ে প্রথমেই সে সর্দারকে জিজ্ঞেস করত:

'কে খারাপ কাজ করছে?'

সর্দার জানত সবাইকেই যদি ভালো বলে তাহলে নিজেকেই চাবুক খেতে হবে — লাই দিচ্ছে, তাই সে ভুল ধরতে শুরু করত। এর-ওর নাম করত, হয়তো বাস্তবিকই কোনো দোষের জন্যে, কখনো ক্ষেপে গিয়ে কোনোটা মিছিমিছিই। চাবুকটা তার নিজের পিঠে না পড়ে অন্যদের উপর পড়লেই হল। এর-ওর নামে লাগাত আর গোমস্তা রেগে লম্ফঝম্ফ শুরু করে দিত। নিজেই চাবুক হাঁকাত, জানো তো। লোকদের উপর অত্যাচার করাই ছিল অন্ন-জলের মতো। ওই তার স্বভাব। মানে, খুনে।

তা সত্ত্বেও তামা পাহাড়ের খনির নীচে প্রথমে সে যেত না। খনির নীচে নামা

যাদের অভ্যেস নেই তাদের কাছে সেটা এক ভয়াবহ জায়গা। প্রথমত অন্ধকার, আলো বাড়ানো যায় না। কর্তা নিজে নীচে নামলে তিনিও পাবেন ঐ একই মিটমিটে বাতি। বোঝাই যায় না সেটা সত্যি সত্যি জ্বলছে নাকি ওরকম দেখাচ্ছে। তারপর জায়গাটা ভিজেও বটে। যেসব লোক মাটির নীচে সেখানে কাজ করে, তারাও বেপরোয়া। বাঁচা মরা তাদের কাছে একই ব্যাপার। মরীয়া লোকদের জন্যেই কর্তাদের সবচেয়ে দুশ্চিন্তা। তাছাড়া সেভেরিয়ান শুনেছিল তামা পাহাড়ে এক ঠাকরুন আছে। সে মাটির তলার লোকের উপর দুর্ব্যবহার করা পছন্দ করে না। সেভেরিয়ান তাই সামান্য ভয় পায়। কিন্তু শেষে সাহস পেল। দলবল নিয়ে নামল নীচে। তারপর থেকে ব্যাপারটা চালু হয়ে গেল। যেন দ্বিগুণ হিংস্র হয়ে উঠল সে। এর আগে খনি-শ্রমিকদের চাবুক মারা হত খনি থেকে উপরে উঠে আসার পর। কিন্তু এখন সে নতুন এক রেওয়াজ চালু করল। একটা চাবুক কিম্বা যেকোনো জিনিস হাতের কাছে পেত তাই নিয়ে সে মারত খনির ভিতরেই। রোজ নামত নীচে আর রোজ ঐ একই ব্যাপার: কত বেশি লোকের উপর অত্যাচার করা যায়। যেদিন বহুলোককে মারতে পারল সেদিন তার আহ্লাদ আর ধরত না। মোচে তা দিয়ে ঠিকেদারের উদ্দেশ্যে হুঙ্কার ছাড়ত:

'বুড়ো ছুঁচো, ওপরে ওঠানোর ব্যবস্থা কর। কিছু হাত চালানো গেল, এখন খাবার সময় হয়েছে।'

এইভাবে এক সপ্তাহ ধরে খনির মধ্যে সে অত্যাচার চালাল। তারপর ঘটল একটা ব্যাপার। ঠিকেদারকে সবে সে বলেছে ওপরে ওঠাবার ব্যবস্থা করতে। এমন সময় হঠাৎ শোনে ভারি পরিষ্কার আর গমগমে একটা গলা, যেন একেবারে কাছে:

'সাবধান, সেভেরিয়ান, দেখো যেন তোমার ছেলেপিলেদের জন্যে স্মৃতি-চিহ্ন হিসেবে না থেকে যায় তোমার জুতোর তলা!'

গোমস্তা লাফিয়ে উঠল।

'কে বলল?' স্বরটা যেদিক থেকে আসছিল সেদিকে ফিরতে গিয়েই এমনভাবে পড়ে গেল যে একটু হলেই পাদুটো যেত ভেঙে। পাদুটো যেন মাটিতে পোঁতা। বহু কষ্টে সে পা টেনে তুলল। স্বরটা কোনো মেয়ের। এতে গোমস্তার খানিক দুশ্চিন্তা হল, কিন্তু তা প্রকাশ করল না। যেন কিছুই শোনে নি। ঠ্যাঙারে দলটাও

চুপচাপ রইল, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল ভয় পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই তারা টের পেল, — এ সেই ঠাকরুনের শাসানি।

যাই হোক, খনির নীচে নামা সে থামাল। খানিক হাঁপছেড়ে বাঁচল খনির লোকেরা। তবে বেশী দিনের জন্যে নয়। মানে, ব্যাপারটা কী জানো তো, লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল সেভেরিয়ানের। মজুররা হয়তো সেই স্বরটা শুনেছে, এখন টিটকারি দিচ্ছে তাকে, বলছে, ভড়কে গেছে। এটা তার কাছে ছুরি খাওয়ার চেয়েও খারাপ, কেননা কেবলি বড়াই করত তো, কাউকেই ভয় পায় না। একদিন সে কারখানায় গেছে, কে যেন চেঁচিয়ে উঠল:

'জুতোর তলা সামলাও!' — এটা ওদের একটা বুলি, কেউ অসাবধানে হাঁ হয়ে থাকলে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিত। গোমস্তা কিন্তু ভাবল:

'আমাকে ওরা ঠাট্টা করছে।' ভারি খোঁচা লাগল কথাটায়। কে বলেছে খুঁজে বার করার চেষ্টাও করল না। এমন কি সেদিন কাউকে মারলও না পর্যন্ত। কারখানার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার দলবলকে বলল:

'অনেক দিন খনির নীচে নামি নি। সেখানকার সব কিছু ঠিকঠাক করা দরকার।'

নীচে নামল সবাই। রাগে পাগল হয়ে উঠেছিল গোমস্তা, আগে কখনো সেরকম হয় নি। যেতে যেতে যাকেই পায় তাকেই মারে। দেখাতে চায় তো, কাউকে সে ভয় পায় না। হঠাৎ আবার সেই স্বর:

'দ্বিতীয় বার তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, সেভেরিয়ান। তোমার ছেলেদের কথা একটু ভেবো। তাদের জন্যে রেখে যাবে শুধু তোমার জুতোর তলা।'

গোমস্তা ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে ঠিক আগের বারের মতোই গেল পড়ে। কিছুতেই পাদুটো মাটি থেকে তুলতে পারল না। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল পাদুটো পাথরের মধ্যে ইঞ্চিখানেক করে দেবে গেছে, গাঁতি মেরেও যেন আলগা করা যাবে না।

যাই হোক, কোনোরকমে পাদুটো বার করতে পারল সে। তার উঁচু বুট জোড়ার ডগাটা গেল হাঁ হয়ে, আর তলা রয়ে গেল ওখানেই।

খানিক নরম হল গোমস্তা। কিন্তু ওপরে আসার পর আবার সাহস ফিরে পেল। নিজের লোকদের জিজ্ঞেস করল:

‘কিছু শুনেছ তোমরা? খনির নীচে?’

তারা বলল:

‘হ্যাঁ, শুনেছি।’

‘দেখেছিলে কীভাবে আমার পাদুটো আটকে যায়?’

‘হ্যাঁ, তা-ও দেখেছি।’

‘তোমাদের কী মনে হয় — এর মানে কী?’

তারা আমতা-আমতা করতে লাগল, বুঝতেই পারছ। তারপর তাদের একজন কথাটা সরাসরি বলে ফেলল:

‘তামা পাহাড়ের ঠাকরুন তোমায় ইশারা করছে — তাছাড়া কিছু নয়। ভয় দেখাচ্ছে যেন, কিন্তু কী নিয়ে জানি না।’

সেভেরিয়ান বলল, ‘বেশ, তাহলে শোনো যা বলছি। কাল আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে নীচে যাবার জন্যে তৈরি থেকো। দেখাব ওদের, আমাকে কিনা ভয় দেখাতে চায়, খনির মধ্যে ছুঁড়িকে লুকিয়ে রাখে। সবকটা সুড়ঙ্গে হানা দিয়ে মেয়েটাকে ধরব, তারপর এই চাবুকের পাঁচটি ঘায়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া করব। বুঝেছ?’

বাড়ী ফেরার পর সে তার বউয়ের কাছেও বড়াই করতে শুরু করল। মেয়ে তো, শুরু করল কাঁদতে:

‘ওরে বাবা! নিজেকে বাঁচাও গো, সেভেরিয়ান! অন্তত পাদ্রীকে ডেকে পাঠান যাক, তোমাকে রক্ষা-কবচ দিক।’

সত্যিই পাদ্রী ডাকা হল। সে গান গাইল, প্রার্থনা করল, সেভেরিয়ানের গলায় ঝুলিয়ে দিল একটা পবিত্র মাদুলি। আর তার পিস্তলেও দিল পবিত্র জল ছিটিয়ে। বলল, ‘ভাবনা নেই, সেভেরিয়ান কন্দ্রাতিচ, যদি কোনোকিছু ঘটে তাহলে প্রার্থনা করো: হে, ঈশ্বর, পুনরুদিত হোন।’

পরের দিন খুব ভোরেই গোমস্তার গুণ্ডারা খনির মুখে হাজির। তাদের সবাইকার মুখ শুকিয়ে গেছে, একমাত্র গোমস্তাই শুধু হাঁটছে মোরগের মতো বুক চিতিয়ে, কাঁধ টান করে। আয়নার মতো চকচক করছে নতুন উঁচু বুটজোড়া। সেই বুটের উপর ক্রমাগত সে ছপ্‌টি মারছে।

বলল, 'আবার যদি জুতোর তলা ছিঁড়ে যায়, তাহলে ময়লা জমিয়ে রাখার জন্যে ঠিকেদারকে আমি দেখাব। কুড়ি বছর ধরে সে কাজ করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ছাল ছাড়িয়ে নেব। আর তোমাদের প্রথম কাজ সেই ছুঁড়িটাকে খোঁজা। যে তাকে ধরবে, পাবে পঞ্চাশ রুবল বখশিস।'

নীচে নেমে সবকিছু তোলপাড় করতে লাগল তারা। বরাবরের মতো গোমস্তা সামনে, পিছনে তার দলবল। কিন্তু সুড়ঙ্গগুলো সরু বলে একজনের পিছনে একজন করে যেতে হচ্ছিল। হঠাৎ গোমস্তা তার সামনে এক মূর্তি দেখতে পেল, চলেছে সে হালকা পায়ে বাতি দুলিয়ে। মোড় নেবার সময় দেখা গেল মেয়ে। হাঁক দিল গোমস্তা, দাঁড়াও! কিন্তু মেয়েটা যেন তার কথা শুনতেই পায় নি। মেয়েটির পিছন পিছন দৌড়াতে শুরু করল গোমস্তা। কিন্তু তার বিশ্বাসী লোকেদের বিশেষ তাড়া ছিল না। কাঁপুনি ধরেছে সবার, কেননা দেখছে যে ব্যাপারটা সুবিধার নয়: ও স্বয়ং ঠাকরুন। কিন্তু ফিরে যেতেও তাদের সাহস হল না। সেভেরিয়ান তাদের চাবুক হাঁকিয়ে মেরেই ফেলবে। ক্রমাগত দৌড়ে চলল গোমস্তা, কিন্তু মেয়েটিকে ধরতে পারে না। হুঙ্কার ছাড়ে সে, কত রকম ভয়ও দেখায়, কিন্তু একবার ফিরেও তাকাল না মেয়েটি। সুড়ঙ্গটায় জনপ্রাণীও নেই।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে আলো হয়ে গেল। গোমস্তা দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে অপরূপ রূপসী একটি মেয়ে। ভুরু কোঁচকানো, চোখ জ্বলছে জ্বলন্ত কয়লার মতো।

বলল, 'কী খুনে, এসো এবার হিসেব-নিকেশ করা যাক। তোমাকে সাবধান করে বলেছিলাম, থামাও, কিন্তু তুমি কী করেছিলে? বড়াই করেছিলে যে আমায় পাঁচ ঘা চাবুক কষবে! এবার?'

সেভেরিয়ান কিন্তু হুঙ্কার ছাড়ল:

'তার চেয়েও খারাপ কাজ করব! ওরে ভান্‌কা, ইয়েফিম্‌কা, ঐ ছুঁড়িকে ধর, টেনে নিয়ে চল ঐ বাচাল ছুঁড়িটাকে!'

মানে, তার লোকজনদের ডাকল আর কি। ভেবেছিল তারা বুঝি কাছেই, নিজে ওদিকে টের পাচ্ছে তার পাদুটো আবার দেবে যাচ্ছে।

রাগে উন্মত্ত হয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল:

'এই, এদিকে আয়!'

মেয়েটি বলল, 'চিৎকার করে লাভ নেই। তোমার লোকজনদের আসার পথ বন্ধ। এখনি তাদের অনেকেই বেঁচেও থাকবে না।'

সামান্য হাত নাড়াল মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে পিছনে ধস নামল আর গর্জন করে ছুটল বাতাস। গোমস্তা পিছনে চেয়ে দেখল নিরেট একটা দেয়াল, সেখানে যেন কোনো কালে কোনো সুড়ঙ্গ ছিল না।

'এবার কী বলবে?' ঠাকরুন আবার প্রশ্ন করল।

কিন্তু গোমস্তা তখন দারুণ রেগে উঠেছে। পাদ্রী তাকে ভরসা দিয়েছে। তাই সে পিস্তলটা বার করল:

'এই বলছি!' আর গুড়ুম! সোজা ঠাকরুনের দিকে... ঠাকরুন কিন্তু গুলিটা লুফে নিয়ে গোমস্তার হাঁটুর ওপর ছুঁড়ে শান্ত গলায় বলল:

'ওই জায়গাটা পর্যন্ত ও আর নেই।' যেন আদেশ দিল। পরমুহূর্তেই গোমস্তা হাঁটু পর্যন্ত সবুজ পাথরে দেবে গেল। তখন অবশ্য সে হাউমাউ করতে শুরু করল:

'করুণাময়ী মাগো, ক্ষমা করো! নাতিপুতিকে বলে যাব তোমাকে পুজো করতে। এখান থেকে চলে যাব। অনুতাপ করব পাপের জন্যে!'

হাউমাউ করে সে আর্তনাদ করে চলল। গাল বেয়ে ঝরঝর করে ঝরতে লাগল চোখের জল। ঠাকরুনের এত বিতৃষ্ণা ধরে গেল যে সে থুথু ফেলল।

'ছি ছি, নচ্ছার, একেবারে ফাঁপা! মরতেও পারো না। তোমার দিকে তাকালেই বমি উঠে আসে।'

হাত নাড়াল ঠাকরুন, আর পাথরটা উঠে গেল সোজা গোমস্তার মাথা ছাড়িয়ে। তার জায়গায় শুধু দাঁড়িয়ে রইল একটা বিরাট সবুজ পাথরের স্তম্ভ। ঠাকরুন কাছে এসে সেটায় সামান্য ঠেলা দিতেই তা পড়ল উল্টে। ঠাকরুনও গেল মিলিয়ে।

খনির মধ্যে ওদিকে দারুণ হৈচৈ। পুরো একটা সুড়ঙ্গই ধসে পড়েছে। সেইখানেই তো গোমস্তা গিয়েছিল তার দলবল নিয়ে। চাট্টিখানি নয়। সব লোকজনদের নীচে পাঠান হল। ধসটা খোঁড়া শুরু হল। উপরেও প্রচুর হৈচৈ। সিসের্ত-এ কর্তার কাছে খবর পাঠান হল। পরের দিন শহর থেকে এল খনি দপ্তরের ওপরওয়ালারা। চার দিন পরে খুঁড়ে বার করা হল দেহ-রক্ষীদের। আর

অদ্ভুত ব্যাপার! যে-লোকগুলো ছিল সবচেয়ে খারাপ তারা সব মারা পড়েছে, কিন্তু যাদের মধ্যে ছিটেফোঁটা বিবেকও ছিল, তারা আহত হয়েছে মাত্র।

সবাইকেই পাওয়া গেল, কিন্তু গোমস্তা নেই। তারপর খুঁড়তে খুঁড়তে পেঁছল এমন একটা জায়গায়, আগে যেটা কেউ কখনো দেখে নি। মাঝখানে দেখা গেল বিরাট এক চাঙ্গড় মালাকাইট পড়ে রয়েছে আড়াআড়ি। ভালো করে নজর করতে দেখা গেল: তার একটা দিক পালিশ করা।

ভাবল: 'এটা আবার কী আজব কাণ্ড। কে এখানে আসবে মালাকাইট পালিশ করতে?' তখন আরো ভালো করে দেখতে লাগল সবাই। পালিশ করা জায়গাটার ঠিক মাঝখানে বুটজুতোর দুটো তলা। একেবারে নতুন, পেরেক দেখা যায়। তিন সারিতে বসানো। কর্তাকে জানানো হল। কর্তা তখন বুড়ো, খনিতে অনেক দিন নামে নি, অথচ জিনিসটা দেখার শখ। তাই হুকুম দিল মালাকাইটটা যেমন ছিল সেই অবস্থায় বার করতে। সেটাকে নিয়ে কী মুশকিলেই না পড়তে হয়! তাহলেও শেষটায় তারা সেটা ওপরে তোলে। বুড়ো কর্তা সেই বুটের তলা দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল:

'ও কী বিশ্বাসী কর্মচারীই না ছিল!' তারপর বলল, 'দেহটা পাথর থেকে ছাড়িয়ে সম্মানের সঙ্গে কবর দিতে হবে।'

সবচেয়ে ভালো পাথর-কাটিয়ের জন্যে গ্রামোর-এ লোক পাঠানো হল। তখন সেখানে কস্তোসভের খুব নাম। নিয়ে আসা হল তাকে। কর্তা প্রশ্ন করল:

'দেহটা নষ্ট না করে পাথরের ভিতর থেকে বার করতে পারবে?'

পাথর-কাটিয়ে সেটা পরীক্ষা করল।

বলল, 'আর পাথরের টুকরোগুলো কে পাবে?'

কর্তা বলল, 'তুমি নিতে পারো। কাজের জন্যে টাকাও দেব, যত খরচ হয় হোক।'

কস্তোসভ বলল, 'তা চেষ্টা করে দেখতে পারি। বড়ো কথা, মালটা খুবই ভালো। এমন সাধারণত দেখা যায় না। শুধু একটা মুশকিল, আমাদের কাজে সময় লাগে। সঙ্গে সঙ্গে দেহটা পর্যন্ত কাটলে সেটা থেকে দুর্গন্ধ বেরুবে। প্রথমে ওপরের অংশ ছাড়াব, কিন্তু তাতে মালাকাইট নষ্ট হবে।'

সে কথা শুনে কর্তা রেগে ক্ষেপে উঠল।

বলল, 'মালাকাইটের কথা তোমায় ভাবতে হবে না, কী করে আমার বিশ্বাসী কর্মচারীর দেহ নষ্ট না করে বার করা যায় সেটাই ভাবো।'

কস্তোসভ বলল, 'সে যে যেমন বোঝে।'

কী জানো, ও ছিল স্বাধীন, কথার ঢঙ ওর ওই রকম। দেহ বার করতে শুরু করল সে। প্রথমে ওপরের অংশ ছাড়িয়ে মালাকাইটটা বাড়ীতে নিয়ে গেল। তারপর শুরু করল পাথর কেটে দেহ পর্যন্ত পৌঁছতে। আর কী হল, জানো? একসময় যেখানে ছিল শরীর আর জামাকাপড় সেখানে শুধুই বাজে পাথর, অথচ চারপাশ ঘিরে প্রথম শ্রেণীর মালাকাইট।

তা সত্ত্বেও কর্তা সেই বাজে জিনিসটাকেই মানুষের মতো কবর দেবার হুকুম দিল। কস্তোসভ কিন্তু আক্ষেপ করল।

বলল, 'জানলেই সঙ্গে সঙ্গে চাঙড়টা চিরে ফেলতাম। কত ভালো জিনিস নষ্ট হল গোমস্তার জন্যে। অথচ দেখ, তার বাকি আর রইল কী! শুধু জুতোর তলা।'

সোচেনের জহরত
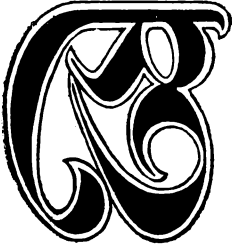
পান — সেই যে লোকটি মালাকাইটের স্তম্ভগুলো পায় — সে মারা যাবার পর ক্রাস্নগোরকায় লোক এল অনেক। স্তেপানের মরা হাতের মুঠোয় যেধরনের পাথর ছিল সেরকম পাথর তারা খুঁজতে শুরু করল। কিন্তু তখন শরৎকাল, তুষার পাতের ঠিক আগের সময়। বিশেষ কিছু তখন করা যায় না। কিন্তু তুষার গলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে তারা ফিরে এল। এখানে আঁচড়াল, ওখানে খুঁড়ল। পেল লোহার আকরিক। দেখল লাভ নেই, চলে গেল। লেগে রইল শুধু ভান্‌কা সোচেন। অন্য লোকেরা ফসলকাটার তোড়জোর করছে, আর ও কেবল খনিতে খনিতে কুড়িয়ে বাড়িয়ে বেড়ায়। মণি-রত্ন খুঁজে বার করার বিদ্যে তার বিশেষ ছিল না, কিন্তু জুটে পড়েছিল। অল্প বয়েসে সে ছিল কর্তার চাকর, গাফিলতির জন্যে চাকরি যায়। কিন্তু পা-চাটার ঐ দোষটা তার লেগেই রইল। কেবলি সে নিজেকে জাহির করতে চায়। মানে, নেকনজরে পড়বে। কিন্তু কী বা সে পারে? লেখাপড়া যৎসামান্যই, কেরানী হবার মতো নয়। চুল্লির কাজ তাকে দিয়ে হবে না, আর খনির কাজে একসপ্তাহও টিকবে না। তাই সে সোনার খনিতে গেল। ভেবেছিল সেখানে লোকে বুঝি মধু খেয়ে দিন কাটায়। চেখে দেখল নুনে পোড়া। কিন্তু তখন সে তার নিজের মনের মতো একটা কাজ জোটাল। হল টিকটিকি, সোনা-খুঁজিয়েদের মধ্যে দপ্তরের দালাল। কিন্তু সোনা-খুঁজিয়ের ভেক সে ছাড়ল না। তখনো সে বালি ধোয়, কিন্তু তার একমাত্র চিন্তা কী করে কিছু ফাঁস করে, দপ্তরে জানায়। দপ্তরের লোকরাও দেখল তাদের লাভ। তাই তারা তাকে উৎসাহ দিত, দিত কাজ করবার ভালো জায়গা, টাকা, জামাকাপড়, জুতো। যারা সোনা খুঁজত, তারাও হিসেব-নিকেশ চুকোত তার সঙ্গে — কখনো কীল পড়ত কানে, কখনো মাথায়, কখনো সর্বাঙ্গে। যেমন ব্যাপার আর কি। তবে মার খাওয়া সোচেনের অভ্যেস —

বাবুদের চাকর ছিল তো। খানিক শয্যা নিয়ে সেরে উঠত, তারপর আবার যে-কে-সেই। এইভাবে দিন কাটতে লাগল। বৌটিও হল তারই জুড়ি। মানে, ছেনাল কি খানকী নয় — তবে ঐ একরকম — লোকে তার নাম দিয়েছিল পরখাগী, পরের ঘাড় ভেঙে দিন কাটাতে চাইত। ছেলেপিলে তাদের অবিশ্যি ছিল না — কী হবে ছেলেপিলে দিয়ে?

তাই স্তেপানের পাথরগুলোর কথা যখন ছড়িয়ে পড়ল, দলে দলে লোকে যখন আসতে শুরু করল ক্রাস্নগোরকায়, সোচেনও এল সেখানে।

ভাবল: 'ভাগ্য পরীক্ষা করব। স্তেপানের চেয়ে আমি খারাপ কিসে। হাতের মুঠোয় দৌলত গুঁড়ো করে ফেলার মতো বোকামি নিশ্চয় করব না।'

যারা খুঁজতে এসেছিল, তারা জানে কোথায় কী মেলে। ক্রাস্নগোরকায় তারা খানিক খোঁড়াখুঁড়ি করে দেখল জমিটা ঠিক সে জাতের নয়, তাই ছেড়ে দিল। কিন্তু সোচেন ভাবল সে ভালো জানে, তাই থেকে গেল।

বলল, 'দৌলত না পেলে আমি আমি নই!' নিজের সম্বন্ধে তার ছিল খুব উঁচু ধারণা!

একদিন সে খনির একটা জায়গায় খুঁড়েছে। খামকাই খোঁড়াখুঁড়ি করল। এমন সময় হঠাৎ একটা চাঙড় ভেঙে পড়ল। ধরো, বিশ মন কি আরো বেশী। একটু হলেই তার পা থেঁতো হয়ে যেত। লাফিয়ে সে পিছনে সরল, তারপর যে-গর্তটা থেকে পড়েছে তার ভিতরে তাকাল। দেখে, একেবারে তার সামনে দুটি সবুজ পাথর। আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠল সোচেন, ভাবল মণির স্তর পেয়ে গেছে। সেগুলো তুলে নেবার জন্যে হাত বাড়াতেই সেখান থেকে শোনা গেল একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ — ভয়ে ভান্‌কা প্রায় অজ্ঞান। দেখে, জায়গাটা থেকে লাফিয়ে বেরল একটি বিড়াল। সর্বাঙ্গ তার বাদামী রঙের, কোনো রকম ছোপ নেই। শুধু চোখ তার সবুজ আর দাঁত জ্বলজ্বলে। রোঁয়া তার খাড়া হয়ে উঠেছে, পিঠ উঠেছে কুঁজো হয়ে, ল্যাজ খাড়া, এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভান্‌কা দৌড়ল প্রাণপণে। পিছনে না তাকিয়ে প্রাণপণে ছুটল ধরো প্রায় এক ক্রোশ, দম ফুরিয়ে প্রায় মরে। তারপর খানিকটা শান্ত হয়ে চলতে লাগল। বাড়ী ফিরে বৌকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে উঠল:

'তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরটা গরম করো! ভারি একটা বিছছিরি কাণ্ড ঘটেছে।'

স্নান সেরে, — হাঁদা তো, অমনি সমস্ত কথা বলল বৌকে। সেও তক্ষুনি পরামর্শ দিল:

'তুমি বরং চাকা-বুড়ির কাছে যাও, ভান্‌কা। তোয়াজ করো। সে তোমায় ঠিক পথ দেখাবে।'

লোকে বলে অমনি এক বুড়ি ছিল বটে। যেসব মেয়েদের প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসত তাদের জন্যে সে ব্যবস্থা করত বাষ্প-স্নানের, কুমারীদের পাপও চাপা দিত। আর কী জানো, পাদুটো তার ছিল ভারি বাঁকা। দেহটা মনে হত যেন চাকার ওপর বসান। সেইজন্যেই লোকে তাকে ডাকত 'চাকা-বুড়ি' বলে।

ভান্‌কা প্রথমে এর মধ্যে মাথা গলাতে চাইল না:

'কোথাও যাব না, সোনার লোভ দেখালেও ঐ খনিতে আর যাচ্ছি না। বাপরে, কী ভয়ঙ্কর! জীবনেও নয়।' এমন কি তার যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে আসতে লোকই পাঠাবে ভেবেছিল। ভয় পেয়ে গিয়েছিল আর কি। কিন্তু তারপর, দু'দিন, তিন দিন কাটার পর সামলে উঠল। আর বৌ ওদিকে ক্রমাগতই ঘ্যানঘ্যান করে চলে:

'চাকা-বুড়ির কাছে যাও-না! ডাইনী সে। বলে দেবে কী করে পাথরগুলো পাওয়া যায়।' এরও, এই সোচেনের বৌটারও দৌলতের উপর দারুণ লোভ।

গেল ভান্‌কা চাকা-বুড়ির কাছে। কথাটা তাকে বলতে শুরু করল, কিন্তু মাটির তলার দৌলতের কথা বুড়ি কীই বা বোঝে? সে শুধু বসে বিড়বিড় করতে লাগল:

'দির্‌-গির্‌-বির্‌। সাপ ভয় করে বিড়াল, বিড়াল ভয় করে কুকুর, কুকুর ভয় করে নেকড়ে, নেকড়ে ভয় করে ভালুক, দির্‌-গির্‌-বির্‌! দূর হ! চলে যা!' মানে, ডাইনীদের যতসব বাজে তুকতাক আর কি। ভান্‌কা কিন্তু ভাবে: 'ইস, কী জ্ঞানী বুড়ি!'

সমস্ত ঘটনাটার কথা তাকে সে বলল, আর বুড়ি প্রশ্ন করল:

'কুকুরের চামড়ার কোট আছে তোমার, বাছা?'

বলল, 'আছে, তবে খারাপ। ভারি ছেঁড়া-খোঁড়া।'

বুড়ি বলল, 'তাতে কিছু যায় আসে না। কুকুরের গন্ধ থাকলেই হল।'

সোচেন বলল, 'গন্ধ আছে, খুবই আছে, নেওয়া হয় উপোসী কুকুরের চামড়া থেকে।'

'তাহলে তাতেই চলবে। সেই কোট পরো। পাথরগুলো বাড়ীতে না আনা পর্যন্ত খুলো না। এখনো ভয় করলে তোমার গলায় ঝোলাবার জন্যে দেব একটা নেকড়ের ল্যাজ। কিম্বা কামিজের ভিতরে সেলাই করে দেব ভালুকের চর্বি। তার জন্যে কিন্তু তোমাকে চড়া দাম দিতে হবে।'

বুড়ির সঙ্গে দরদস্তুর করে সোচেন বাড়ী গেল টাকা আনতে।

'এই নাও, দিদিমা, এবার সেই ল্যাজ আর চর্বি দাও।' বুড়ি তো খুসি হয়ে উঠল — ভগবান তার কাছে কী বোকাকেই না পাঠিয়েছেন!

গলায় সেই ল্যাজটা সোচেন ঝুলিয়ে দিল। তার বৌ দিক কামিজের কলারের সঙ্গে চর্বিটা সেলাই করে। তারপর কুকুরের চামড়ার কোট পরে সে রওনা দিল ক্রাস্নগোরকার উদ্দেশে। যে দেখে সেই অবাক হয় — এই গরমে কিনা কুকুরের চামড়ার কোট পরেছে। কিন্তু সোচেন খানিক হি-হি করে যেন জ্বরে কাঁপছে, যদিও গা দিয়ে ঘাম ঝরছে দরদর করে।

খনিটায় সে পেঁছিল। যেখানটিতে তার যন্ত্রপাতি ফেলে গিয়েছিল, দেখল ঠিক সেইখানেই পড়ে আছে। শুধু ডালপালা দিয়ে যে চালা বানিয়েছিল বাতাসে তা খানিক হেলে পড়েছে।

পরিষ্কারই বোঝা যায় কেউই সেখানে আসে নি। খানিক এদিক-ওদিক তাকিয়ে সোচেন আবার খামকা আকরিক ভাঙতে শুরু করল। দিন শেষ হয়ে সন্ধে গড়িয়ে এল। সেখানে থাকতে সোচেনের ভয় করছিল, ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। গ্রীষ্মকালে কুকুরের চামড়ার কোট পরে গাঁতি চালিয়ে দেখ-না! শক্তিশালী লোকেরাই ঘায়েল হয়ে পড়ে, আর সোচেন তো কাহিল মানুষ। তাই যেখানে ছিল সেখানেই সে শুয়ে পড়ল। ঘুম তো আর নিজের বশ নয়, সবাই তার কাছে সমান। ভীরুরাও সাহসীদের চেয়ে খারাপ নাক ডাকায় না।

ঘুম ভাঙার পর ভান্‌কার বেশ ঝরঝরে বোধ হল, সাহসও বাড়ল। কিছু খেয়ে আবার কাজে লাগল। ক্রমাগত গাঁতি চালিয়ে চলল, তারপর বিরাট এক চাঙড় খসে পড়ল, আর একটু হলেই তার পাদুটোও যেত। ভাবল, এবার সেই বিড়ালটা

নিশ্চয়ই লাফিয়ে বেরুবে। কিন্তু না, কেউই এল না। বোঝা যাচ্ছে, নেকড়ের ল্যাজ আর ভালুকের চর্বির মধ্যে গুণ আছে। সেই গর্তটার কাছে এগিয়ে গেল সে, দেখল তার সামনে পাথরটা অন্য ধরনের। কাছে-পিঠের সবকিছু সে পরিষ্কার করে, সেই জায়গাটায় গিয়ে শুরু করল নতুন স্তরটা খোঁচাতে। জিনিসটা নীলচে ধরনের, লোকে যাকে বলে থাকে ল্যাপিজল্যাজুলি। হালকা আর আল্‌গা। একটু খোঁচাতেই পেয়ে গেল ছোট একটা গর্ত, ছ'টা সবুজ পাথর সেখানে, সবগুলোই জোড়ায় জোড়ায়। কোথা থেকে যে অত গাঁতি চালিয়ে যাবার শক্তি পেল সোচেন কে জানে। কিন্তু যতই করুক না কেন, আর অমন পাথর সে পেল না। কোনো চিহ্নই নেই। এমন কি স্তরটাও হয়ে উঠল অন্য রকম। যেন ইচ্ছে করে ওটা তাকে দেখাবার জন্যে রাখা হয়েছিল।

অনেকক্ষণ ধরে ভান্‌কা হাল ছাড়ল না। একবার করে সে সেই পাথরগুলোর দিকে তাকায় আর তারপর আবার তার গাঁতি নিয়ে কাজ শুরু করে। কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। জেরবার হয়ে পড়ল সে, মজুত খাবার যা ছিল সব শেষ হয়ে গেছে, সময় হয়েছে বাড়ী ফেরার। সেভেরুশ্‌কার উপরকার সেতু দিয়ে সোজা ঝরনার কাছে যাবার একটা হাঁটা পথ ছিল। সেই পথ ধরল ভান্‌কা। সেখানকার গাছগুলো লম্বা আর বড়ো, কিন্তু পথটা দেখাও সহজ। হাঁটতে হাঁটতে সোচেন ভাবছিল কী দাম পাবে ঐ পাথরগুলোর জন্যে। হঠাৎ পিছন থেকে শোনা গেল:

'মিয়াও! মিয়াও! চোখ ফিরিয়ে দাও আমাদের!'

ফিরে তাকাল সে। দেখল তিনটে বিড়াল তার দিকে ছুটে আসছে, সবগুলোরই রঙ বাদামী, কোটরে চোখ কোনো নেই। এই বুঝি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক পাশের বনের মধ্যে ভান্‌কা ছুটে ঢুকল। বিড়ালগুলোও তার পিছন পিছন। কিন্তু ওরা আর কী করবে, চোখ তো নেই? এমন কি চোখ থাকা সত্ত্বেও সোচেনেরই মুখ ছেঁড়ে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল আর সেই কুকুরের চামড়ার কোটটা হয়ে গেল কুটি কুটি। কতবার যে পড়ল, জলায় পা বসে গেল, কোনো রকমে জোর করে উঠল বড় রাস্তায়। কপাল ভালো, সেভেরনা-র কয়েকজন লোক যাচ্ছিল পাঁচটা গরুর গাড়ী করে। দেখে কে একটা লোক পাগলের মতো ছুটে আসছে। তাই তারা তাকে একটা গাড়ীতে তুলে সেভেরনাতে নিয়ে এল। সেখান থেকে সোচেন একলাই গেল তার

বাড়ীতে। তখন রাত্রি। বৌ ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু কুঁড়েটার দরজা বন্ধ করে নি। সোচেনের স্ত্রীও ভুলো স্বভাবের। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেই হল, সংসারের যা হোক। ফুঁ দিয়ে সোচেন আগুন গনগনে করে তুলল। প্রতিটি কোণে গিয়ে সে ক্রুশ করল। তারপর তার থলি বার করল পাথরগুলো একবার দেখার জন্যে। ঝপ করে হাত দিল থলিতে — ভিতরে এক চিমটে ধুলো ছাড়া আর কিছুই নেই! সব সে গুঁড়িয়ে ফেলেছে! সোচেন হাউমাউ করে চেঁচাতে লাগল। আর যত পারে গাল দিতে লাগল চাকা-বুড়িকে।

'তুমি এটা, তুমি সেটা, বিড়ালগুলোর হাত থেকে বাঁচাতে পারলে না। কিসের জন্যে তোমাকে টাকা দিয়েছিলাম, কেন ঐ কোট পরেছিলাম?'

বৌ ঘুম থেকে উঠতেই তাকে এক ঘুষি মারল। গালাগালি দিল অনেক। বৌ দেখল স্বামী জ্ঞান হারিয়েছে। ভাবল, সোহাগের সুর ধরাই ভালো। স্বামী গালাগালি করে যায়, আর সে ক্রমাগত বলে:

'ওগো, স্নানের ঘরটা কি গরম করব?'

তার বৌ-ও জানত কী করে তাকে ঠাণ্ডা করতে হয়। ভান্‌কা আরো খানিক চেঁচাল, কিন্তু তারপর সামান্য ঠাণ্ডা হয়ে বৌকে বলল সব ঘটনাটা। এবার বৌ নিজেই কাঁদতে শুরু করল। থলির ভিতরকার সেই ধুলো একবার দেখে, খানিকটা তুলে চেটে আবার শুরু করে কান্না। এইভাবে কান্না চালাল দুজনে। তারপর স্ত্রী আবার পরামর্শ দিল।

'বোঝা যাচ্ছে, চাকা-বুড়ির তত শক্তি নেই। জোর বাড়াবার জন্যে পাদ্রীর কাছে যাওয়া দরকার।'

প্রথমে সোচেন কোনো কথাই কানে তুলল না। খনিতে ফিরে যাবার কথা ভাবতেই কেঁপে উঠল। তবে ও মাগী যে ভাদ্রের বৃষ্টি, ছাড়ে না। ঘ্যানঘ্যান করে চলল এক দিন, দু'দিন। শেষে তার ইচ্ছেমতো কাজ হল। ভান্‌কার নিজেরও সাহস অল্প অল্প করে ফিরে আসতে শুরু করল।

ভাবল: 'ঐ বিড়ালগুলো দেখে আমার অত ভয় পাবার কিছু ছিল না। চোখ নেই, করবে কী!'

তাই সে পাদ্রীর কাছে গিয়ে সব কথা বলল।

অনেকক্ষণ ভেবে পাদ্রী বলল:

'বাছা, প্রথম যে-পাথর পাবে সেটা ভার্জিন মেরীর মুকুটের জন্যে দেবে বলে তোমায় প্রতিজ্ঞা করতে হবে, তারপর দিও যতগুলি পারো।'

সোচেন বলল, 'নিশ্চয়ই, গোটা বিশেক পেলে পাঁচটা দিতে কষ্ট হবে না।'

তারপর পাদ্রী সোচেনের মাথার উপর প্রার্থনা করতে শুরু করল। এ-বই থেকে পড়ে, ও-বই থেকে পড়ে, সে-বই থেকে পড়ে, জল ছিটায়, আশীর্বাদ করে ক্রুশ দিয়ে, সোচেনের কাছ থেকে আধ-রুবল নিয়ে বলল:

'বাছা, সাইপ্রেস গাছের একটা ক্রুশ নিয়ে গেলে ভালো হয়। আমার কাছে একটা আছে। কিন্তু খুব দামী। যাই হোক, এমন একটা ব্যাপার, তাই নিজে যে দাম দিয়েছিলাম সেই দামেই দেব।' বলে যে-দাম হাঁকল সেটা চাকা-বুড়ির দ্বিগুণ। পাদ্রীর সঙ্গে তো আর দরাদরি করা চলে না; ভান্‌কা তাই বাড়ী গেল, বৌয়ের সঙ্গে কুড়িয়ে বাড়িয়ে শেষ কড়িটিও জোটাল। ক্রুশ কিনে সোচেন বৌয়ের কাছে বড়াই করতে শুরু করল:

'এখন কাউকে ভয় করি না।'

পরের দিন আবার সে খনির পথ ধরল। তার স্ত্রী সেই ভালুকের চর্বিওলা কামিজটা কেচে দেয়। যতটা পারে সেলাই করে দেয় সেই কুকুরের চামড়ার কোট। নেকড়ের ল্যাজ সে ভান্‌কার গলায় ঝুলিয়ে দিল, তার সঙ্গে সেই সাইপ্রেসের ক্রুশটাও। ক্রাস্নগোরকায় এসে সোচেন দেখল সবকিছু ঠিক আগের মতোই রয়েছে। সবকিছুই পড়ে আছে যেমনটি ফেলে গিয়েছিল। চালাটা শুধু আরো বেঁকে চুরে গেছে। কিন্তু তা নিয়ে ভান্‌কার মাথা ব্যথা ছিল না। সোজা চলে গেল সুড়ঙ্গতে। কিন্তু যেই তার গাঁতিটা তুলতে গেছে অমনি সে শুনতে পেল একটি গলা:

'আবার এসেছ, ভান্‌কা। কানা বিড়ালের ভয় নেই?'

ভান্‌কা ফিরে চাইতেই দেখে ঠাকরুন বসে আছে একেবারে কাছেই। মালাকাইটের পোষাক দেখে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সে চিনতে পারল। তার হাত-পায়ের জোড় যেন খুলে গেল, জিভ তোৎলাতে লাগল:

'সে কী, সে কী... দির্‌-গির্‌-বির্‌... পবিত্র... পবিত্র... দূর হ!'

ঠাকরুন কিন্তু হাসিতে ফেটে পড়ল:

'আরে অত ভয় পেয়ো না। আমি তো আর কানা বিড়াল নই। বরং বলো, এখানে কী চাও?'

ভান্‌কা কিন্তু ক্রমাগত বিড়বিড় করেই চলেছে:

'সে কী, সে কী... দির্‌-গির্‌-বির্‌...' তারপর খানিক সামলে উঠল, বলে, 'জহরত খুঁজছি... স্তেপানের হাতে লোকে দেখেছিল...'

ঠাকরুন ভুরু কোঁচকাল:

'ও নাম তুমি আর নিয়ো না। কিন্তু জহরত তোমায় দেব। বুঝতে পারছি মণি-খুঁজিয়ে তুমি। খনির মজুরদের মধ্যেও তোমার কথা শুনেছি। তাদের নাকি অনেক উপকার করে থাকো।'

ভান্‌কা এবার খুব খুসি হয়ে বলল, 'কী যে বলেন, কী যে বলেন... তবে সবসময় বিবেকমতো কাজ করি।'

'সেই বিবেকের মতোই পাবে। শুধু একটা কথা, সাবধান, দেখো যেন পাথরগুলো বিক্রি করো না। একটাও না! বুঝেছ? সোজা সেগুলো গোমস্তার কাছে নিয়ে যেও। নিজের হাতে সে তোমাকে শিরোপা দেবে। খাজাঞ্চিখানা থেকেও আরো কিছু দেওয়াবে। সারা জীবন খুসি থাকবে। এত দেবে যে নিজে নিজে বাড়ী বয়ে আনতে পারবে না।'

এই কথা বলে ঠাকরুন পাহাড়ের মধ্যে সোচেনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। ভিতরে নামার পর মস্তো বড় একটা পাথরের চাঙ্গড়ে ঠাকরুন লাথি মারল। সেটা গাড়িয়ে গেল; তার তলায় দেখা গেল গুপ্ত গহ্বরের মতো কী একটা। নীল জমিতে সবুজ সবুজ পাথর। কত চাই।

'যত ইচ্ছে তত নাও,' বলে ঠাকরুন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

মণি-খুঁজিয়ে হিসেবে ভান্‌কা বাজে হলেও তার থলিটা কিন্তু ছিল বেশ ভালো আর সবার চেয়ে বড়। সেটা সে ঠেসে ভরল, কিন্তু তাতেও মন উঠছিল না। পকেটে ভরার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ভয় পেল: রাগী চোখে চেয়ে দেখছে ঠাকরুন, যদিও কথা বলছে না। বোঝা যাচ্ছে, করার কিছু নেই, শুধু ধন্যবাদ দেওয়াটাই বাকি। কিন্তু চেয়ে দেখে কেউ নেই। গর্তটার দিকে তাকাল, কিন্তু সেটাও অদৃশ্য হয়েছে। যেন কখনো ছিলই না। সে জায়গাটায় ভালুকের মতো একটা পাথর পড়ে। ভান্‌কা তার

থলি টিপে দেখল — এমন ঠাসা যে মনে হয় বুঝি ফেটে যাবে। আবার সে সেই জায়গাটার দিকে তাকাল যেখান থেকে পাথরগুলো পেয়েছিল। তারপর যত জোরে পারল দৌড়ল বাড়ীর দিকে। দৌড়য় আর টিপে দেখে থলিটা, সব আছে তো, চায় নিশ্চিত হতে। সেটার ওপর নেকড়ের ল্যাজটা দোলায়, ক্রুশটা ঘষে তার গায়ে, তারপর আবার দৌড়তে শুরু করে। সন্ধের অনেক আগেই সে বাড়ী ফিরল। ভয় পেয়ে গেল বৌ।

জিজ্ঞেস করল, 'স্নানের ঘরটা গরম করব?'

কিন্তু ভান্‌কার অবস্থা তখন ক্ষেপার মতো।

চেঁচিয়ে উঠল, 'রাস্তার ধারের জানলার ওপর কিছু ঝুলিয়ে দাও।' তা হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে বৌ ঢেকে দিল দুটো জানালাই। সোচেন তখন থলিটা রাখল টেবিলের ওপর।

'এই দেখো!'

বৌ দেখে কী এক সবুজ দানা দিয়ে থলিটা ভরা। প্রথমে খুসি হয়ে উঠল, নিজের উপর ক্রুশ চিহ্ন আঁকল, কিন্তু তারপর বলল:

'এগুলো যদি আসল না হয়?'

ভান্‌কা তাতে চটেই উঠল:

'বোকা। এগুলো, মানে, পাহাড়ে পেয়েছি। কে সেখানে নকল জিনিস রাখতে যাবে?' সে কিন্তু বলল না স্বয়ং ঠাকরুন তাকে দেখিয়ে দিয়েছে পাথরগুলো, হুকুমও দিয়েছে। মেয়েটি আবার ঘ্যানঘ্যান করে চলল:

'সেখানে যদি অতই বেশী থাকে, সঙ্গে সঙ্গেই তোমার থলি ভরে উঠল, তাহলে যেসব চাষীদের ঘোড়া আছে তারা শুনলে কী হবে? গাড়ী বোঝাই করে তারা নিয়ে আসবে। এগুলো তখন কোন কাজে লাগবে? বাচ্চারা খেলবে, মেয়েরা পুঁতির মালা গাঁথবে?'

সোচেনের মুখ লাল হয়ে উঠল:

'এক্ষুনি এই পাথরগুলোর দাম জানতে পারবে।'

পাঁচটা পাথর হাতে নিয়ে থলিটা গলায় ঝুলিয়ে তাড়াতাড়ি সে গেল খনির সর্দারের কাছে।

‘কুজমা মিরোনিচ, এই পাথরগুলো একবার দেখুন।’

লোকটা সেগুলো দেখল। কাঁচটা পরল নাকে। আবার দেখল। এ্যাসিড দিয়ে পরখ করল।

জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায় পেলে?’

দপ্তরের চর ভান্‌কা সঙ্গে সঙ্গে বলে দিল:

‘ক্রাস্নগোরকায়।’

‘কোন জায়গায়?’

এখানে কিন্তু ভান্‌কা চালাকি করল। সেই জায়গাটার কথা বলল যেখানে প্রথমে কাজ করে।

সর্দার বলল, ‘ব্যাপারটা অদ্ভুত তো। লোহার আকরিকের সঙ্গে তো পান্না থাকে না। অনেক পেয়েছ?’

থলিটা ভান্‌কা টেবিলের উপর রাখল। ভিতরে তাকিয়ে একেবারে থ’ মেরে গেল সর্দার। খানিক সামলাবার পর বলল:

‘অভিনন্দন তোমাকে, ভান্‌কা! ভাগ্য তোমার ওপর সদয়। আমাদের মতো সাধারণ লোককে ভুলে যেও না।’ কেবলি সে ভান্‌কার করমর্দন আর তারিফ করতে লাগল। জানোই তো, টাকায় কী না করে! বলল, ‘চল এক্ষুনি গোমস্তার কাছে।’

ভান্‌কা খানিক ইতিউতি করে:

‘প্রথমে স্নান করা দরকার, জামাকাপড় বদলাতে হবে।’

আসলে সে চেয়েছিল কতকগুলো পাথর সরিয়ে রাখতে। সর্দার কিন্তু ছাড়ল না:

‘এধরনের থলি সঙ্গে থাকলে খোদ জারের কাছে যেতে পারো, গোমস্তা তো কোন ছার। বাঁকা চোখে তাকাবে না, সব সময়েই দরজা খোলা।’

পালাবার পথ নেই। সর্দার ভান্‌কাকে সোজা গোমস্তার কাছে নিয়ে গেল। ঘরটা লোকে ভরা। বুড়ো কর্তা স্বয়ং সবে এসেছে। ঘরের মাঝখানে সে বসে আছে কানে একটা চোঙা লাগিয়ে। গোমস্তা ক্রমাগত সেটার মধ্যে গাঁকগাঁক করে কী কথা বলছে তাকে।

সর্দার ভিতরে গিয়ে যা বলবার বলল। গোমস্তা তক্ষুনি গাঁকগাঁক করল কর্তার চোঙার মধ্যে।

'আমরা তামায় পান্না পেয়ে গেছি। একটি বিশ্বাসী লোক সেগুলো কষ্ট করে খুঁজে বার করেছে। উচিত মতো পুরস্কার দেওয়া দরকার তাকে।'

সোচেনকে আনা হল ভিতরে।

থলিটা সে বার করে দিল কর্তাকে। কর্তার হাতে চুমুও খেল। আশ্চর্য হল কর্তা:

'এল কোথা থেকে? আদব কায়দা জানে দেখছি।'

গোমস্তা গাঁকগাঁক করে উঠল, 'আগে এ ছিল জমিদার বাড়ীর খানসামা।'

কর্তা বলল, 'হ্যাঁ, তাইত বলি। দেখেই বোঝা যায়। লোকে বলে কিনা জমিদার বাড়ীর চাকররা খারাপ শ্রমিক হয়। দেখো, কত পেয়েছে।'

থলিটা সে হাতে নাচাচ্ছিল। সেখানকার সব গণ্যমান্য লোকেরা দেখার জন্যে তার চারপাশে ভিড় করে এল। হোমরাচোমরাদের স্ত্রীরাও ছিল সেখানে। কর্তা থলিটা খুলতে চেষ্টা করল, কিন্তু অভ্যেস নেই তো, সোচেনকে দিল — নে, খোল। সোচেনও তোয়াজ করতে পেরে খুসি। ফিতে টেনে খুলল মুখটা।

'নিতে আজ্ঞা হোক, কর্তা।'

অমনি, ব্যাপার কী জানো, এমন দুর্গন্ধ বেরুল যে সওয়া যায় না। গরু কিম্বা ঘোড়া মরে পচলে যেরকমের হয়। যেসব সম্ভ্রান্ত মহিলারা সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়েছিল তারা রুমাল দিয়ে নাক মুখ ঢাকল। আর কর্তা হুঙ্কার ছাড়ল গোমস্তার ওপর:

'এ কী কাণ্ড? আমার সঙ্গে তামাসা?'

থলিটার মধ্যে হাত ঢোকাল গোমস্তা, ভিতরে কিছুই নেই; শুধু গন্ধটা হয়ে উঠল আরো জোরালো। কর্তা হাত দিয়ে মুখ চেপে দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অন্যরাও যে যেদিকে পারল। রইল শুধু গোমস্তা আর সোচেন। সোচেন ভয়ে শাদা হয়ে গেছে, গোমস্তা কাঁপছে রাগে:

'এসব কী? এ্যাঁ? এত দুর্গন্ধ জোটালি কোথা থেকে? কে তোকে শেখাল?'

সোচেন দেখে, বিপদ, তাই কী ঘটেছিল সব বলল। কিছুই বাদ দিল না। গোমস্তা সব শুনে টুনে বলল:

'তুই বলছিস, ঠাকরুন বলেছিল তোকে শিরোপা দেওয়া হবে?'

'হ্যাঁ, বলেছিল,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোচেন।

'আমার কাছ থেকে?'

'তাই তো বলেছিল — নিজের হাতে আপনি আমাকে পুরস্কার দেবেন, আর খাজাঞ্চিখানা থেকেও দেবেন আরো কিছু।'

'তাহলে এই নে এই প্রথমটা,' গোমস্তা হুঙ্কার ছেড়ে সোচেনের মুখে এমন ঘুষি মারল যে আর একটু হলেই মাথার চোট খেয়ে দেয়াল ভাঙত।

চেঁচিয়ে সে বলল, 'এটা আগাম। পুরস্কারটা পাবি চাবুক মারার থামে। তুই সেটা ভুলবি না মরার দিন পর্যন্ত।'

তাই হল। পরের দিন এতই পেল সোচেন যে নিজে হেঁটে বাড়ী ফিরতে পারল না, তাকে গাছের ছালের তৈরি মাদুরে করে নিয়ে যেতে হল রুগীদের ঘরে। এমন কি সোচেনকে যারা বহু ঘুষি মেরেছিল তাদেরও কষ্ট লাগল খানিক।

'দপ্তরের টিকটিকি তার প্রতিফল পেল!'

তবে গোমস্তাও পার পেল না। সেদিনই কর্তা তাকে ডেকে পাঠাল:

'আমার সঙ্গে এরকম তামাসা, এত স্পর্ধা?'

বুঝতেই পারছ, ধানাই-পানাই করলে গোমস্তা:

'এতে আমার কোনই হাত নেই, সবটাই এ শয়তানের কাজ।'

কর্তা বলল, 'কিন্তু সেই শয়তানকে আমার কাছে কে আসতে দিয়েছিল, হাতে সেই থলিটা নিয়ে?'

গোমস্তার আর উপায় নেই, বলল:

'আমারই গাফিলতি।'

'তাহলে তোমার পাওনা নাও। তোমার কৃতিত্বের জন্যে গোমস্তাগিরি ছেড়ে ক্রীলাতোভস্কোয় যাবে জমাদার হয়ে,' বলল কর্তা। তাতে আবার যেসব কর্মচারী সেখানে ছিল তাদের কাছে মন্তব্য করল:

'তাজা হাওয়ায় খানিক ঘুরুক। এমনিতেই ওর গায়ে বোটকা গন্ধ। লোকে যে ওকে পাঁঠা বলে ক্ষ্যাপায়, সে তো মিছে নয়, এখন আর ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারছি না। গতকালের পর থেকে ওকে দেখলেই বমি আসছে।'

ক্রীলাতোভস্কোয়ই সে গোমস্তা মারা যায়। এতোকাল যেভাবে দিন কাটিয়েছে তারপর ওখানে তার খুব মিষ্টি লাগার তো কথা নয়।

বোঝা যায় ঠাকরুন তাকে নিয়েও একটু রগড় করে।

বিড়ালের কান

সময় ভের্খ্‌নি আর ইলিন্‌স্কি লোহা কারখানার কোনো চিহ্নই ছিল না। শুধু ছিল আমাদের পোলেভায়া আর সিসের্ত। সেভেরনাতেও সামান্য লোহার কাজ হত। কিন্তু সেটা বলার মতো কিছু নয়। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সিসের্তেরই সবচেয়ে বেশী যোগাযোগ ছিল। যে বড় রাস্তাটা চলে গেছে কসাক অঞ্চলে, সিসের্ত ছিল তার পাশে। সবসময়ই সেখানে লোক যাতায়াত করত। কেউ হেঁটে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে। সিসের্তের লোকরা লোহা নিয়ে যেত রেভ্‌দা জেটিতে। নানা ধরনের লোকের দেখা পাওয়া যেত রাস্তায়। তাদের কাছ থেকে শোনা যেত নানা খবর। চারিদিকে ছিল অসংখ্য গ্রাম।

আমাদের পোলেভায়ার অবস্থা ছিল কিন্তু অন্যরকম। বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধ ছিল না। তখনকার দিনে আমরা বিশেষ লোহা তৈরি করতাম না। বেশীর ভাগ তৈরি হত তামা। জেটিতে সেগুলো সবসময় নিয়ে যাওয়া হত পাহারা দিয়ে। তাই থেমে এর-ওর সঙ্গে গল্প করা সহজ ছিল না। পাহারাদারের সামনে সেরকম করতে গিয়ে একবার দেখো না! আমাদের পথে পড়ত একটিমাত্র গ্রাম। তার নাম কসোই-ব্রদ। চারদিকে শুধু জঙ্গল, আর পাহাড়, আর জলাজমি। সোজা কথায়, তখনকার দিনে এখানকার লোকেরা বাস করত যেন গর্তে, থাকত কানার মতো। অবশ্য বোঝাই যায়, কর্তার ঠিক সেইটেই চাই।

হ্যাঁ, এ জায়গাটা ছিল শান্ত। কিন্তু সিসের্তের উপর তাকে নজর রাখতে হত।

তাই বসবাস করার জন্যে সে সেখানে গেল। সেটাকে করল তার প্রধান কারখানা। এখানকার লোকদের উপর নজর রাখার জন্যে সে কেবল পাহারা বাড়াল। তার লোকদের উপর কড়া হুকুম দিল:

‘খবরদার, যেন কোনো বাইরের লোক না আসে, আর এখানকার লোকদের রেখো কড়া শাসনে।’

কোন বাইরের লোক আসতে পারে আমাদের ওরকম পাণ্ডববর্জিত জায়গায়? সিসের্তে যাবার একটা রাস্তা ছিল, কিন্তু লোকে বলে তখনকার দিনে সেটা ছিল খুবই খারাপ। সেটা গিয়েছিল জলাজমির ভিতর দিয়ে। ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে শুধু একটা ঘোড়ার গাড়ী চলার পাটাতন পথ। তার উপর দিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে গেলে লোকের পেটে ব্যথা ধরত। খুব কম লোকই সে রাস্তায় যেত। এখনকার মতো তখন ক্রমাগত লোকে যাতায়াত করত না, শুধু কর্তার কর্মচারী আর পাহারাওয়ালারাই সেটা ব্যবহার করত। তাদের অধিকাংশই যেত ঘোড়ায় চেপে। তাই রাস্তাটা খারাপ হওয়ায় তাদের কিছুই যেত আসত না। কর্তা নিজে পোলেভায়াতে আসত কেবল স্লেজে। স্লেজ চলার পথ হলেই গ্রীষ্মকালের ফাঁকটা পুষিয়ে নিত। হাজির হত হঠাৎ করে। আচমকা ধরো, সন্ধেয় চলে গেল আর পরের দিন দুপুরের খাবার সময় আবার এল ফিরে। ভাবত, লোকে কে কী ফাঁকি দিচ্ছে ধরবে। তাই শীতকালে সবাই জানত কর্তা যেকোনো সময় এসে পড়তে পারে। কিন্তু ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে কখনোই আসত না। গাড়ীর কাঠের উপর ঝাঁকানি আর দোলানি খাওয়া তার বরদাস্ত হত না, আর ঘোড়ায় চেপে আসতেও, বোঝা যায়, পারত না। লোকে বলে বুড়ো হয়ে উঠেছিল। ঘোড়ায় চাপবে কোথায়? তাই যতদিন না আবার শীত ফিরে আসে লোকেরা খানিক নিশ্বাস ফেলে বাঁচত। কারণ গোমস্তা তাদের যতই খাটাক না কেন, আসার সঙ্গে সঙ্গেই কর্তা কিছু না কিছু গাফিলতি বার করত।

একদিন কিন্তু কর্তা হঠাৎ শরৎকালে এসে হাজির। পথটা তখন সবচেয়ে খারাপ। রেওয়াজমতো সে কারখানা কিম্বা খনিতে গেল না, গেল গোমস্তার কাছে। ডেকে পাঠাল সব কর্মচারী, কেরানী — এমন কি পাদ্রীদেরও। সন্ধে পর্যন্ত তারা সেখানে রইল। পরের দিন সকালে কর্তা গেল সেভেরনাতে, তারপর সেদিনই শহরে। ধুলোকাদা ভেঙে। সঙ্গে বহু দেহ-রক্ষী। লোকে বলাবলি করতে শুরু করল: ‘ব্যাপারটা কী? জানা যায় কী করে?’

আজকালকার দিনে সেটা খুবই সহজ — হেঁটে কিম্বা ঘোড়ায় চেপে চলে যাও সিসের্তে। কিন্তু ভূমিদাস প্রথার আমলে? লোকদের তখন ছুতো খুঁজে বার

করতে হত, তাতেও সবসময়ে তাদের যেতে দেওয়া হত না। লুকিয়েও পালানো যেত না, কারণ সব লোক গোণা-গুণতি, কড়া শাসনে রাখা হত তাদের। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা ছেলে বলল সে চেষ্টা করে দেখবে।

'শনিবার সন্ধেয় খনি থেকে উঠে আসার পর তাড়াতাড়ি সিসের্তে চলে যাব, রবিবার সন্ধেয় ফিরে আসব। সেখানে আমার চেনা লোক আছে। চট করেই বার করতে পারব ব্যাপারটা কী।'

সে চলে গেল, কিন্তু আর ফিরল না। কয়েকদিন পরে গোমস্তাকে তারা বলল যে, ছোকরাকে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু গোমস্তা যেন কথাটা কানেই তুলল না। এমন কি খোঁজও করাল না। লোকের তখন আরো কৌতূহল হল, ব্যাপারটা কী? আরো দুজন গেল, কিন্তু তারাও ফিরল না।

তখনকার দিনে আমাদের খনিতে একটা নতুন রেওয়াজ চালু হল — বাড়ী বাড়ী পাহারাদার দিনে তিনবার করে যেত সবাই বাড়ীতে আছে কিনা গুণে দেখার জন্যে। যদি কোনো লোক বনে যেতে চাইত কাঠ কিম্বা ঘাস কাটার জন্যে, তাকে নিতে হত মঞ্জুরি। দল ছাড়া গ্রামের বাইরে তাদের যেতে দেওয়া হত না। সঙ্গে যেত পাহারাদার।

গোমস্তা বলল, 'কাউকেই একা যেতে দেব না। এর মধ্যেই তিনজন পালিয়েছে।'

বৌ কিম্বা ছেলেদেরও বনে যেতে দেওয়া হল না। প্রতি রাস্তার উপরই পাহারা বসাল গোমস্তা। পাহারাদাররাও যেন বাছাই করা, চুপচাপ, কারো কাছ থেকে একটা কথাও বার করা যায় না। তখন দিনের মতোই পরিষ্কার হয়ে গেল সিসের্তে কিছু একটা ঘটেছে, এমন কিছু যাতে কর্তার ঠিকেদারদের রুচছে না। ফিসফিসানি চলল লোহার কারখানা আর খনিতে।

'যেমন করেই হোক আমাদের বার করতে হবে।'

তখন খনি-মজুরদের একটি মেয়ে বলে উঠল:

'আচ্ছা, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। যখন তারা টহলে বেরোয় মেয়েদের তো গোণে না। আমাদের কাছে তো একেবারেই আসে না, জানে দিদিমার সঙ্গে একলা আছি, কোনো পুরুষ নেই। হয়তো সিসের্তেও এই অবস্থা। আমার পক্ষে ব্যাপারটা জানা সহজ হবে।'

মেয়েটি চালাক আর সাহসী... মানে, খনি-মজুরের মেয়ে তো, পোড়খাওয়া হলেও পুরুষেরা ভয় পেয়ে গেল।

'একেবারে একলা বনের ভিতর দিয়ে কুড়ি ক্রোশ কী করে তুমি যাবে, বাচ্চা দুনিয়াখা? নেহাৎ যে কচি? এখন শরৎকাল, নেকড়েরা বেরিয়েছে। তোমার হাড়গুলোও পড়ে থাকবে না।'

মেয়েটি বলল, 'রবিবার রওনা দেব। দিনের বেলায় নেকড়েরা পথে বেরুতে সাহস করবে না। সঙ্গে একটা কুড়ুল নেব।'

তারা জিজ্ঞেস করল, 'সিসের্তের কাউকে চেনো?'

মেয়েটি বলল, 'সেখানে কী আর মেয়ে নেই? তাদের কাছ থেকে সব খবর পাব।'

কয়েকজন লোক দোনোমনো করল:

'মেয়েরা কী জানে?'

'তাদের স্বামীরা যা জানে সব, মাঝে মাঝে বেশীও।'

পুরুষরা নানাভাবে তর্ক করল, তারপর বলল:

'তা বাচ্চা, দুনিয়াখা, তোমার কথাই ঠিক, তোমার পক্ষেই বেরুনো সহজ। কিন্তু কোনো মেয়েকে একলা ওরকম পথে যেতে দেওয়া লজ্জার কথা। নেকড়ে তোমায় খেয়ে ফেলবে।'

ঠিক সেই সময় এক ছোকরা এগিয়ে এল। কী নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল শুনে সে বলল:

'আমি ওর সঙ্গে যাব।'

দুনিয়াখা কিছুটা লাল হয়ে উঠল, কিন্তু তাকে না বলল না।

'দুজনে গেলে অনেক ভালো লাগবে সে-কথা ঠিক, কিন্তু তোমাকে যদি ওরা সিসের্তে ধরে ফেলে, তাহলে?'

সে বলল, 'তা পারবে না।'

দুনিয়াখা সেই ছোকরার সঙ্গে রওনা দিল। অবশ্য রাস্তা দিয়ে নয়, বাড়ীগুলোর পিছন দিয়ে লুকিয়ে পালাল। তারপর চলল বনের ভিতর দিয়ে। তাই, রাস্তায় তাদের দেখা যায় নি। কসোই-ব্রদ আসা পর্যন্ত কোনো মুশকিল হল না, কিন্তু সেখানে

তারা দেখল সেতুর উপর তিনজন লোক। তারা সেটা পাহারা দিচ্ছিল। চুসোভায়া তখনো জমে যায় নি, কিন্তু উজান অথবা ভাটার দিকে সাঁতরে পেরুবার পক্ষে দারুণ ঠাণ্ডা। বনের ভিতর থেকে দুনিয়াখা সব ব্যাপার দেখল। বলল:

'মাতিউখা, মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে না, বাপু। খামকা নিজের উপর বিপদ ডেকে আনবে, আমার কাজটাও পণ্ড করে দেবে। পালিয়েছি সে-কথাটা জানাজানি হবার আগে বরঞ্চ তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। দেখি মেয়েলী বুদ্ধিতে কী করা যায়।'

মাতিউখা তাকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাকে টলানো গেল না। খানিক তর্ক করে স্থির হল মাতিউখা বনের ভিতর থেকে নজর রাখবে। তাকে যদি সেতুর উপর তারা না থামায় তাহলে মাতিউখা ফিরে যাবে বাড়ী, কিন্তু তার যদি কোনো বিপদ হয়, তাহলে বন থেকে বেরিয়ে এসে তাদের সঙ্গে লড়াই করে দুনিয়াখাকে উদ্ধার করবে। দুনিয়াখা ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে গেল, কুড়ুলটা লুকিয়ে রাখল ভালো করে। হঠাৎ বন থেকে ছুটে বেরিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে সোজা লোকগুলোর দিকে:

'বাঁচাও! বাঁচাও! বাঁচাও! নেকড়ে! ওরে বাবা, নেকড়ে!'

লোকগুলো দেখল একটা মেয়ে দারুণ ভয় পেয়েছে। তারা শুধু হাসতে লাগল। একজন এমন কি ল্যাঙ মেরে তাকে ফেলে দেবারও চেষ্টা করল, দুনিয়াখার কিন্তু চোখ সজাগ, তাদের পাশ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল চেঁচাতে চেঁচাতে:

'ওরে বাবা — নেকড়ে! নেকড়ে!'

লোকগুলো তার পিছনে ছাড়ল:

'নেকড়েটা তোমার স্কার্ট কামড়ে ধরেছে! তোমার স্কার্ট কামড়েছে! জোরে দৌড়ও, থেমো না!'

মাতিউখা সব লক্ষ্য করল। বলে:

'সোজা দৌড়ে চলে গেল দুনিয়াখা! আছে বটে শক্ত পাখা! নিজেও বিপদে পড়ে না আর বন্ধুকেও ডোবায় না। বাকি পথটা তার পক্ষে যাওয়া সহজ হবে, শুধু যেতে হবে বনের ভিতর দিয়ে। কেবল দেরি না হলে হয়, নেকড়েগুলো বেরুবার আগে।'

পাহারাওয়ালারা টহলে বেরুবার আগে মাতিউখা বাড়ী ফিরল। সে যে বেরিয়েছিল সেটা তারা ধরতে পারে নি। পরের দিন সব বলল মজুরদের। সবাই বুঝল, প্রথমে যারা গিয়েছিল, তারা ধরা পড়েছে কসোই-ব্রদে।

'কোথাও তাদের কয়েদ করে রাখা হয়েছে, সম্ভবত শিকলে বেঁধে। গোমস্তা তাই তাদের খোঁজ করে নি — সে ভালো করেই জানে কোথায় তারা। এখন আমাদের বাচ্চা মেয়েটা ফেরার পথে ধরা না পড়লেই হয়!'

এমনি খানিক কথাবার্তা কয়ে বাড়ী ফিরল তারা। আর দুনিয়াখা? নিশ্চিন্তে সে বনের ভিতর দিয়ে সিসের্তে পেঁছিয়। শুধু একবার দেখল পোলেভায়ার পাহারাওয়ালারা ঘোড়ায় চড়ে সিসের্ত থেকে বাড়ী ফিরছে। যতক্ষণ না তারা চলে যায় সে লুকিয়ে রইল, তারপর আবার চলতে শুরু করল। কাহিল হয়ে পড়েছিল বৈকি, তাহলেও আলো থাকতে থাকতেই সিসের্ত পেঁছিল। পথে পাহারাদারদের দেখা মিলেছিল আরো, তবে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে যাওয়াটা খুবই সহজ। বনের মধ্যে ঢুকে সে সব্জীবাগানের ভিতর দিয়ে এল। কাছেই একটা কুয়ো, তার চারিধারে মেয়ের দল। দুনিয়াখা তাদের দলে ভিড়ে গেল। এক বুড়ি জিজ্ঞেস করল:

'কার মেয়ে তুমি? আমার তো মনে পড়ে না তোমাকে আগে দেখেছি।'

দুনিয়াখা বুঝল বুড়িকে বিশ্বাস করতে পারে।

বলল, 'আমি পোলেভায়া থেকে আসছি।'

বুড়ি অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে:

'কী করে এলে? সবখানেই তো পাহারা। আমাদের লোকেরা তাদের ভিতর দিয়ে তোমাদের কাছে যেতে পারে না। যারাই চেষ্টা করেছে তারাই ফেরে নি।'

দুনিয়াখা তাকে সব কথা বলল।

শুনে বুড়ি বলল:

'বাচ্চা মেয়ে, আমার বাড়ীতে এসো। আমি একলা থাকি। সেখানে কখনো তারা খুঁজতে আসে না। আর তারা যদি আসে তাহলে বলব তুমি আমার নাতনি, এসেছ নদীর ওপার থেকে। তাকেও অনেকটা তোমার মতো দেখতে। শুধু তুমি একটু পুরুষ্টু। তোমার নাম কী?'

'দুনিয়াখা।'

'ঐ দেখো। আমার নাতনির নামও দুনিয়াখা।'

সেই বুড়ির কাছ থেকে দুনিয়াখা সব কথা জানল। মনে হয়, কর্তা অনেক দূরে কোথাও পালিয়েছে, প্রতি সপ্তাহে পেয়াদারা তার কাছ থেকে আসা-যাওয়া করে ঘোড়ায় চেপে।

কর্তা আদেশ পাঠায় আর গোমস্তা ভান্কা শ্ভারেভ সেগুলো পড়ে শোনায় সব লোকদের। লোহার কারখানাটা একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সব লোকদের পাঠানো হয়েছে শেলকুনস্কোয়েতে গভীর গড়খাই কেটে বাঁধ তোলার জন্যে। সেদিক থেকে কিছু যেন হামলা আসছে। বলা হয়েছে, বাশখিররা বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু মোটেই তা নয়। দূর দূরান্তের খনিতে, গাঁয়ে আর কসাকদের মধ্যে বিদ্রোহ জেগেছে, বাশখিররা আছে তাদের সঙ্গে। কর্তাদের আর জমিদারদের টুঁটি চেপে ধরছে তারা। জনগণের প্রধান সর্দারের নাম ইয়েমেলিয়ান ইভানভিচ*। কেউ কেউ বলে সে-ই আসল রাজা, কেউ বলে সে একজন সাধারণ লোক, কিন্তু যাই হোক, তার কাছ থেকে জনসাধারণের — স্বাধীনতা, আর বড়লোকদের — মৃত্যু। সেইজন্যেই আমাদের শেয়ালটা যতদূরে পেরেছে চুপিচুপি পালিয়েছে! ভয় পেয়ে গেছে!

দুনিয়াখা জানল সিসের্তে পাহারাওয়ালারা দিনে তিনবার রোঁদে বেরোয় আর সব লোকদের গোণে, ঠিক পোলেভায়ার মতো। কিন্তু সিসের্তে তারা আরো কড়া। কিছু এদিক-ওদিক হলেই বৌ, ছেলেমেয়ে আর পরিবারের সবাইকে জেলে ভরা হয়। লোকটা দৌড়ে এসে বলে:

'এই যে আমি, একটু দেরি হয়ে গেছে, এই যে।'

'দেখো, পরের বার যেন দেরি না হয়,' আর তার পরিবারের সবাইকে ধরে রাখে দু'দিন কিম্বা তিনদিনও।

লোকেদের মুখ তারা ভালো করে বন্ধ করে রেখেছে। আর গোমস্তা শিকলে-বাঁধা কুকুরের চেয়েও খারাপ।

তা সত্ত্বেও সন্ধেবেলার রোঁদ শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সব লোক এল বুড়ির

* ইয়েমেলিয়ান ইভানভিচ পুগাচভ — আঠারো শতকের বিখ্যাত কৃষক বিদ্রোহের নেতা। — অনুঃ

কাছে, দুনিয়াখাকে প্রশ্ন করতে লাগল তাদের অবস্থাটা কী রকম। দুনিয়াখা সব কথাই বলল।

তারা বলল, 'আমরা এদিকে ক্রমাগত লোক পাঠাচ্ছি, তাদের একজনও ফিরে আসছে না।'

দুনিয়াখা বলল, 'আমাদের অবস্থাও তাই। যে যায়, সে একেবারে উধাও। চুসোভায়াতে নিশ্চয়ই সবাই ধরা পড়েছে।'

অনেকক্ষণ তারা আলোচনা করল, তারপর ভাবতে শুরু করল — দুনিয়াখা কী করে পোলেভায়ায় ফিরে যাবে? কসোই-ব্রদে তার জন্যে তারা থাকবে ওঁৎ পেতে, কী করে তাদের ভিতর দিয়ে যাবে?

তাদের একজন বলল:

'তের্‌সুতের জলাজমিটার ভিতর দিয়ে গালিয়ান পর্যন্ত যেতে পারে। দিব্যি হত তাহলে, কিন্তু সে তো পথটা চেনে না। তাকে পথটা দেখিয়ে দেবারও কেউ নেই...'

'আমাদের কি সাহসী মেয়ে নেই?' বুড়ি প্রশ্ন করল। 'এখানেও তাদের গোণা হয় না, অনেকেই তের্‌সুতে গিয়েছিল ক্র্যান-বেরির জন্যে। তারা একে পথ দেখিয়ে দেবে। শুধু বলে দাও কী করে তারপর যেতে হবে। তাহলে পথ হারাবে না, বাড়ী পেঁাছবে রাত্তিরের আগে। তা না হলে নেকড়ের কবলে পড়তে পারে।'

সেই লোকটা তাই দুনিয়াখাকে বলল কীভাবে যেতে হবে। প্রথমে তের্‌সুতের জলাজমির ভিতর দিয়ে, তারপর মচালভ্‌কা নদীর পাশ দিয়ে গালিয়ান জলা পর্যন্ত, আর তারপর সেটা ধরে গেলেই পেঁাছে যাবে চুসোভায়ায়। নদীটা সেখানে সরু, কোনো রকমে সে পার হবে, তারপর খুব কাছেই দেখা যাবে পোলেভায়ার খনি।

বলল, 'যদি দেরি হয়ে যায় তাহলেও সে পথে বিপদ কম। মাটির বিড়াল গালিয়ান থেকে দুম্‌নায়া পাহাড় পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। বিড়ালটা মানুষের ক্ষতি করে না, কিন্তু তার কান দেখলে নেকড়ে ভয় পায়। ওদিকটায় নেকড়ে বিশেষ যায় না। কিন্তু তাহলেও এর ওপর খুব বেশী ভরসা রেখো না, যত জোরে পারো পা চালিও। আলো থাকতে থাকতে বাড়ী পেঁাছতে চেষ্টা করো। সম্ভবত ঐ বিড়ালটার কথা শুধু গল্পই। কে কবে তাকে দেখেছে?'

সাহসী মেয়েদের পাওয়া গেল। দুনিয়াখাকে তারা মচালভ্‌কার পথে নিয়ে যেতে রাজী। খুব সকালে অন্ধকার থাকতে থাকতে পাহারাওয়ালাদের চোখে ধুলো দিয়ে তারা চলল।

'আমরা অনেকে যদি একসঙ্গে থাকি তাহলে নেকড়ে কাছ ঘেঁষতে পারবে না। ভয় পাবে। আমরা বাড়ী ফিরব সকাল সকাল। তার পক্ষেও ভালো।'

এই বলে তারা রওনা দিল গল্প করতে করতে। অল্প পরে গান ধরল। এ পথটা তারা ভালোই জানে, প্রায়ই তারা তের্‌সুতেও যায় ক্র্যান-বেরি তুলতে, কেন তারা গাইবে না?

মচালভ্‌কায় পেঁাছে দুনিয়াখার কাছ থেকে তারা বিদায় নিল। তখনো বেশী বেলা হয় নি, দিনটাও রোদে ভরা। সবকিছুই ভালো উৎরাচ্ছে। সেই লোকটি তাকে বলেছিল, মচালভ্‌কা থেকে গালিয়ানের ভিতর দিয়ে পোলেভায়া প্রায় সাত ক্রোশের বেশী দূর হবে না। সন্ধের আগেই সেখানে পেঁাছে যাবে। একটাও নেকড়ে তারা দেখে নি। ভয়ের কারণ নেই।

বিদায় নিল তারা। দুনিয়াখা চলল একা। সামান্য যেতেই গোলমাল বাধল। এ অঞ্চল তার অচেনা, বনও ভয়ঙ্কর। ভীতু মেয়ে সে নয়, তবুও বারবার পিছনে তাকাতে লাগল। তারপর পথ হারাল।

আবার যখন সে পথ খুঁজতে শুরু করেছে তখন গোধূলি নেমে এল। চারিদিকে শুরু হল নেকড়ের ডাক। তখন আমাদের অঞ্চলে প্রচুর নেকড়ে। এমন কি এখনো তারা শরৎকালে কারখানার একেবারে আশেপাশে ডাকে। কিন্তু তখনকার দিনে তারা ছিল অগুণতি! দুনিয়াখা দেখে, ব্যাপারটা খারাপ দাঁড়াচ্ছে। এতো কথা জানার পর সে কিনা বাড়ী পেঁাছতে পারছে না! তার বয়েসও কম, মরতেও চায় না। সেই ছেলেটির কথা তার মনে পড়ল, মাতিউখার কথা। নেকড়েরা বেশ কাছে এসে পড়েছে। কী সে করবে? দৌড়তে শুরু করলে সঙ্গে সঙ্গে তারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। গাছে চড়লে তলায় দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ না মাটিতে পড়ে।

জলা ঢালু হয়ে গেছে চুসোভায়ার দিকে। এই কথা লোকটি তাকে বলেছিল। সে ভাবল: 'যদি আমি শুধু একবার চুসোভায়ায় পেঁাছতে পারি।'

হেঁটে চলল সে নিঃশব্দে। নেকড়েরাও চলল পিছু পিছু। গোটা একটা দল। অবশ্য তার কাছে কুড়ুলটা রয়েছে, কিন্তু সেটা দিয়ে কী বা করবে!

হঠাৎ দুটো নীল শিখা দেখা গেল। দেখতে ঠিক বিড়ালের কানের মতো — তলার দিক চওড়া, ওপরটা ছুঁচল। তার প্রায় পঞ্চাশ পা সামনে।

শিখা কোথা থেকে আসছে ভাবার জন্যে না থেমে দুনিয়াখা সোজা ছুটল তার দিকে। জানত নেকড়ে আগুনে ভয় পায়।

এল সে কাছে চলে। সত্যিই দেখল দুটি আগুন জ্বলছে। তাদের মাঝখানে ছোট উঁচু একটা ঢিবির মতো, ঠিক যেন বিড়ালের মাথা। সেই দুটো আগুনের মাঝখানে এসে থামল দুনিয়াখা। দেখল নেকড়েরা পিছিয়ে পড়েছে। আগুন কিন্তু ক্রমাগত বড় হতে লাগল, ঢিবিটা হতে লাগল উঁচু। বিনা কাঠে সেই আগুন ঐভাবে জ্বলতে দেখে দুনিয়াখা অবাক। সাহস করে একটা হাত বাড়াল, কিন্তু মোটেই গরম লাগল না। হাতটা আরো কাছে নিয়ে গেল, আগুনটা দপ্ করে সরে গেল একপাশে। ঠিক বিড়াল যেমন করে কান নাড়ায়। তারপর আবার সেটা স্থির হয়ে জ্বলতে লাগল।

দুনিয়াখা সামান্য ভয় পেল, কিন্তু নেকড়েদের মুখের কাছে তো সে দৌড়ে যেতে পারে না। তাই দাঁড়িয়েই রইল দুটো আগুনের মাঝখানে, আর আগুন ক্রমাগত ওপরে উঠতে লাগল। বেশ বড়সড় হয়ে উঠল। দুনিয়াখা একটা পাথর কুড়িয়ে নিল। সেটার গন্ধ গন্ধকের মতো। তারপর সিসের্তের লোকটির মাটির বিড়ালের কথাটা তার মনে পড়ল। লোকদের সে আগুনের কানওয়ালা বিড়ালের কথা বলতে শুনেছিল। তামার সঙ্গে সোনা যেখানে মিশেছে সেখানকার বালিতে থাকে সেটা। লোকেরা বহুবার ঐ কান দেখেছে, কিন্তু বিড়ালটাকে কখনো দেখতে পায় নি। মাটির তলা দিয়ে সেটা চলাফেরা করে।

দুনিয়াখা বিড়ালের কানদুটোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল এখন কী করবে? নেকড়েরা চলে গেছে, কিন্তু কত দূরে গেছে? আগুনের কাছ থেকে চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তারা ফিরে আসবে। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার খুব শীত করতে লাগল, সকাল পর্যন্ত ওভাবে কখনো দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

কথাটা যেই ভেবেছে অমনি আগুন অদৃশ্য হল। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল সে। ফিরে তাকাল — নেকড়েরা কি ফিরে আসছে? না, তাদের কোনো চিহ্নই নেই। কিন্তু অন্ধকারে সে যায় কী করে? তখনই আগুন তার সামনে লাফিয়ে উঠল। দুনিয়াখা সোজা ছুটল তার দিকে। ক্রমাগত সে দৌড়ে চলল, কিন্তু যতই চেষ্টা করুক না কেন কিছুতেই তার নাগাল পেল না। এইভাবে দৌড়ে সোজা সে এসে পড়ল চুসোভায়া নদীতে। দেখতে পেল কানদুটো জ্বলছে নদীর ওপারে।

বরফ অবশ্য পাতলা, তার উপর ভরসা নেই। কিন্তু জায়গা বাছবার জন্যে সে থামল না। দুটো হালকা কাঠ কেটে সে শুরু করল পার হতে। গুটিগুটি চলল সে, ভিতরে পড়ে গেল না, বরফ যদিও সব সময়েই মড়মড় করছিল। কাঠগুলো তাকে সাহায্য করল।

পেরুবার পর না থেমে সে সোজা ছুটল বিড়ালের কানের পিছন পিছন। চারদিকে তাকিয়ে দেখল জায়গাটা চেনা — পেসোচ্নায়া। এক সময় খনি ছিল, সেখানে কাজ করেছে। এমন কি রাত্রেও সে বাড়ীর পথ খুঁজে বার করতে পারত। কিন্তু তাহলেও কানগুলোর পিছু নিল সে। ভাবল: 'একবার ওভাবে যখন বাঁচিয়েছে তখন আমাকে আর বিপদে ফেলবে না।'

কথাগুলো যেই না ভাবা কানদুটো উঁচু হয়ে লকলক করে উঠল, জ্বলতে লাগল জ্বলজ্বল করে, যেন বলতে চায়: 'ঠিক কথা। বুদ্ধিমতী মেয়ে!'

বিড়ালের কান দুনিয়াখাকে পভারেন্স্কি খনি পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল, দুম্নায়া পাহাড়ের কাছ পর্যন্ত। ঠিক ঐখানেই। একেবারে খনির কাছে বলা যায়।

রাত হয়ে গেছে। দুনিয়াখা তার বাড়ী গেল সাবধানে, যাতে কেউ না দেখতে পায়। লোক দেখলেই সে ফটকের থামের পিছনে লুকোয় আর সরে পড়ে সব্জীক্ষেতের ভিতর দিয়ে। এইভাবে সে কুটীর পর্যন্ত পৌঁছে শুনতে পেল ভিতরে লোকেদের কথাবার্তা।

খানিক শুনে সে বুঝলে তারা কারুর জন্যে অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছিল তারই জন্যে। গোমস্তা হুকুম দিয়েছে দিদিমাকে বাড়ীর মধ্যে রাখতে এক পাহারাওয়ালার হেফাজাতে। ভেবেছিল: 'ফিরতে পারলে সেখানেই দুনিয়াখা

আসবে।' নিজেও সে ক্রমাগত আসছিল দেখতে, যাতে দিনরাতের মধ্যে এক দণ্ডের জন্যেও পাহারাওয়ালা না চলে যায়।

সেসব কথা দুনিয়াখা অবশ্য জানত না, কিন্তু শুনতে পেল অচেনা সব লোক দিদিমার ঘরে রয়েছে। তাই ঢুকতে ভয় পেল। কিন্তু তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, হাড় পর্যন্ত জমে গেছে। তাই পিছনের গলি দিয়ে সরে পড়ল মাতিউখা নামে সেই ছোকরাটির কাছে, যে তার সঙ্গে গিয়েছিল কসোই-ব্রদ পর্যন্ত। জানালায় সে মৃদু টোকা দিয়ে লুকিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মাতিউখা দৌড়ে বাইরে এল:

'কে?'

তখন দুনিয়াখা বেরুল। ভারি খুসি হল মাতিউখা।

বলল, 'স্নানের ঘরে যাও, সেটা গরম করা হয়েছে। তোমাকে সেখানে লুকিয়ে রাখব। কাল তোমার জন্যে আরো একটা ভালো জায়গা খুঁজে বার করব।'

গরম স্নানের ঘরে দুনিয়াখাকে রেখে দরজায় তালা দিয়ে ছেলেটা বিশ্বাসী লোকেদের খবর দিতে গেল:

'ফিরে এসেছে দুনিয়াখা। আছে বটে শক্ত পাখা।'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই এসে তাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। দুনিয়াখাও সব কথা বলল। শেষে বলল সেই বিড়ালের কানের কথা:

'তা না থাকলে নেকড়েরা আমায় ধরে ফেলত।'

লোকেরা তাতে বিশেষ কান দিল না। ভাবল, মেয়েটা ক্লান্ত, আধ-ঘুমন্ত, ঘটনাটা দেখেছে স্বপ্নে।

তারা বলল, 'খেয়ে ঘুমিয়ে নাও। সকাল পর্যন্ত তোমাকে আমরা পাহারা দেব। তারপর ভাবব তোমাকে লুকোবার পক্ষে কোন জায়গাটা সবচেয়ে ভালো।'

তাই দরকার ছিল দুনিয়াখার। গরমে ঘুম এসে গেছে। বসার জায়গা থেকে প্রায় পড়ে যায়।

সামান্য খেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। মাতিউখা আর আরো পাঁচজন ছোকরা থেকে গেল তাকে পাহারা দিতে। কিন্তু তখন রাত, চারিধারে সবকিছুই নিঝুম। তার উপর ভাব একবার, দুনিয়াখা খবর এনেছে! ছেলের দল, বোঝা যায়, কথা কইতে

শুরু করে, বেশ জোরে জোরেই। খবরটা যারা শুনেছিল তারাও বোবা হয়ে বসে থাকতে চায় না। শুরু হল আলাপ-আলোচনা, উপদেশ, পরামর্শ। সমস্ত গ্রাম যেন ছটফট করছে। পাহারাওয়ালাদের দল তা লক্ষ্য করে রোঁদে বেরুল। দেখল এখানে একটা লোক কম, ওখানে আরেকটা, এদিকে পাঁচজন ছোকরা আবার জড়ো হয়েছে মাতিউখার কুঁড়েতে।

'এখানে কী করছ?'

বুঝতেই পারছ, যার মাথায় যা এল সেই কৈফিয়তই দিল। পাহারাওয়ালারা কিন্তু বিশ্বাস করল না, শুরু করল খানাতল্লাস। তাই লাঠি ধরা ছাড়া আর উপায় কী? পাহারাওয়ালাদের কাছে তো ছিলই অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু অন্ধকারে লাঠি চালানো সহজ। ছেলেরা তাদের একেবারে ছাতু করে দিল। তাদের জায়গায় অন্য পাহারাওয়ালারা এল দৌড়ে, আগের চেয়ে তিন-চারগুণ বেশী। ছোকরারা জিততে শুরু করল। ছেলেদের একজন গুলি খেয়ে মরল, কিন্তু অন্যরা তখনো চলল লড়াই করে।

অনেকক্ষণ আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল দুনিয়াখার। স্নানের ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে দেখল দুম্নায়া পাহাড়ের পিছনে দুটো দারুণ নীল আগুন উঠছে, যেন তার পিছনে লুকিয়ে রয়েছে সেই বিড়াল, শুধু তার কানদুটো দেখা যাচ্ছে। এই বুঝি খনির উপর লাফিয়ে পড়ে। দুনিয়াখা চেঁচিয়ে উঠল:

'ওটা আমাদের আগুন! খনি-মজুরদের আগুন! ছেলের দল, যাও ওখানে!'

বলে নিজেই তাদের দিকে দৌড়তে শুরু করল। সমস্ত খনিতে দারুণ হৈচৈ। পাগলা ঘণ্টি বাজছে। লোকেরা এল দৌড়ে বেরিয়ে। ভাবল পাহাড়ের অন্য দিকে আগুন লেগেছে, সবাই সেখানে চলল দৌড়ে। কিন্তু কাছে এসে থেমে গেল। আগুনটা ভয়াবহ। দুনিয়াখাই শুধু সোজা ছুটে তার কাছে গেল। তারপর সেগুলোর ঠিক মাঝখানে থেমে চেঁচিয়ে বলল:

'কর্তার ঐ লোকগুলোকে ধরো! ওদের নিকেশ করবার সময় এসেছে! অন্য খনির লোকেরা অনেক আগেই ওদের সঙ্গে হিসেব নিকেশ করেছে!'

পাহারাওয়ালারা আর চৌকিদাররা পড়ল মহা ফাঁপরে। বহু লোকের জমায়েত। পাহারাওয়ালারা এদিক-ওদিক ছুটতে চেষ্টা করল। কিন্তু জনগণের হাত থেকে নিস্তার নেই। বহু লোক ধরা পড়ল, তবে গোমস্তা পালাল শহরে। বিভ্রাট বাধল।

যাদের শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছিল, মুক্তি দেওয়া হল তাদের। তারপর সেই কান অদৃশ্য হল।

পরের দিন দুম্‌নায়া পাহাড়ে জড় হল লোকে। সিসের্তে যা শুনেছে দুনিয়াখা তাদের জানাল। তখন কয়েকজন লোক, বেশীর ভাগই বুড়ো, দোমনা করতে শুরু করল:

'কে জানে ব্যাপারটা শেষ হবে কীভাবে! মিছিমিছি গতকাল সন্ধেয় তুমি আমাদের তাতালে।'

কিন্তু আর সবাই দুনিয়াখার দলে:

'মেয়েটির কথাই ঠিক! এটাই একমাত্র কথা! বসে আছি কিসের জন্যে! গিয়ে ইয়েমেলিয়ান ইভানভিচের দলে যোগ দেব আমরা।'

কয়েকজন তখন চিৎকার করতে শুরু করল:

'যাবই যাব কসোই-ব্রদে। সেখানে আমাদের ছেলেরা বন্দী। তোমরা তাদের ভুলে গেছ?'

সঙ্গে সঙ্গে একদল ছোকরা ছুটল কসোই-ব্রদে। রক্ষীদের মেরে নিজেদের আর সিসের্তেরও পাঁচজন লোককে তারা খালাস করল। জাগিয়ে তুলল তারা কসোই-ব্রদের লোকদেরও। যা-ঘটছে সেকথা তাদের তারা বলল।

যখন তারা ফিরল, দুম্‌নায়া পাহাড়ে তখনো তর্ক চলছে। ছোকরারা চলে যাওয়ায় বুড়োর দল জোর পেয়েছে। লোকেদের সবকিছু গুলিয়ে গেছে। তারা শুধু বলল:

'প্রহরীদের মেরে ফেলা কি আমাদের উচিত হয়েছে?'

'উচিত শিক্ষা হয়েছে!' চিৎকার করে উঠল জোয়ানের দল।

কসোই-ব্রদে যাদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল তারাও অবিশ্যি এই পক্ষেই। বুড়োদের বলল, 'ভয় পেলে তোমরা এখানেই থাকো। আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা আদায় করতে চললাম।'

বলে তারা চলে গেল। বুড়ো লোকরা রইল সেখানে। অনেক অত্যাচার সহ্য করল, চাবুক খেল। অন্যদেরও চাবুক খাওয়াল। শহর থেকে গোমস্তা ফিরল সৈন্য-সেপাই নিয়ে। সিসের্ত থেকেও পাহারা নিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গেই লোকেদের ওপর

প্রচণ্ড অত্যাচার শুরু করল গোমস্তা, আগের চেয়েও বেশী। তারপর কিন্তু থেমে গেল। গোমস্তা নিশ্চয়ই শোনে এমন কিছু যাতে দুর্ভাবনায় পড়ে। যে-বুড়োরা লোকেদের ভুল বুঝিয়েছিল, তাদের তোয়াজ করার সে সবরকম চেষ্টা করল। কিন্তু তখনো লোকেদের পিঠে চাবুকের দাগ, দেখতে পেয়েছে তাদের ভুল। গোমস্তা দেখল, লোকেরা বাঁকা চোখে চাইছে — গেল পালিয়ে। আমাদের খনিতে কেউ আর কখনো তাকে দেখে নি। হয়তো খুবই জবর লুকোন লুকোয়। কিম্বা ভালো লোকদের হাতে পড়ে। তারা তার ঘাড় মটকে দেয়।

দুম্‌নায়া পাহাড় থেকে জোয়ানের দল সোজা গেল বনের মধ্যে। মাতিউখা তাদের নেতা।

পাখির ছানা দুনিয়াখাও উড়ে গেল তার সঙ্গে।

সেই বেপরোয়া পাখির ছানা সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে, কিন্তু সবগুলো আমার মনে নেই।

একটা গল্প অবশ্য আমার মনে পড়ছে — দুনিয়াখার চাবুক নিয়ে।

লোকে বলে, কর্তারা ইয়েমেলিয়ান ইভানভিচকে হারিয়ে ফাঁসী দেওয়ার পরেও দুনিয়াখা নাকি আমাদের এলাকায় ছিল। গোমস্তা আর ঠিকেদাররা তাকে ধরবার সবরকম চেষ্টা করে, কিন্তু পারে নি। আচমকা সে হাজির হত বড় রাস্তায় কিম্বা কোনো খনির পাশে, আর জানো তো, সবসময় চড়ে থাকত একটা আগুনে ঘোড়ার উপর, কেউই সেটাকে ধরতে পারত না। কথা নেই, বার্তা নেই হঠাৎ সে হাজির হত, যাদের দরকার তাদের সে তার বার্শকিরী চাবুক কষে ব্যস হাওয়া হয়ে যেত। ওপরওয়ালাদের মাথা আবার যেত গুলিয়ে, তারা তাকে খুঁজতে শুরু করত সবখানে। এদিকে হঠাৎ কোনো জায়গায় দেখা দিয়ে চাবুক হাঁকিয়ে সে শিক্ষা দিত কোনো ঠিকাদারকে কী করে লোকেদের সঙ্গে ঠিকমতো ব্যবহার করতে হয়। মাঝে মাঝে এমন মার মারত যে বহুদিন সে উঠতে পারত না।

সেই বার্শকিরী চাবুক দিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে মানুষকে মারা কঠিন কাজ নয়, সেটা দিয়ে নেকড়ে বাঘও মারতে পারো যদি জানো কীভাবে মারতে হয়। বোঝা যায়, দুনিয়াখা শিখেছিল কী করে চাবুক চালাতে হয়। এমন মার মারত যাতে তাকে তারা মনে রাখত বহুকাল ধরে। লোকে বলে, উচিত কাজই করত। যে-খনির

ঠিকাদাররা অত্যাচার করত কমবয়েসী মেয়েদের উপর, তাদের কপালেই শাস্তি জুটত বেশী। তাদের উপর তার একেবারেই কোনো রকম দয়ামায়া ছিল না।

খনির মধ্যে মাঝে মাঝে লোকে এই কথা বলে ভয় দেখাত:

'দেখো বাপু, দুনিয়াখা তোমায় আবার না চাবকায়।'

দুনিয়াখার উপর অবিশ্যি বহুবার গুলি চালানো হয়, কিন্তু মনে হয়, তার কপাল ভালো। লোকে আরো বলে, গুলি চালাতে গেলেই সেই জ্বলন্ত বিড়ালের কান তাদের সামনে খাড়া হয়ে দুনিয়াখাকে ফেলত আড়াল করে।

কথাটা যে কতটা সত্যি তা জানি না, কেননা নিজে তো দেখি নি। আর যারা গুলি চালাত, তাদের কথায় কেই বা বিশ্বাস করবে।

মানে জানো তো, গুলি ফসকালে কারুরই ভালো লাগে না। লোকে তখন চেষ্টা করে কোনো একটা অছিলা বার করতে। সূর্য চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল, কিম্বা মাছি চোখে পড়েছিল, কিম্বা হঠাৎ মাথা ঘুরে গিয়েছিল, কিম্বা গুলি চালাবার ঠিক আগেই একটা মশা নাকে বসে কামড়ায়। এই ধরনের কত সব কথা বলে তো। হয়তো এজন্যেই তাদের মধ্যে কেউ একজন ঐ বিড়ালের কানের গল্প বানায়। বানায় যাতে মুখ রক্ষে হয়। এইভাবে গল্পটা চালু হয়।

কিম্বা হয়তো দুনিয়াখাকে গুলি ছুঁতেই পারে না। বুড়োরা একটা কথা বলে:

'সাহসী লোক পাহাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গুলি তার পাশ দিয়ে চলে যায়। কাপুরুষ লুকিয়ে থাকে ঝোপে, কিন্তু গুলি বেঁধে তার গায়ে।'

তাই যেসব লোক খনি চালাত তারা কখনোই নিশ্চিন্ত হত না। সবসময়েই ভয় তাদের পিঠে দুনিয়াখার চাবুক পড়বে। লোকে বলে কর্তাও ভয় পেত। ভাবত কোনো দিন হয়তো দুনিয়াখা তাকে চাবকে লাল করবে। কিন্তু মেয়েটার বুদ্ধিও ছিল।

শুধু চাবুক নিয়ে ছুটে আসার কী মানে? কর্তার কাছে সবসময়েই যে থাকে হাতিয়ারবন্দ দেহ-রক্ষীরা।

মহানাগ

সময় আমাদের খনিতে একটি লোক ছিল। নাম তার লেভোন্তি। লোকটি নিরীহ, কাজ করত খুব। ছেলেবেলা থেকেই তাকে গুমেশ্‌কিতে খনির কাজে রাখা হয়। তামা জোগাড় করার জন্যে। এইভাবেই তার জোয়ান কালের সব বছর কাটে। মাটির তলায় কেঁচোর মতো তার কাজ। সে দিনের আলো দেখে না, সবজেটে হয়ে গেল। বোঝোই তো, খনি। স্যাঁৎসেঁতে, অন্ধকার আর গুমোট বাতাস। শেষটায় তার গায়ে আর জোর রইল না। গোমস্তা দেখল সেখানে তার কাছ থেকে আর কিছু পাওয়া যাবে না। তাই দয়া করে তাকে লাগাল অন্য কাজে — 'নাচুনীর খনি' জমিদারী সোনার খনিতে। লেভোন্তি সেখানে কাজ করতে শুরু করল, কিন্তু তাতে বিশেষ উপকার হল না। বাস্তবিকই সে অসুস্থ লোক। কথাটা গোমস্তা মনে মনে ভেবে লেভোন্তিকে বলল:

'তুমি খাটিয়ে চাষী, কর্তাকে তোমার কথা বলেছি, তিনি তোমায় পুরস্কার দেবেন। কর্তা বলেছেন, নিজের জন্যেই ও নিজে খাটুক। কাজ করুক ও স্বাধীনভাবে, খালাসি-খাজনা না দিয়ে।'

তখনকার দিনে এরকমই ছিল। লোক একেবারে নির্জীব হয়ে পড়লে, যখন আর কোনো কাজেই লাগে না, তারা তাকে ছেড়ে দিত নিজের জন্যে কাজ করতে।

এইভাবে লেভোন্তিকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু তাকে তো খেতে হবে আর খাওয়াতে হবে ঘরের লোককে। কী করে সেটা পারে — তার খামার নেই, কোনোকিছুই যে নেই? অনেক ভাবল সে, তারপর ঠিক করল খুঁজবে সোনা। মাটি খোঁড়া তার অভ্যেস ছিল, তার জন্যে বিশেষ কোনো যন্ত্রপাতিরও দরকার হয় না। তাই সে এদিক-ওদিক হাতড়ে কিছু খোঁজ পেয়ে ছেলেদের ডাকল:

'শোনো, আমার সঙ্গে এসো সোনা খুঁজতে। হয়তো তোমাদের কপাল জোড়ে কিছু পেয়েও যেতে পারি, ভিক্ষে করতে হবে না।'

ছেলেরা তখন খুবই ছোট, দশ বছরের সামান্য বেশী।

বেরিয়ে পড়ল তারা, স্বাধীনভাবে সোনা খুঁজতে। বাপ পা চালায় বহু কষ্টে। ছেলেরা ছোট বলে পিছিয়ে পড়ে।

তখনকার দিনে রিয়াবিনভ্‌কার উপরের দিকে বেশ সোনা মিলতে শুরু করে-ছিল। তাই লেভোন্তি চেয়েছিল সেইখানে যেতে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এটা ঠিকঠাক করে নেওয়া তখনকার দিনে বেশ সহজ ছিল। শুধু বলো কোথায় যেতে চাও, আর নিয়ে এসো সোনা। অবশ্যই ঠকানোও তখন হত। তাছাড়া কি আর হয়? দপ্তর দেখত লোকেরা কোথায় যায় আর কী নিয়ে আসে। ভালো রকম সোনা পাওয়া গেলে সেই জায়গাটা তারা আত্মসাৎ করে নিত। নিজেরাই ওখানটা খুঁড়ব, তুমি অন্য কোথাও দেখো। এ সব লোকেদের তারা লাগাত সোনা পাবার ভালো জায়গা খুঁজে বার করার জন্যে। লোকেরাও অবশ্য নিজেদেরটা দেখত। চেষ্টা করত যা পেয়েছে তার সবটা না দেখাতে। আপিসের খাতায় লেখাবার জন্যে যতটুকু দরকার ততটুকু আনত। অধিকাংশই লুকিয়ে বিক্রি করত চোরাকারবারীদের কাছে। সংখ্যায় তারা অনেক, চালাকও — কোনো পাহারাই তাদের কখনো ধরতে পারত না। চতুর্দিকেই জোচ্চুরি। দপ্তর চেষ্টা করত লোক ঠকাতে আর প্রতিদানে তারাও ঠকাত দপ্তরকে। এরকমটাই তখন ছিল রেওয়াজ। শুধু দৈবক্রমে জানা যেত কোথায় সোনা আছে।

লেভোন্তির কাছে কিন্তু এরা কোনো কথাই চাপল না। যা-জানে সবটাই তাকে বলল। কী রকম সোনা-খুঁজিয়ে সে তো দেখাই যাচ্ছে। মরবার আগে খানিক সুখ পায় তো পাক।

রিয়াবিনভ্‌কায় এসে চারিধারে খানিক দেখে লেভোন্তি কাজ শুরু করে দিল। কিন্তু কাজের শক্তি তার সামান্যই। খানিকটা কাজ করে, তারপর তাকে আধ-মরা হয়ে বসে থাকতে হয় দম ফিরে পাবার জন্যে। আর ছেলেরা — তারাই বা কী আর করতে পারে? তাহলেও তারা যা পারে চেষ্টা করতে লাগল। এইভাবে চলল এক সপ্তাহ বা কিছু বেশী। লেভোন্তি দেখল তারা সামান্যই পেয়েছে, এমন কি রুটিও

জ্বটবে না। কী হবে? নিজের শরীর তার ক্রমশ খারাপ হয়ে উঠছে, হাড় ছাড়া আর কিছ্বই দেহে নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও র্বটির জন্যে সে ভিক্ষে করতে চাইল না, চাইল না ছেলেদের গলায় ভিখিরিদের ঝুলি ঝুলিয়ে দিতে। শনিবার এলে সে দপ্তরে গেল বালি ধ্বয়ে যে-সোনা পেয়েছে তা দিতে। ছেলেদের সে বলল:

'তোমরা এখানে থেকে যন্ত্রপাতির ওপর নজর রাখো, ওগ্বলো বয়ে নিয়ে যাওয়া আর আবার বয়ে নিয়ে আসার কোনো মানে হয় না।'

ছেলেরা তাই রইল চালাটার কাছে। একজন গেল চুসোভায়া নদীতে, সেটা ছিল খ্বব কাছেই। গাজিয়ন আর পার্চ মাছ ধরল সে কিছ্ব, তাই তারা মাছের ঝোল বানাতে লেগে গেল। আগ্বন জ্বালাল তারা। দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে এল। ভয়-ভয় করল ছেলেদের।

সেই সময় তারা দেখল একটি ব্বড়ো লোক আসছে, খনিরই লোক। লোকে তাকে ডাকত সেমিওনিচ বলে, কিন্তু তার পদবী আমার মনে নেই। এক সময় সে ছিল সিপাহী। লোকে বলে, আগে যখন জোয়ান ছিল, লোহার চুল্লির কাজে তাকে ধরা হত ওস্তাদ। কিন্তু একদিন সে গোমস্তার ম্বখে ম্বখে চোপা করে, গোমস্তা তাই হ্বকুম দেয় তাকে চাব্বক মারার জন্যে। সেমিওনিচ কিন্তু র্বখে দাঁড়িয়ে ঘ্বষি মেরে লোকদের ছিটকে ফেলে দেয় — গায়ে জোর ছিল খ্বব। জানোই তো, লোহার মজ্বর, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে তারা ধরে ফেলে। বেত মারার লোকেরা সবাই ছিল খ্বব জোয়ান, বাছাই-করা লোক। তা সেমিওনিচকে চাব্বক মারা হল, তার উপর মারপিট করার জন্যে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ফৌজে। প'চিশ বছর পরে সে খনিতে ফিরল একেবারে ব্বড়ো হয়ে। সংসারের সবাই গিয়েছে মরে, তার কুটীরটাকেও কাঠের তক্তা এ'টে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেটাকে এমন কি ভেঙে ফেলার কথাও হয়। বাস্তবিকই সেটার অবস্থা হয়েছিল খ্বব খারাপ। কিন্তু তারপর সে ফিরে আসে। কু'ড়েটা সারিয়ে সেখানে থাকতে শ্বর্ব করে চুপচাপ, একেবারে একা। তা সত্ত্বেও পড়শীদের চোখে পড়ল, ব্যাপারটা স্ববিধের নয়। কী সব বইপত্র আছে ওর, প্রতি সন্ধেতেই বসে বসে সেগ্বলো সে পড়ে। লোকে ভাবল হয়তো সে অস্বখ সারাতে পারে, তাই তারা তার কাছে আসতে শ্বর্ব করে। কিন্তু সে রাজী হল না। বলে, 'ও বিষয়ে আমার কোনো জ্ঞান নেই। আর তোমাদের যা কাজ, তাতে কি আর চিকিৎসা

হয়।' লোকে তখন ভাবল হয়তো কোনো বিশেষ ধরনের ধর্ম সে গ্রহণ করেছে। কিন্তু সেটাও ঠিক বলে মনে হল না। অন্যান্য চাষীদের মতো সেও ক্রিসমাস আর ইস্টারের দিনে গির্জেয় যায়, কিন্তু মনে হত না বিশেষ ভক্তি আছে। আশ্চর্য হবার আরো একটা কথা — কাজকর্ম নেই, অথচ খায় কী করে? অবশ্য তার একটা সব্জীবাগান, একটা পুরনো বন্দুক, আর মাছ ধরার ছিপ ছিল। কিন্তু এতে কি আর খাওয়া-পরা চলে? অথচ টাকাও ছিল তার, মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা কাউকে কাউকে দিত। এই ব্যাপারেও অদ্ভুত। কেউ হয়তো তার কাছে এসে ভিক্ষে চাইল, বন্ধক দিতে চাইল কিছু, সুদ দেবে, নানা রকম কড়ার করত। তবু তাকে সে টাকা দিত না। আর অন্যের বেলায় নিজেই গিয়ে বলত:

'শোনো ইভান, কি মিখাইল, এ টাকাটা নিয়ে একটা গরু কেনো। তোমার বাড়ী ভর্তি ছেলেমেয়ে, তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছ না।' মানে, অদ্ভুত খামখেয়ালী ধরনের বুড়ো। লোকে বলত, সে পিশাচসিদ্ধ। সে কথাটা বিশেষ করে ওঠে ঐ বইগুলোর দরুন।

এই সেমিওনিচ বুড়ো ছেলেদের কাছে এসে তাদের কুশল জানাল। ছেলেরাও খুসি হয়ে উঠে। তাদের সঙ্গে খেতে বলল তাকে:

'বসো, দাদু, আমাদের মাছের ঝোল খানিক খাও।'

সে আপত্তি করল না। বসে ঝোল চেখে দেখে দারুণ প্রশংসা করল — বাঃ, কী সুন্দর ঘন ঝোল।

ঝোলা থেকে সে নরম টাটকা রুটি বার করে ভেঙে ভেঙে টুকরোগুলো ছেলেদের সামনে জড়ো করে রাখল। তারা দেখল বুড়োর ঝোল পছন্দ হয়েছে, তাই তারা রুটি খেতে শুরু করল। সেমিওনিচ ওদিকে প্রশংসা করে চলল ঝোলের, বলতে লাগল বহুকাল এধরনের কোনোকিছু খায় নি। এতে ছেলেরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। পেট একেবারে ভরে না যাওয়া পর্যন্ত চলল খেয়ে। প্রায় সব রুটিটা তারা শেষ করল। বুড়ো ওদিকে শুধু বলে:

'বহুকাল এধরনের ঝোল খাই নি।'

তা ছেলেদের তো খাওয়া শেষ হল, সেমিওনিচ জিজ্ঞেস করতে শুরু করল তাদের কী রকম চলছে। তারা তাকে সব কথা বলল। বলল, তাদের বাবাকে খনির

কাজ থেকে খালাস দিয়ে নিজের জন্যে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হয়েছে, এখন তারা বালি থেকে সোনা ধ্বচ্ছে। সেমিওনিচ ক্রমাগত মাথা নাড়ায় আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে: আহা আর আহা, তারপর জিজ্ঞেস করল:

'কতটা তোমরা ধ্বয়ে পেয়েছ?'

'বাবা বলেছেন, প্রায় পাঁচ আনার মতো।'

ব্বড়ো উঠে পড়ল:

'তা বেশ, ছেলেরা, তোমাদের কিছ্ব সাহায্য করা দরকার। শ্বধ্ব মনে রেখো, এ নিয়ে কোনো কথা কাউকে যেন বোলো না। একটা কথাও না। কোনো কাউকে না,' যে-দ্বষ্টিতে সেমিওনিচ ছেলেদের দিকে তাকাল তাতে ভয় লাগল ওদের। যেন একেবারেই অন্য লোক। তারপর আবার হেসে বলল:

'এখন তোমরা আগ্বনের পাশে এইখানে বসে থাকো যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি। একজনের সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। হয়তো সে তোমাদের সাহায্য করবে। শ্বধ্ব দেখো, ভয় পেয়ো না যেন। তাহলে সবকিছ্ব পণ্ড হবে। কথাটা ভালো করে মনে রেখো।'

বনের মধ্যে ব্বড়ো চলে গেল। ছেলেরা রইল একা। দ্বজন চাওয়া-চাওয়ি করে, কিন্তু কথা বলে না। শেষ পর্যন্ত বড় ছেলেটির সাহস বাড়ল। সে ফিসফিস করে বলল: 'দেখিস, ভাই, ভুলিস না — আমরা কিছ্বতেই ভয় পাব না।' ঠোঁট কিন্তু তার শাদা হয়ে গিয়েছে আর দাঁতে দাঁত লাগছে। ছোট ছেলেটি বলল:

'আমি একটুও ভয় পাই নি, দাদা,' কিন্তু ময়দার মতো সে-ও শাদা হয়ে গেছে।

এইভাবে তারা বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। রাতটা অন্ধকার, বনের ভিতর সবকিছ্বই চুপচাপ। রিয়াবিনভ্কার জলের ছলছলানি কানে আসছে। বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু কাউকেও দেখা গেল না, ফলে তাদের ভয় কমে যেতে শ্বর্ব করল। আগ্বনে আরো কয়েকটা ডাল ফেলে তারা চাঙ্গা হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ বনের মধ্যে তারা শ্বনতে পেল কাদের কথাবার্তা। ভাবল, কেউ আসছে। কিন্তু এতো রাতে কে হতে পারে? আবার ভয় করে উঠল তাদের।

তারপর দ্বটি লোক এল আগ্বনের কাছে। একজন সেমিওনিচ, অন্যজন অচেনা। তার বেশভূষাও অদ্ভুত। প্যাণ্ট আর আলখাল্লা সব হলদে, পাদ্রীদের মতো সোনালী

জরি। কোমরবন্ধটা চওড়া, নক্সাকাটা, ঝুলন্ত থোপনা। এটাও জরির, শুধু সবজে। টুপিও হলদে; দু'পাশে তল থেকে লালের ডোরা। তার বুটও লাল। তার মুখের রঙ হলদে। তাতে বড় চাপদাড়ি। কুঁকড়ে কুঁকড়ে সে দাড়ি গোল গোল কুণ্ডলী পাকিয়েছে, এতো তা আঁটো যে বোঝা যায়, সেগুলো সোজা করা খুব কঠিন। শুধু চোখ তার জ্বলজ্বলে সবুজ, বিড়ালের মতো। অথচ চাউনি কিন্তু ভালোমানুষের মতো, স্নেহময়। মাথায় সে সেমিওনিচের সমান, মোটাও নয়, অথচ বোঝা যাচ্ছে ওজন খুব। যেখানে দাঁড়ায় সেখানকার মাটি দেবে যায়। ছেলেরা এত কৌতূহলী হয়ে উঠল যে ভয় পেতে গেল ভুলে, শুধু বড় বড় চোখ মেলে লোকটির দিকে তাকিয়ে রইল। এদিকে সে যেন ঠাট্টার সুরেই সেমিওনিচকে জিজ্ঞেস করল:

'এরাই তাহলে তোমার স্বাধীনভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে? যা পায় তাই রাখবে? কাউকে দেবে না, তাই না?'

তারপর খানিক ভ্রূ কুঁচকে যেন সেমিওনিচের পরামর্শ নেবার জন্যেই বলল:

'কিন্তু এ ছেলেদের আমরা বিগড়ে দেব না তো?'

সেমিওনিচ বলতে শুরু করল, ছেলেরা অহঙ্কারী নয়, ভালো ছেলে। কিন্তু এই অদ্ভুত লোকটি আবার শুরু করল:

'সব মানুষই এক ছাঁচে গড়া। যতদিন গরীব আর অভাবী ততদিন তারা ভালো। কিন্তু যেই না আমার সোনার সন্ধান পায়, অমনি কোত্থেকে যে যত বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে ওঠে কে জানে।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে খানিক ভাবল, তারপর বলল:

'তা বেশ, চেষ্টা করে দেখি। ছেলেগুলো হয়তো ভালোই হবে। দিব্যি ছেলে, যদি বিগড়ে যায় তাহলে দুঃখের কথা। ছোট ছেলেটির ঠোঁট পাতলা। হয়তো লোভী হয়ে দাঁড়াবে। সেমিওনিচ, তুমি নিজে ওদের ওপর নজর রেখো। ওদের বাবা বেশী দিন বাঁচবে না। আমি তাকে জানি। কবরের একেবারে কাছে পৌঁছেছে, কিন্তু তবুও চেষ্টা করছে কিছু রোজগার করতে। তার আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু দৌলত পেলে সেও বিগড়ে যাবে।'

এমনভাবে সেমিওনিচের সঙ্গে কথা বলছিল যেন ছেলেরা সেখানে নেই। তারপর ফিরে তাদের দিকে সে তাকাল:

‘শোনো, ছেলেরা, ভালো করে লক্ষ্য করো। দেখো কোন দিকে আমার পায়ের ছাপ যায়। সেইখানে ওপর ওপর খুঁড়ো; গভীর করে খুঁড়ো না, তাতে লাভ নেই।’

ছেলেরা হঠাৎ দেখে — সেই মানুষটা তখন আর মানুষ নেই। তার ওপর থেকে কোমরবন্ধ পর্যন্ত সবটাই একটা মাথা, আর সেই কোমরবন্ধ থেকে পা পর্যন্ত একটা গলা। মাথাটা ঠিক আগের মতোই রয়েছে। শুধু হয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড। চোখ হাঁসের ডিমের মতো বড় বড়, গলা সাপের মতো। একটা বিরাট সাপের দেহ মাটি ফুঁড়ে উঠতে লাগল, গাছগুলোকে ছাড়িয়ে গেল মাথাটা। তারপর সেই দেহ একেবারে আগুনের ওপর বেঁকে গিয়ে মাটির ওপর সটান হয়ে এগিয়ে গেল রিয়াবিনভ্কার দিকে, ওদিকে ক্রমাগত মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল পাকের পর পাক। যেন তার শেষ নেই। আরো একটা আশ্চর্য ব্যাপার, আগুন নিভে গেল, তবু বেশ আলো হয়ে উঠল জায়গাটা। কিন্তু সে আলো সূর্যের আলোর মতো নয়, অন্য ধরনের, যেন ঠাণ্ডা। সাপটা রিয়াবিনভ্কায় গিয়ে জলের মধ্যে সেঁধুল। সঙ্গে সঙ্গে দু’পাশের জল জমে গেল। তারপর সে অন্য তীরে উঠে সেখানকার একটা পুরনো বার্চ গাছ পর্যন্ত গিয়ে চেঁচিয়ে বলল:

‘জায়গাটা লক্ষ্য করেছ তো? এইখানটায় তোমরা খুঁড়বে। অনাথদের পক্ষে যথেষ্ট হবে। কিন্তু মনে রেখো, লোভ থেকে সাবধান!’

বলেই যেন গলে গেল। রিয়াবিনভ্কার জল আবার ছলছল করে উঠল, আগুন উঠল জ্বলে, শুধু ঘাস তখনো হয়ে রইল শাদা, যেন সেটার উপর তুষার বিন্দু পড়েছে।

তারপর সেমিওনিচ ছেলেদের সব কথা ভালো করে বুঝিয়ে বলল:

‘ঐ সেই মহানাগ। সমস্ত সোনার মালিক। যেখানে যায় সোনাও যায় সেখানেই।

পৃথিবীর ওপর কিম্বা নীচ দিয়ে সে যেতে পারে। যতখানি ইচ্ছে ততখানি জায়গা জুড়ে কুণ্ডলী পাকাতে পারে। মাঝে মাঝে হয় কি, লোকে আবিষ্কার করল একটা ভালো স্তর। তারপর দেখা যায় জুচ্চুরি অথবা মারামারি, হয়তো-বা খুনোখুনি, তখন সেই স্তর যায় হারিয়ে। তার মানে নাগ ফিরে এসে সোনা নিয়ে গেছে। কিম্বা এরকমও ঘটতে পারে... একটা ভালো জায়গা আবিষ্কার করল লোকে, আলগা সোনা

রয়েছে, তাই নিয়ে খাটতে লাগল। ওদিকে হঠাৎ দপ্তর থেকে হুকুম হল: সরে পড়ো, রাজার জন্যে ওটা আমরা নিচ্ছি, সোনা নিজেরাই খুঁড়ব। যন্ত্রপাতি আনে, লোকজন লাগায়, সোনা কিন্তু আর পাওয়া যায় না। বেশী করে খোঁড়ে, চারধার খোঁড়ে, কিন্তু কিছুই পায় না। মনে হয় যেন কোনো কালে সেখানে সোনা ছিলই না। তার কারণ নাগ সেই জায়গাটা ঘিরে দু'এক রাত ছিল, ফলে সমস্ত সোনা টেনে নিয়েছে তার গা। চেষ্টা করো না কেন, কিছুতেই বার করতে পারবে না কোথায় সে শুয়েছিল।

'কী জানো, যেখানে সোনা থাকে সেখানে সে জাল জুচ্চুরি ভালোবাসে না। সবচেয়ে ভালোবাসে না একজন আরেকজনের ওপর অত্যাচার করবে। কিন্তু যারা নিজেদের জন্যে খাটছে তাদের সে কিছু বলে না। মাঝে মাঝে তাদের সাহায্যও করে, তোমাদের যেমন করল। শুধু মনে রেখো, কথাটা কাউকে বলবে না, বললেই সবকিছু পণ্ড হয়ে যাবে। এ কথাটাও মনে রেখো, সোনার জন্যে যেন লোভ না হয়। তোমাদের লোভ জাগিয়ে তোলার জন্যে এটা সে তোমাদের দেখায় নি। তোমরা তো শুনেছ তার কথা। ভুলো না। এটাই আসল কথা। এখন শুয়ে পড়ে ঘুমোও, আমি একটু আগুনের কাছে বসে থাকি।'

ছেলেরা কথা শুনল। চালায় ঢুকে তারা সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। যখন তাদের ঘুম ভাঙল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। অন্যান্য সোনা-খুঁজিয়েরা অনেক আগেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। দু'ভাই চাওয়া-চাওয়ি করে:

'কাল তুই কিছু দেখেছিলি, ভাই।'

অন্য জন বলল:

'আর তুই দেখেছিলি?'

তারপর কথা কয়ে নিল। প্রতিজ্ঞা করল, কসম খেল, কথাটা কাউকেই বলবে না, আর কখনোই তারা লোভ করবে না। তারপর তারা খোঁড়ার জন্যে জায়গা বাছতে শুরু করল। খানিক কথা কাটাকাটিও হল এ নিয়ে।

দাদা বলল, 'রিয়াবিনভ্‌কার ওপারে বার্চ গাছটা থেকে আমাদের শুরু করা উচিত। যে-জায়গা থেকে নাগ তার শেষ কথা বলে যায়।'

কিন্তু ছোট ভাই বলল:

'না, ওটা ভালো নয়, ভাই। তাহলে সব গুপ্ত কথাটা চট করে লোকে জেনে যাবে, কেননা সবাই দেখতে ছুটে আসবে রিয়াবিনভ্কার ওপারে কী ধরনের বালি বেরিয়েছে। সব ফাঁস হয়ে যাবে।'

এ নিয়ে খানিক তর্ক করল। সেমিওনিচ চলে গেছে বলে তাদের দুঃখ হল, জিজ্ঞেস করার মতো কেউই নেই। তারপর হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল, কাল যেখানে আগুন জ্বালিয়ে ছিল সেই জায়গার ছাইয়ের মাঝখানে একটা বার্চ গাছের ডাল পোঁতা রয়েছে।

'আমাদের জন্যে সেমিওনিচ চিহ্ন রেখে গেছে নিশ্চয়ই।' এই ভেবে ছেলেরা খুঁড়তে শুরু করল জায়গাটা।

সঙ্গে সঙ্গেই তারা পেল দুটো ছোট ছোট সোনার ঢেলা। বালিটাও দেখা গেল আগে যেরকম ছিল সেরকম নয়। এইভাবে প্রথম দিকে তাদের পক্ষে সবকিছুই বেশ ভালো দাঁড়াল। পরে অবশ্য ব্যাপারটা খারাপের দিকে মোড় নেয়, কিন্তু সেটা অন্য বৃত্তান্ত।

নাগের দাগ
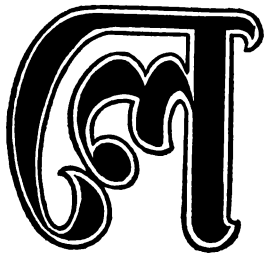
ভোন্তির সেই দুটি ছেলে, নাগ যাদের সোনা পাবার পথ দেখিয়ে দেয়, তাদের অবস্থা ফিরতে শুরু করল। বাবার মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বছরে বছরেই শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল তাদের। একটা ঘর তুলল — খুব জমকাল গোছের নয়, সাধারণ মজবুত কোঠা। গরু আর ঘোড়া তারা কিনল। শীতকালে তাদের বাড়ীতে এল তিনটে ভেড়া। বুড়ো বয়েসে সামান্য সুখের মুখ দেখে তাদের মা বাস্তবিকই খুসি হয়ে উঠল।

এসবই হল সেই বুড়ো সেমিওনিচের সাহায্যে। তার বুদ্ধিতেই তারা চলত। ছেলেদের সে শেখাল কী করে সোনা বিক্রি করতে হয়, যাতে দপ্তরের লোকে না সন্দেহ করে কিম্বা অন্যান্য সোনা-খুঁজিয়েরা তাদের দিকে হিংসের চোখে না তাকায়। সোনার ব্যাপারটায় বুদ্ধির দরকার! চারদিকে নজর রাখতে হবে। সোনা-খুঁজিয়েরা চোখ রাখছে, শকুনের মতো রয়েছে বেনিয়ারা, আর আপিসও লক্ষ্য রাখছে। চালাক হতে হবে! ছেলেরা এত সব পারবে কী করে? কিন্তু সেমিওনিচ তাদের সব দেখিয়ে দিত। মানে, শিখিয়ে তুলল তাদের।

দিন কাটছে ছেলেদের। বড় হয়ে উঠল, কিন্তু তখনো সেই একই জায়গায় তারা সোনা ধোয়। অন্যান্য খুঁজিয়েরাও রইল কাছে পিঠে। বেশী না হলেও, বোঝা যায় কিছু কিছু পায়। কিন্তু ছেলেদের কপাল বাস্তবিকই ভালো। সোনা কিছু কিছু জমাতেও লাগল।

তারপর কিন্তু ওপরওয়ালার নজর পড়ল — দুটি অনাথ, কিন্তু অবস্থা তো খারাপ নয়। তাই একদিন এক পেয়াদা এসে হাজির। সে দিনটা পরবের দিন। মা তখন উনুনের ভিতর থেকে সবে মাছের পিঠে বার করছিল:

‘গোমস্তা তলব করেছে! বলেছে, এক্ষুনি।’

তারা গেল। তাদের উপর গোমস্তা হম্বিতম্বি শুরু করে দিল:

‘কতদিন তোরা কাজ ফাঁকি দিয়ে বেড়াবি ভেবেছিস? নিজেদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ — তাল গাছের মতো ঢ্যাঙা হয়েছিস, আর এখনো কিনা কর্তার জন্যে একদিনও বেগার দিস নি! কে তোদের ছুটি দিয়েছে? তোরা কি পল্টন হতে চাস?’

ছেলেরা অবশ্য বুঝিয়ে বলল:

‘মানে, আমাদের বাবা, মারা গেছেন যিনি, একেবারেই কাহিল হয়ে পড়লে কর্তা নিজেই তাকে খালাস দিয়েছিলেন, তাই আমরা ভেবেছিলাম...’

‘ভাবাভাবি ছেড়ে দলিলটা দেখা, যাতে লেখা আছে তোদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে!’

ছেলেদের কাছে অবশ্য কোনো দলিল ছিল না, তাই কী বলবে ভেবে পেল না।

তখন গোমস্তা তাদের বলল:

‘তোরা প্রত্যেকে পাঁচশো করে নিয়ে আয়, দলিল দেব।’

মানে, বাজিয়ে দেখছিল আর কি, ছেলেরা টাকা কবুল করে কিনা। ছেলেরা কিন্তু অটল হয়ে রইল।

ছোটটি বলল, ‘আমাদের যা-আছে তার সবকিছু বিক্রি করে দিলেও ঐ টাকার অর্ধেক হবে না।’

‘তাই যদি হয়, তাহলে কাল সকাল থেকে তোরা কাজে যাবি। ঠিকেদার তোদের বলবে কোথায় যেতে হবে। দেখিস যেন দেরি না হয়! দেরি হলে প্রথম দিনেই চাবুক খাবি!’

ছেলেরা ভীষণ দমে গেল। তাদের কাছে কথাটা শুনে মা শুরু করে দিল কাঁদতে আর হাহুতাশ করতে।

‘হা কপাল! এখন আমরা বাঁচব কী করে?’

পড়শী আর আত্মীয়রা সবাই এল। কেউ পরামর্শ দিল কর্তাকে চিঠি লিখতে। কেউ বলল তাদের শহরে যাওয়া উচিত খনির হোমরাচোমরা লোকেদের কাছে।

কেউ হিসেব করল তাদের সবকিছু বিক্রি করলে কত টাকা পাওয়া যায়। কেউ আবার ভয় দেখাল, বলল:

'তোমরা ট্যাঁফোঁ করতে গেলে গোমস্তার লোক এসে ঘাড় ধরে নিয়ে যাবে, চাবুক মারবে, ঠেলে দেবে খনিতে। সেখানে তোমাদের শিকল দিয়েও বাঁধবে। তখন খোঁজো তোমার ন্যায় বিচার।'

যে-যার নানা রকম কথা বলে গেল, কিন্তু কেউ ভাবতেই পারল না গোমস্তা যে পাঁচশোর কথা বলেছে ছেলেদের কাছে তার পাঁচগুণের বেশী আছে, কিন্তু ভয় পাচ্ছে দেখাতে। জানো তো, এমন কি তাদের মাও তার কিছুই জানত না। সেমিওনিচ যখন বেঁচে, তখন তাদের বারবার করে সাবধান করে দেয়:

'জমানো সোনার কথা কাউকে বলো না, বিশেষ করে কোনো মেয়েকে। মা, বৌ, কনে — কাউকেই না। কে জানে কখন কী ঘটে। খনি থেকে পাহারাদাররা এসে খানাতল্লাস করতে পারে, একথা সেকথা বলে ভয় দেখাতে পারে। মেয়েরা মাঝে মাঝে মুখ বন্ধ রাখতে পারে, কিন্তু ছেলে কিম্বা স্বামীর জন্যে ভয় পেয়ে যায়, দেখিয়ে দেয় কোন জায়গায় কী লুকোনো আছে। পাহারাওয়ালারা ঠিক ঐটি চায়। তারা সোনা নিয়ে গিয়ে লোকটাকে মেরে ফেলবে। আর মেয়েরা হয় জলে ঝাঁপায় নয়তো গলায় দড়ি দেয়। এরকম ঘটনার কথা আমি জানি। তাই সাবধান! যখন বড় হবে, বিয়ে করবে, এই কথাটা ভালো করে মনে রেখো। তোমাদের মাকেও ঘুণাক্ষরে কিছু জানিও না। তিনি কখনোই মুখ বুজে থাকতে পারেন না, ছেলেদের নিয়ে গর্ব করতে ভালোবাসেন।'

ছেলেরা সেমিওনিচের উপদেশ ভালো করে মেনেছিল, তাদের জমানো দৌলতের কোনো কথা কাউকে বলে নি। অন্যান্য সোনা-খুঁজিয়েরা অবশ্য আন্দাজ করত যে ছেলেদের নিশ্চয়ই জমানো কিছু আছে, কিন্তু কতটা আর কোথায় কেউ জানত না।

তা পড়শীরা তো এ নিয়ে নানা আলোচনা ও দুঃখ করে। শেষ পর্যন্ত এই বলে চলে গেল যে, পরের দিন সকালে ছেলেদের কাজে যেতেই হবে।

'এছাড়া উপায় নেই।'

সবাই চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছেলেটি বলল:

'চলো, দাদা, সোনার খনিতে যাওয়া যাক। অন্তত শেষবারের মতো...'

দাদাও আন্দাজ করল ব্যাপারটা কী। বলল:

'বেশ তো, যাওয়া যাক, তাজা হাওয়ায় হয়তো মাথাটা খানিক আরাম পাবে।'

পরবের খাবার থেকে তাদের মা কিছু দিল পথে খাবার জন্যে, দু'একটা শশাও দিল তার সঙ্গে। তারাও একটা বোতল নিল বৈকি। তারপর রিয়াবিনভ্কার দিকে রওনা দিল।

চলছে দুজনে, কোনো কথাবার্তা নেই, পথটা বনে সেঁধুতেই বড় ভাই বলল:

'এইখানে কিছুটা লুকিয়ে থাকা যাক।'

বড় মোড়টার পর সরে এসে রাস্তার কাছে ব্রায়ার গাছের পিছনে তারা শুয়ে পড়ল। এক এক গেলাশ পান করে খানিকটা গড়াল, শোনে, কেউ একজন আসছে। উঁকি মেরে দেখল, পাত্র আর যন্ত্রপাতি নিয়ে ভান্কা সোচেন যাচ্ছে। খুব যেন সকাল সকালই সে সোনা খুঁজতে চলেছে। হঠাৎ তার যেন কাজ করার ঝোঁক চেপেছে, বোতলটাও শেষ করার ফুরসুৎ হয় নি। এই সোচেন লোকটা ছিল দপ্তরের চর। কারুর ওপর সন্দেহ হলে তারা তাকে পাঠাত খবর জানতে। বহুকাল থেকেই লোকেরা সে কথা জানে। কত বার সে মার খেয়েছ, কিন্তু তবুও বদলায় নি। সত্যিকারের আপদ সে। তামা পাহাড়ের ঠাকরুন নিজে পরে তাকে এমনই বখশিস দেয় যে, তাকে যেতে হয় কবরে। তবে সেটা অন্য কথা... সেই সোচেন আসছে। ভাইরা চোখ মটকাল। খানিক যেতেই সর্দার চলে গেল ঘোড়ায় চেপে। আরো খানিক অপেক্ষা করতেই খোদ পিমেনভ তার ইয়োর্শিক হাঁকিয়ে চলে গেল। তার হালকা গাড়ীতে ছিপ বাঁধা, যেন চলেছে মাছ ধরতে।

তখনকার দিনে পোলেভায়ায় যারা লুকিয়ে সোনা কিনত তার মধ্যে পিমেনভ সবচেয়ে দুঃসাহসী। আর প্রত্যেকেই চিনত তার ইয়োর্শিককে। সেটা স্তেপের ঘোড়া, খুব বড়সড় নয়, কিন্তু যেকোনো তিন ঘোড়ার গাড়ীকেই হারিয়ে দিতে পারে। কোথা থেকে যে পেল! লোকে বলত যে তার দুটো হৃৎপিণ্ড, দু'জোড়া ফুসফুস। এক দমে পঁচিশ ক্রোশ পাল্লা দিয়ে দেখো-না! একেবারে চোরদের যুগ্যি ঘোড়া। তার সম্বন্ধে নানা গল্প আছে। তার সওয়ারও দশাসই লোক, একাএকি কে লড়বে তার সঙ্গে। তার এখনকার ঐ বংশধরদের মতো নয়, যারা ওখানকার ঐ দোতালা বড় বাড়ীতে থাকে।

এই মাছ-ধরিয়েকে দেখে দুই ভাই হাসল। তারপর ছোট ভাই ব্রায়ার গাছের পিছনে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকল — খুব জোরে নয়, খানিক সাবধানে:

'ইভান ভাসিলিয়েভিচ, তোমার সঙ্গে দাঁড়িপাল্লাটা আছে?'

সওদাগর দেখল ছেলেটা হাসছে, তাই ঠাট্টার জবাবে নিজেও করল ঠাট্টা:

'এই বনে দাঁড়িপাল্লা নেই। ওজন করার কিছু থাকলে তো।'

তারপর ইয়োর্শিকের রাশ টানল:

'কাজ যদি কিছু থাকে উঠে পড়ো, যেখানে যাবে সেখানে নামিয়ে দেব।'

ব্যাপারটা হল, এই ওর রেওয়াজ — ঘোড়াকে তৈরি রেখে কিনত সোনা। ইয়োর্শিকের ওপর তার ভরসা। কিছু এদিক-ওদিক হলেই বলত: 'ইয়োর্শিক — ছপ্‌টি খাবে!' অমনি কাদার ছিটে কিম্বা ধুলোর মেঘ ছাড়া আর কিছুই থাকত না।

ছেলেরা বলল, 'আমাদের কাছে এখন নেই।' তারপর জিজ্ঞেস করল:

'ইভান ভাসিলিয়েভিচ, কাল খুব সকালে কোথায় তোমার দেখা পাব?'

সওদাগর বলল, 'কী আছে তোমাদের — বেশ কিছু নাকি এক চিমটে?'

'কেন, তুমি কি জানো না...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, জানার তো কিছু জানি, কিন্তু সবটা না। জানি না তোমরা দুজনেই তোমাদের স্বাধীনতা কিনতে চাও, নাকি গোড়াতে শুধু একজন।'

সে খানিক চুপ করে রইল, তারপর — যেন সাবধান করে দিল:

'সাবধান, ছেলেরা, ওরা তোমাদের ওপর নজর রাখছে। সোচেনকে দেখেছিলে?'

'বা, দেখব না কেন।'

'আর সর্দারকে?'

'তাকেও দেখেছি।'

'সম্ভবত তারা অন্যদেরও পাঠিয়েছে। যাদের গরজ আর কি। জানে সকালের মধ্যেই তোমাদের টাকার দরকার, তাই লুকিয়ে লক্ষ্য করছে। তোমাদের সাবধান করে দেবার জন্যেই বিশেষ করে এসেছিলাম।'

'অনেক ধন্যবাদ, তবে আমাদের নিজেদের চোখও খোলা আছে।'

'হ্যাঁ, জানি তোমাদের মাথায় বুদ্ধি আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও — সাবধান।'

'ভয় পাচ্ছ কি তোমার হাত থেকে ফসকে যাবে?'

'না, আমার ভয়ের কিছু নেই। আর কেউ তো কিনবে না । ভয় পাবে।'

'কী দাম দেবে?'

পিমেনভ অবশ্য দাম কমাল। হাজার হলেও বাজপাখি তো। জ্যান্ত মাংস ছাড়ে না!

বলল, ঐ দাম পর্যন্ত দিতে পারি, বিপদ আছে তো।'

দরদস্তুর হয়ে গেল। পিমেনভ ফিসফিস করে বলল:

'ভোর বেলায় বাঁধের পাশ দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যাব। তোমাদের তুলে নেব।'

লাগাম সে নাড়াল: 'চল, ইয়োর্শিক, সর্দারকে ধর!' তারপর চলে যাবার সময় ছেলেদের আরো জিজ্ঞেস করল:

'দুজনের জন্যে টাকা চাও, না একজনের?'

ছোট ছেলেটি বলল, 'জানি না, কতটা আনতে পারব। যাই হোক, বেশ কিছু টাকা এনো।'

সওদাগর গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল।

খানিকক্ষণ ছেলেরা চুপ করে রইল, তারপর ছোট ছেলেটি বলল:

'পিমেনভ ঠিক কথাই বলেছে, দাদা, হঠাৎ খুব বেশী টাকা দেখানো আমাদের উচিত হবে না। ফল খারাপ হতে পারে। তারা সব টাকা মেরে দেবে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু তাহলে কী করা যায়?'

'এটা করলে কেমন হয়? আবার আমরা গোমস্তার কাছে গিয়ে তোয়াজ করব কিছু কম নিতে। বলব, আমাদের সব সম্পত্তি বিক্রি করলেও চারশোর বেশী পাব না। মানে, একজনকে তো সে চারশোর বদলে খালাস দেবে, লোকেও ভাববে, আমাদের শেষ কড়িটা পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছি।'

বড় ভাই বলল, 'তা নয় হল। কিন্তু ভূমিদাস হয়ে কা'কে থাকতে হবে? মনে হচ্ছে, লটারি করা দরকার।'

তারপর ছোট ভাই তার দাদাকে মিষ্টি কথায় ভোলাতে শুরু করল:

'হ্যাঁ, লটারি করাটাই সবচেয়ে ভালো। তাহলে কারুরই নালিশ থাকবে না। সে আর বলতে... তবে একটা কথা। তোর একটা খুঁত আছে — একটা চোখ ভালো

নয়: গাফিলতি হলেও ওরা তোকে সৈন্যদলে পাঠাতে পারবে না, কিন্তু আমার তেমন খুঁত কোথায়? কিছু একটা হলেই দেবে পাঠিয়ে। তাহলে — স্বাধীনতার আশা শেষ। কিন্তু তুই যদি কিছুকাল সহ্য করিস, আমি কিছুদিনের মধ্যেই টাকা দিয়ে তোকে খালাস করব। বছর না যেতেই গোমস্তার কাছে যাব, আর যত টাকাই দাবি করুক না কেন দিয়ে দেব। তা নিয়ে ভাবনা করিস না। আমার কি বিবেক বলে কিছু নেই? রোজগার করেছি তো দুজনে মিলেই। না দিয়ে কী আর পারি?'

এই বড় ভাই পান্তেলেই, সাদাসিদে ভালোমানুষ। অন্যের দরকার হলে নিজের কামিজ গা থেকে খুলে দিতে পারত। তারপর তার সেই খুঁতটা, তার কানা চোখ, তার দরুন যেন মাটিতে মিশিয়ে থাকত, হয়ে উঠেছিল ভারি চুপচাপ, যেন সবাই তার চেয়ে ভালো আর বুদ্ধিমান। নিজের সম্বন্ধে একটা কথাও বলত না। মুখচোরা।

ছোট ভাইটা — কোস্‌ত্‌কা একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। গরিবির মধ্যে মানুষ হলেও তার চেহারাটা লম্বা, জোয়ান, দেখাবার মতো। একমাত্র দোষ — গাজর রঙা চুল, প্রায় একেবারে লাল। আড়ালে লোকে তাকে বলত লাল-চুল কোস্‌ত্‌কা। সেয়ানাও ছিল খুব। তার সঙ্গে যাদের কাজ-কারবার চলত, তারা বলত: 'কোস্‌ত্‌কার সব কথা বিশ্বাস করো না। কোনো কোনো ব্যাপার সে একেবারে চেপে যায়।' কারুর মন ভেজাতে হলে সে জানত ঠিক কীভাবে এগুতে হয়। ঠিক একটা বিড়ালের মতো, কেবলি গায়ে গা ঘষবে...

অল্পক্ষণের মধ্যেই ভাইয়ের মত সে করিয়ে ফেলল। তাই তার কথা মতোই সব কিছু হল। গোমস্তা যে-দাম চেয়েছিল তার চেয়ে একশো কমিয়ে দিল। পরের দিন কোস্‌ত্‌কা পেল স্বাধীনতার দলিল, আর বলে বেড়াতে লাগল তার ভাইয়ের জন্যেও ভালো ব্যবস্থা করেছে। পান্তেলেইকে গোমস্তা পাঠাল ক্রীলাতোভস্কোর খনিতে।

'তোর ভাই ঠিকই বলছে। এই ধরনের কাজ তোর জানা — বেশীর ভাগ বালি ধোয়ার কাজ। এখানেই হোক আর ওখানেই হোক আমার লোক দরকার। বেশ, তোকে দয়াই করা গেল। ক্রীলাতোভস্কোয় যা।'

এইভাবেই কোস্‌ত্‌কা ব্যাপারটা দাঁড় করাল। নিজেকে স্বাধীন করে ভাইকে

পাঠাল দূরের সোনার খনিতে। ঘরবাড়ী, জিনিসপত্তর বিক্রি করার কথা সে তো ভাবেই নি। সেটা শুধু ভান করেছিল।

পান্তেলেইকে তাড়াবার পর কোস্ত্কা চাইল রিয়াবিনভ্কায় যেতে। কিন্তু একা সে সামলাতে পারবে কী করে? একমাত্র উপায়, একজন লোক ভাড়া করা। কিন্তু তা করতে ভয় পেল। কোনো কথা ফাঁস হয়ে গেলে অন্যেরাও আসবে সেই জায়গায়। তাহলেও এ কাজের যুগ্যি একজন লোক সে পেল। লোকটা বোকা-সোকা। দশাসই চেহারা, কিন্তু দশ পর্যন্তও গুণতে পারে না। ঠিক যেমনটি কোস্ত্কার প্রয়োজন।

বোকা লোকটিকে নিয়ে সে কাজ শুরু করল, কিন্তু অল্প পরেই দেখতে পেল সে জায়গাটা নিঃশেষ হয়ে গেছে। ওপর-নীচ, এদিকে-ওদিকে সে চেষ্টা করল, কিন্তু সোনা পেল না। এখানে-সেখানে শুধু খানিকটা রঙ, ধোবার যুগ্যি নয়। কোস্ত্কা তাই ঠিক করল, নদী পেরিয়ে অন্য পারে গিয়ে সেই বার্চ গাছের তলায় চেষ্টা করবে, নাগ যেখানে থেমেছিল। জায়গাটা কিছু ভালো, কিন্তু পান্তেলেই তার সঙ্গে থাকলে যেমন মিলত তেমন মিলল না। তবু ওটা পেয়েই কোস্ত্কা খুসি। ভাবল নাগকেও ঠকাতে পেরেছে।

অন্যান্য সোনা-খুঁজিয়েরা দেখল কোস্ত্কা কোথায় গেছে। তারাও ভাবল ও পারে গিয়ে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করবে। তারাও বেশ কিছুটা পাচ্ছে বলে মনে হয়। তাই একমাসের আগেই সে জায়গায় ভিড় জমে উঠল। লোকে এল এমন কি অনেক দূর থেকেও।

সোনা-খুঁজিয়েদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিল। তারও চুল লালচে, পাতলা চেহারা। কিন্তু দেখবার মতো। সে কাছে থাকলে বৃষ্টির মধ্যেও যেন সূর্য উঠেছে মনে হয়। মেয়েদের ব্যাপারে কোস্ত্কার স্বভাব-চরিত্রও ভালো নয়। একেবারে যেন কোন গোমস্তা কিম্বা খোদ কর্তা। ভালো ঘরের কত মেয়েকে কোস্ত্কা কাঁদিয়ে ছেড়েছে। আর এতো একটা উঠকো খনির মেয়ে। কোস্ত্কা তাই তাড়া করে গেল বটে, তবে তার থোঁতা মুখ ভোঁতা হল।

মেয়েটির বয়েস কম, ধরন-ধারন সাধারণ, কিন্তু তার কাছে সে ঘেঁষতে পারল না। ভারি তেজী! একটা কথা বললে দুটো কথা সে শুনিয়ে দেয়, তাও টিটকারি

দিয়ে। আর তার গায়ে হাত তোলা — সে চেষ্টা না করাই ভালো। কোস্‌ত্‌কার অবস্থা তাই হল বঁড়শী-গেলা মাছের মতো।

মনমরা হয়ে থাকে, রাতে ঘুমতে পারে না। মেয়েটা তাকে তার কড়ে আঙুল দিয়ে নাচাত।

এমন অনেক মেয়ে আছে, যারা ও কাজ ভালো করেই পারে। ওটা যে তারা কোথা থেকে শেখে কে জানে? এমন মেয়ে দেখবে — যার গাল টিপলে দুধ বেরোয়, কিন্তু সেও এই সব ছলাকলা জানে। কোস্‌ত্‌কা বরাবরই প্রাণভরে তাদের বোকা বানিয়েছে, কিন্তু এবার সে সুর বদলাল।

বলল, 'তুমি আমাকে বিয়ে করবে? তাহলে আর কোনো দোষ থাকবে না, সবকিছুই হবে ন্যায্য আর আইন মাফিক... তোমার খালাসির টাকা আমি দেব।'

মেয়েটি শুধু তার উদ্দেশে হাসল:

'যদি তোমার ওরকম লাল চুল না থাকত তাহলে ভেবে দেখতাম।'

কথাটা কোস্‌ত্‌কার বুকে বিঁধল। লোকেদের লাল-চুল বলে ডাকটা সে পছন্দ করত না। তাহলেও কথাটা সে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল:

'আর তোমার বেলায় কী?'

সে বলল, 'সেই জন্যেই তোমাকে বিয়ে করতে আমার ভয়। আমার চুল গাজরের মতো, তোমারো লাল, ছেলেমেয়ে হলে যে বাড়ীতে আগুণ জ্বলবে।'

তারপর সে পান্তেলেইয়ের প্রশংসা করতে শুরু করল। তাকে সে সামান্য চিনত, ক্রীলাতোভস্কোর খনিতে তার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল।

'পান্তেলেই বললে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিয়ে করতাম। তাকে আমার মনে ধরেছিল। ভালো ছেলে। তার শুধু একটা চোখ থাকলেও সে চোখটা ভালো।'

কথাটা সে বলল ইচ্ছে করেই। কোস্‌ত্‌কাকে জ্বালাবার জন্যে। কোস্‌ত্‌কা কিন্তু সেটা বিশ্বাস করল। সে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল, ইচ্ছে হল পান্তেলেইকে সে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে। তাকে আরো রাগাবার জন্যে মেয়েটি বলে চলল:

'তা তোমার ভাইয়ের খালাসির টাকাটা দিচ্ছ না কেন? একসঙ্গে তোমরা সোনা ধুয়েছিলে, এখন তুমি স্বাধীন, আর তাকে পাঠিয়েছ দূর দেশে।'

কোস্ত্কা বলল, 'তার জন্যে আমি টাকা দিতে পারব না। নিজের টাকা নিজেই রোজগার করুক!'

'নির্লজ্জ তুমি, জোচ্চোর! পান্তেলেই কি তোমার চেয়ে কম খেটেছিল? খনি খোঁড়ার কাজেই কি সে চোখ হারায় নি?'

এতো সে রাগিয়ে তুলল যে কোস্ত্কা চেঁচিয়ে উঠল:

'খুন করব তোমায়, ছেনাল ছুঁড়ি!'

মেয়েটার কিন্তু গ্রাহ্যিই নেই।

বলে, 'তখন কী হবে জানি না, প্রাণ থাকতে তোমায় বিয়ে করব না। একে লাল-চুল, তাতে লোচ্চা — তার চেয়ে খারাপ আর কিছু নেই!'

এইভাবে সে কোস্ত্কাকে টিটকারি দিয়ে চলল, কিন্তু কোস্ত্কা তার পিছনে আরো বেশী করে লেগে রইল। মেয়েটি যদি তাকে লাল-চুল না বলত আর যদি তার দিকে তাকাত আরো একটু নরম চোখে, তাহলে সবকিছু তাকে সে দিয়ে দিত। কিন্তু তার কোনো উপহারই সে নেয় না... এমন কি খুব সামান্য জিনিসও নয়। কথার শলা দিয়ে তাকে সে বিঁধত:

'পান্তেলেইকে খালাস করার টাকার জন্যে ওটা বরঞ্চ জমিয়ে রাখো!'

তখন কোস্ত্কা ভাবল খনিতে একটা বিরাট ভোজ দেবে। ছেলেটা চালাক।

ভাবল: 'সবাই মাতাল হয়ে পড়লে কেউই লক্ষ্য করবে না কে কী করছে। আমি মেয়েটাকে ভুলিয়ে কোথাও নিয়ে যাব, তারপর দেখা যাবে পরের দিন সে কোন সুরে গায়।'

অবিশ্যি ব্যাপারটা নিয়ে লোকেরা নানা কথা বলাবলি করল:

'আমাদের লাল-চুলের হল কী? নিশ্চয়ই একটা ভালো জায়গা খুঁজে পেয়েছে। যেখানে সে কাজ করছে সেখানে চেষ্টা করে দেখা যাক।'

এই সব ভাবল বটে, কিন্তু বিনা পয়সার ভোজ কে ছাড়ে? সেই মেয়েটিও এল। নাচতে গেল কোস্ত্কার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। লোকে বলত, সে ভারি হালকা পায়ের নাচিয়ে। কোস্ত্কার মাথা একেবারে ঘুরে গেল।

কিন্তু সে তার মতলবটা ভুলে নি। সবাই যখন বেশ ভালো করে মদ গিলেছে, মেয়েটিকে সে ধরতে গেল। কিন্তু মেয়েটি এমন চোখে তার দিকে তাকাল যে তার

হাত ঢিলে হয়ে গেল, কাঁপতে লাগল তার পা। কেমন ভয় পেল সে। মেয়েটি তখন বলল:

'লাল-চুল, নির্লজ্জ। পান্তেলেইয়ের খালাসির টাকা দেবে?'

কথাটা কোস্‌ত্‌কার গায়ে যেন ফুটন্ত জলের মতো পড়ল। দারুণ রেগে উঠল সে।

চেঁচিয়ে বলল, 'না, দেব না! বরং মদ খেয়ে শেষ কপেকটা পর্যন্ত ওড়াব!'

মেয়েটি বলল, 'তোমার যা ইচ্ছে। আমার যা বলবার বলেছি। মদ খাওয়ার কথা যদি বলো, সে বিষয়ে তোমাকে আমরা সাহায্য করব।'

নাচতে নাচতে সে চলে গেল। নিজের শরীর সে বাঁকাতে-চোরাতে লাগল সাপের মতো, কিন্তু চোখ হয়ে রইল স্থির, পাতা পড়ে না। তারপর থেকে কোস্‌ত্‌কা সেধরনের ভোজ দিতে লাগল প্রায় প্রতি সপ্তাহেই। তাতে খরচ তো কম নয়, জনা পঞ্চাশেক লোক, তাদের মদ খাইয়ে মাতাল করতে হবে তো। সোনা-খুঁজিয়ে লোকেরা মদও গিলতে পারে খুব। কৃপণ হবার চেষ্টা করে লাভ নেই, তাহলে সবাই হাসাহাসি করবে, বলবে:

'কোস্‌ত্‌কার ভোজে খালি মগ শেষ করে সমস্ত সপ্তাহ ধরে মাথা ধরে আছে। পরের বার সঙ্গে করে গোটা দুই বোতল নিয়ে যাব। সেই ভালো হবে না?'

কোস্‌ত্‌কা তাই চেষ্টা করত, যাতে মদ-টদ, খাবার-দাবার প্রচুর থাকে। হাতে যে-টাকা ছিল দেখতে দেখতে তা খরচ হয়ে গেল। আর সোনা সে পাচ্ছিল সামান্যই। যতই খুঁজুক না বালি আর চকচক করে না। যে-বোকা লোকটা তার সঙ্গে কাজ করত সেও বলল:

'কর্তা, মনে হচ্ছে এখানে আর ধোবার কিছু নেই।'

সেই মেয়েটি তাকে শুধু কথা দিয়ে বিঁধে চলল।

'কী লাল-চুল, অবস্থা পড়ে গেছে? বুটজোড়ার গোড়ালি তো ক্ষইয়ে ফেলেছ। এখন কি মুচিকে দেবার মতো পয়সাও নেই?'

কোস্‌ত্‌কা অনেক দিন থেকেই টের পাচ্ছে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, নিজেকে কিন্তু সে সামলাতে পারল না। ভাবল: 'দাঁড়াও-না, তোমায় দেখাব মুচিকে দেবার মতো আমার টাকা আছে কিনা...'

একতাল সোনা অবিশ্যি তার আর পান্তেলেইয়ের ছিল। বুঝতেই পারছ, পুঁতে রেখেছিল মাটিতে। তাদের সব্জীবাগানে, মাটির অনেক তলায়। ওপরের মাটি খুঁড়লে পাওয়া যায় বালি আর কাদা... জায়গাটা অবিশ্যি তারা ভালো করে চিহ্নিত করে রাখে, মাপজোপের মধ্যে এক ইঞ্চিরও ভুল ছিল না। কোনো দিন ধরা পড়লে খনির পাহারাদাররাও তাদের কিছু করতে পারত না। তারা বলত: 'সোনার তাল? কে কবে ভেবেছে এখানে সোনা আছে? অনেক দূর দূর জায়গায় আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর এটা কিনা পড়ে রয়েছে আমাদের নিজেদের বাগানের মধ্যে!'

মাটির ভাঁড়ার, বলতে কি, সবচেয়ে খাসা, তবে সেখান থেকে তুলে আনা — সেটা ভারি ফ্যাসাদের কাজ। খুব ভালো করে চারিদিকে নজর রাখা দরকার। কিন্তু তাও তারা ভালো করে ভেবে রেখেছিল। স্নানের ঘরের পিছনে তারা লাগায় ঝোপঝাড়, পাথর রাখে একগাদা, মানে, বাইরে থেকে দেখা কঠিন।

বেশ অন্ধকার দেখে এক রাতে কোস্‌ত্‌কা তার লুকোনো জায়গাটায় গেল। ওপরের মাটি সরিয়ে এক টবে বালি ভরে সে নিয়ে এল স্নানের ঘরের মধ্যে। জল সে মজুত রেখেছিল। জানালা বন্ধ করে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে বালি ধুতে সে শুরু করল। কিন্তু কিছুই খুঁজে পেল না, একদানাও সোনা নেই। ভাবল, কী ব্যাপার? ভুল করেছি কি? আবার সে বেরুল, সবকিছু মাপল, তারপর মাটি খুঁড়ে আরেক টব ভরল। একটা কণাও দেখা গেল না। কোস্‌ত্‌কা সবরকম সাবধানের কথা ভুলে গেল, একটা লণ্ঠন নিয়ে ছুটে বেরুল। সবকিছু আবার পরীক্ষা করল। সবকিছুই ঠিক রয়েছে। একেবারে ঠিক জায়গায় সে গর্ত করেছে। তাই সে শুরু করল আরো বেশী করে গর্ত করতে। ভাবল, হয়তো তত বেশী খুঁড়ি নি। এবার দু'এক দানা পাওয়া গেল। সে আরো গভীর করে খুঁড়ল। কিন্তু ঘটল একই ব্যাপার — শুধু সামান্য আভাস। কোস্‌ত্‌কা তখন প্রায় পাগল হয়ে উঠল। একটা ডাণ্ডা পুঁততে শুরু করল, খনিতে লোকে যেমন করে। কিন্তু বেশী দূর এগুবার আগেই পেল নিরেট পাথর। সেটা দেখে সে খুসি হয়ে উঠল, পাথরের ভিতর দিয়ে নিশ্চয় নাগ সোনা নিয়ে যেতে পারে নি। নিশ্চয়ই সেটা কাছাকাছি কোথাও আছে। তারপর হঠাৎ কথাটা ঝলসে উঠল তার মনে: 'পান্তেলেই ওটা চুরি করেছে!'

কথাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ সেহ মেয়েটি, সেই সোনা-খুঁজিয়ে মেয়েটি দেখা দিল তার সামনে। চারিদিক অন্ধকার। কিন্তু তাকে সে স্পষ্ট দেখতে পেল, যেন দিনের বেলা দেখছে। গর্তের পাশে সে দাঁড়িয়ে। লম্বা, খাড়া, কোস্‌ত্‌কার দিকে তাকিয়ে আছে কঠিন দৃষ্টিতে।

'কী লাল-চুল, হারিয়ে গেছে বুঝি? দোষ চাপাচ্ছ তোমার দাদার ঘাড়ে? সেই নেবে। তোমার কেবল দেখাই সার।'

'কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে, ঢিপ-চোখো ছেনাল ছুঁড়ি?'

মেয়েটির পা ধরে তাকে সে প্রাণপণে গর্তের মধ্যে ফেলতে চেষ্টা করল। মেয়েটির পা মাটি থেকে সরে গেল তবু সে রইল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর সে যেন আরো লম্বা আর সরু হয়ে সাপ হয়ে গেল, নামতে লাগল তার কাঁধের উপর বেঁকে পিঠ বেয়ে। দারুণ ভয় পেয়ে কোস্‌ত্‌কা ছেড়ে দিল তার ল্যাজ। সাপটা তার মাথা দিয়ে পাথরের উপর ছোবল মারতেই ফুলকি ছড়িয়ে পড়ল, আলো হয়ে উঠল চোখ ধাঁধানো।

তারপর সাপটা চলে গেল পাথরের ভিতর দিয়ে, তার যাবার পথে চম্‌কাতে লাগল সোনা, দানা দানা আর তাল তাল। অঢেল সোনা। দেখেই কোস্‌ত্‌কা মাথা ঠুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাথরটার উপর। পরের দিন তার মা তাকে পেল গর্তটার মধ্যে। মনে হল না তার মাথায় খুব বেশী চোট লেগেছে। অথচ কেন জানি মারা গেছে কোস্‌ত্‌কা।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে ক্রীলাতোভস্কো থেকে পান্তেলেই এল। তাকে ছুটি দেওয়া হয়। বাগানের মধ্যে সেই গর্ত দেখে সে আন্দাজ করল যে সোনাটা খোয়া গেছে। খুব মন খারাপ হয়ে গেল তার। আশা করেছিল সেই সোনা দিয়ে সে খালাস পাবে। কোস্‌ত্‌কার নানা দুর্নাম তার কানে এসেছিল, তাহলেও বিশ্বাস করেছিল তার খালাসির টাকা দেবে। একবার দেখবার জন্যে সে গেল, ঝুঁকে পড়ল গর্তটার উপর, আর মনে হল যেন তলা থেকে একটা আলো তার দিকে জ্বলজ্বল করছে। গর্তটার নীচে পুরু কাঁচের গোল জানালার মতো কিছু একটা রয়েছে। সেই কাঁচে জড়িয়ে রয়েছে সোনার একটা পথ। একটি মেয়ে নীচে দাঁড়িয়ে, সেই কাঁচের ভিতর থেকে পান্তেলেইয়ের দিকে তাকাচ্ছে। তার চুল লাল, চোখ কালো, এমন

চোখ যে তাকাতে ভয় হয়। মেয়েটি কিন্তু হাসছিল আর সেই সোনার পথের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছিল যেন বলতে চায়: 'ঐখানে রয়েছে তোমার সোনা, নিয়ে নাও। ভয় পেয়ো না।' বলছে যেন ভালো মনেই, অথচ কোনো কথাই শোনা যাচ্ছে না। তারপর আলোটা অদৃশ্য হল।

প্রথমে পান্তেলেই ভয় পেল। ভাবল, ভূত দেখেছে। কিন্তু তারপর সাহসে ভর করে গর্তের ভিতর নামল। দেখে কোনো কাঁচই নেই, শুধু শাদা পাথর, কোয়ার্ট্জ্। কর্তার খনিতে পান্তেলেই এই পাথর ভাঙত। এতে সে অভ্যস্ত, জানত কী করতে হবে। ভাবল:

'চেষ্টা করে দেখি। হয়তো সত্যি সত্যিই ওখানে সোনা আছে।'

ফিরে গিয়ে দরকারী যন্ত্রপাতি এনে সেই জায়গায় পাথরটা ভাঙতে লাগল যেখানে দেখেছিল সোনার পথটা। আর সত্যিই সোনা বেরুল সেখানে, শুধু দানা দানা নয়, তাল তাল, একটা ভালো স্তর। সন্ধের মধ্যেই পান্তেলেই পাঁচ বা ছ' পাউণ্ড আসল সোনা পেল। লুকিয়ে সে গেল পিমেনভের কাছে। তারপর গোমস্তার দপ্তরে।

'আমার খালাসির টাকা দেবার জন্যে এসেছি।'

গোমস্তা বলল:

'তা ভালো কথা। তবে এখন আমার সময় নেই। সকাল বেলা এসো। তখন ধীরেসুস্থে কথা বলা যাবে।'

কোস্ত্কা যেভাবে দিন কাটিয়েছিল, তাতে, বুঝতেই পারছ, গোমস্তা আন্দাজ করেছিল নিশ্চয়ই তার বেশকিছু টাকা আছে। তাই সে ঠিক করে পান্তেলেইকে যথাসাধ্য দুয়ে নেবে। কিন্তু পান্তেলেইয়ের কপাল ভালো, দপ্তর থেকে একটা লোক এল দৌড়তে দৌড়তে।

'পেয়াদা এসেছে। কর্তা সিসের্তে আছেন, তিনি এখানে পেঁছবেন কাল সকালে। তিনি বলে পাঠিয়েছেন পোল্দ্নেভনায়া পর্যন্ত সমস্ত পথ যেন মেরামত করা থাকে।'

সম্ভবত গোমস্তার ভয় হয় সবকিছুই বুঝি ফসকে যায়, তাই পান্তেলেইকে বলল:

'পাঁচশো দাও, কিন্তু দলিলে লিখব চারশো।'

এইভাবে একশো সে পকেটস্থ করল। তবে পান্তেলেই দরাদরি করল না।

ভাবল: 'কুকুর, যত পারো পেট ভরে খাও, একদিন দম আটকে মরবে।'

তা খালাস হল পান্তেলেই। বাগানের গর্তটার মধ্যে সে আরো খানিক খুঁড়ল। তারপর কিন্তু সোনা-খোঁজা সে একেবারে ছেড়ে দিল।

ভাবল: 'সোনা ছাড়াই শান্তিতে থাকব।'

ঘটলও ঠিক তাই। একটা খামার সে কিনল। খুব বড় নয়, কিন্তু তাতে তার চলে যেত। শুধু আরো একটি ব্যাপার ঘটে। সেটা ঘটে যখন সে বিয়ে করে।

মানে, এক চোখ কানা তো। তাই খুব বাছবিচার না করে গরীব, সাধারণ, নরম স্বভাবের একটি মেয়েকে সে পছন্দ করে। বিয়ে হল কোনো ঘটা না করে।

পরের দিন তার নওলা বউ নিজের বিয়ের আংটি দেখে ভাবে:

'কী করে এটা পরি? কী মোটা আর সুন্দর, নিশ্চয়ই অনেক দাম। হারিয়েও ফেলতে পারি।'

স্বামীকে সে বলল:

'আচ্ছা, পান্তেলেই, তুমি কী, বলো তো, টাকা বাজে খরচ করো? আংটিটার দাম কত?'

পান্তেলেই বলল:

'খরচ আবার কী, ওই যে রেওয়াজ। আংটির জন্যে দিয়েছি দেড় রুবল।'

বৌ বলল, 'না, কিছুতেই তা বিশ্বাস করব না।'

পান্তেলেই সেটার দিকে তাকিয়ে দেখে যে, এ আংটি তো সে-আংটি নয়। নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল তার আঙুলেও রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের একটা আংটি। মাঝখানে দুটো ছোট ছোট কালো পাথর, যেন চোখ জ্বলজ্বল করছে।

বুঝতেই পারছ, পাথরগুলো দেখেই সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল সেই মেয়েটির কথা, যে তাকে দেখিয়েছিল পাথরের মধ্যে সোনার পথ। কিন্তু সে-সম্বন্ধে কোনো কথা তার বৌকে সে বলল না।

'খামকা ভয় পাইয়ে দিয়ে কী হবে?'

তাহলেও, তার বৌ সে আংটি পরত না। নিজের জন্যে সে কিনে একটা সস্তা দামের। আর চাষী, তার আবার আংটির দরকার কী? বিয়ের দিনগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত পান্তেলেই নিজেরটা পরে, ব্যস সেই পর্যন্তই।

কোস্‌ত্‌কার মৃত্যুর পর সোনার খনিতে লোকের টনক নড়ল:

'আরে, সেই মেয়েটি কোথায়, যে অমন সুন্দর নাচত?'

কিন্তু মেয়েটির দেখা আর পাওয়া গেল না।

এ ওকে জিজ্ঞেস করত — কোথা থেকে এসেছিল মেয়েটি? কেউ বলত কুঙ্গুরকা, কেউ বলত ম্রামোর থেকে। মানে, নানান কথা। জানো তো, সোনা-খুঁজিয়েরা সর্বদাই ঘুরে বেড়ায়। কে তুমি, কোন বংশ, সে-কথা ভাববার সময় কোথায়। তাই মেয়েটির আলোচনা থেমে গেল।

সোনা কিন্তু রিয়াবিনভ্‌কায় পাওয়া গিয়েছিল আরো অনেক কাল ধরে।

ঝাব্‌রেইয়ের পথ

সোই-ব্রদে এখন যেখানে ইস্কুল, আগে সেখানে ছিল খানিকটা পড়ো জমি। জায়গাটা বেশ বড়, সবাই দেখছে, কিন্তু কেউই সেটা চাইত না। জায়গাটা বেশ উঁচুতে। সেখানে সব্জীবাগান করা মানে অনেক মেহনত, পাওয়াও যেত সামান্য সব্জী। লোকে তাই সেটা ব্যবহার করত না, তারা সহজ আর সুবিধের জায়গা খুঁজত।

লোকে বলে একসময়ে সেখানে কিন্তু একটা বাড়ী ছিল। ভাঙা-চোরা ধরনের, তাতে দুটো জানালা। সেই জানালাদুটো এমন ঝুঁকে পড়ে যে মনে হত এই বুঝি পাহাড়ের গা দিয়ে ডিগ্‌বাজি খেয়ে পড়বে। ছিল একটা সব্জীক্ষেত, স্নানের ঘর। একটা ছোট ধরনের খামার বলা যেতে পারে। অবাক হওয়ার মতো কিছু না, কিন্তু তবু লোকে জানত। সবাই সে কুটীরটা ভালো করে চিনত।

এক সোনা-খুঁজিয়ে থাকত সেখানে। লোকে তাকে ডাকত নিকিতা ঝাব্‌রেই বলে। লোকটার বয়েস হয়েছে, তবে কথায় যেমন বলে, চুলপাকা ছোকরা। ছেলেরা তাকে বাস্তবিকই দাদু বলে ডাকতে পারত, কিন্তু তখনো তার গায়ে অনেক তাকত। খুব কম লোকই পারত তার মতো কাজ করতে। সুন্দর পুরুষালী চেহারা, তবে এমন মুখবোজা, যেন কখনোই কথা বলতে শেখে নি। স্বভাবটা খেঁকি ধরনের — না ঘাঁটানোই ভালো। থাকত সে একলা। লোকে তাকে যে খেঁকি ঝাব্‌রেই বলে ডাকত তার কারণ ছিল।

এই ঝাব্‌রেই লোকটা সাধারণত কাজ করত একলা। নতুন নতুন জায়গা খুঁজে বেড়াত, — মাঝে মাঝে পেতও। তারপর গ্রামে ফিরে লোকেদের সে-কথা বলত:

‘শোনো হে, অমুক জায়গায় কিন্তু সোনা দেখা যাচ্ছে।’

সত্যিই, সেই সব জায়গায় কাজ করে লাভ ছিল। মাঝে মাঝে দেখা যেত বাস্তবিকই অনেক সোনা। লোকে বলত ঝাব্‌রেইয়ের মধ্যে একটা রহস্য আছে। প্রায়ই দেখা যেত টাকা তার অনেক। কেউই দেখে নি কোথায় পেয়েছে। তাহলেও একটা গুজব ছিল, যারা লুকিয়ে কিনত সেই সব চোরাব্যাপারীদের সে বিক্রি করত সোনার তাল। আর তালের গড়নও ছিল একই, গাছের ছালের জুতোর মতো ছোট, কিন্তু ভারি। এই এক আশ্চর্য ব্যাপার — তালের প্রত্যেকটাই আগেরটার চেয়ে বড়। প্রথমটার ওজন হয়তো এক পাউন্ড, তারপর ক্রমশ ভারি আর ভারি। কিন্তু সবগুলোই দেখতে ঠিক জুতোর মতো!

চোরাব্যাপারী আর সোনা-খুঁজিয়েরা খুবই জানতে চাইত কোথা থেকে ঝাব্‌রেই সেই সোনার জুতো পায়। কিন্তু কোনো ফল হয় নি। নিকিতা জানত তার ওপর তারা নজর রেখেছে। সে ছিল ভারি সেয়ানা। এই সব পিছু-নেওয়া লোকগুলোকে সে এখানে-সেখানে সারা দিন চরিয়ে বেড়াত। তারপর অন্ধকার হতেই বনের মধ্যে ঢুকে হত উধাও। রাত্রির অন্ধকারে বনের কোথায় সে গিয়েছে, একবার খুঁজে দেখ-না!

লোকে তার বৌয়ের কাছ থেকে কথা বার করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয় নি। বৌয়ের ধরনও ছিল স্বামীর মতো। বুড়ির সারা গায়ে যেন কাঁটা, দস্তানা না পরে ছোঁয়া যায় না। আর জিভটাও ধারাল। বিনা কারণে যারা আসত তাদের সে চৌকাট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতে দিত না। গোঁফে চাড়া দিয়ে কেউ 'নমস্কার, দিদিমা!' বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে বলে উঠত:

'আর কী কথা আছে? কেন এসেছ?'

সে অবিশ্যি, বুঝতেই পারছ, আমতা-আমতা করতে শুরু করত:

'দুজনে মিলে কেমন আছ আর কি? ভালোই চলছে তো?'

সে বলত, 'এই চলে যাচ্ছে। কারুর কাছে আমরা যাই না, আমাদের কাছেও কাউকে আসতে বলি না। না ডাকতে যারা আসে তাদের মুখে ঝাঁটার বাড়ি।'

এমন লোকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে একবার দেখো-না!

মাঝে মাঝে ভালোমানুষের বৌরা কোনো কিছু ধার করার জন্যে আসত। নানাভাবে তাদের সে বিদায় করত। কাউকে সোজা তাড়িয়ে দিত:

'তোমার জন্যে কিছুই তুলে রাখি নি, আর কখনো এসো না!'

অন্য কাউকে হয়তো কোনো কথা না বলেই যা চাইত দিত — খানিকটা ময়দা কিম্বা মাখন, কিম্বা আলু, কিম্বা যা হোক কিছু, কখনোই তা ফেরৎ চাইত না। কিন্তু দরকারের বেশী একটা কথাও সে বলত না। মেয়েটি গালগল্প করার জন্যে গুছিয়ে বসতে গেলেই ঝাব্‌রেইয়ের বৌ বালতি আর ঘরমোছার ন্যাকড়া তুলে নিত:

'বাড়ী যাও, স্তেপানিয়া! তোমার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রয়েছে। আমার চেয়েও তোমার কাজ বেশী। আমি তো, দেখো, মেঝে ধোয়া শুরু করতে যাচ্ছি। আর তুমি বসেই রয়েছ, যেন কোনো কাজই নেই।'

এইভাবে ঝাব্‌রেই আর তার বৌ থাকত, কারুর সঙ্গেই মিশত না।

মাঝে মাঝে অবিশ্যি ঝাব্‌রেইকে আর্টেলেও* কাজ করতে হত। লোকেদের কোনো নতুন জায়গা দেখাবার সময় ঐ কাজ সে করত। তাকে পেয়ে লোকে খুসি হত। দুজন, এমন কি তিনজন লোকেরও কাজ সে করত। সোনা সম্পর্কে তার অনেক জানোশোনা। ওরকমের লোক নিতে কে আপত্তি করবে? কিন্তু বেশী দিন তাদের সঙ্গে সে থাকত না। পান থেকে চুন খসার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ছেড়ে সে চলে যেত। জানোই তো, আর্টেলে কত কী ঘটে। কাজ নিয়ে হয় ঝগড়া, কিম্বা কারো জুচ্চুরি ধরা পড়ে, হয়তো কেউ বেশ শিক্ষাও পায়; ঝাব্‌রেইয়ের এসব বরদাস্ত হত না। খানিকক্ষণ সে গালাগালি শুনত, তারপর ঘেন্নার সঙ্গে বলত:

'জলার মশা আবার ভন্‌ভন্‌ করতে শুরু করেছে! কেউ যদি তা শুনতে চায় তো শুনুক। আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে!'

থুথু ফেলে সে কুড়িয়ে নিত তার গাঁতি আর কোদাল, পিঠের উপর ঝুলিয়ে দিত তার পাত্র আর থলি, তারপর চলে যেত। এমন কি নিজের বেতন নিতেও আসত না।

একবার ওভাবে সে চলে গেল। অনেকদিন ধরে ফিরল না। লোকে যখন ভাবতে শুরু করেছে সে মরে গেছে, এমন সময় হঠাৎ তাকে দেখা গেল। সেদিন ছিল

* আর্টেল — ছোট ছোট সমবায় সমিতি। — অনুঃ

ট্রিনিটি, যখন সব নদী আর স্রোত কূল ছাপিয়ে ওঠে। সে যেন তলা থেকে আবার তীরে ভেসে এল।

লোকে বলে, সেটা ছিল দুর্বৎসর। সামান্যই সোনা পাওয়া যাচ্ছিল। সোনা-খুঁজিয়েদের অবস্থা তাই খুব খারাপ। মস্তো পরবের দিন আসছে, আর এদিকে ফুর্তি করার কিছুই নেই। গজ্‌গজ্‌ করে লোকে ভাবছিল কোথায় অন্তত এক গেলাশ মদ পাওয়া যায়। এমন সময় পোলেভায়ার পথ ধরে নতুন পোষাক পরে ঝাব্‌রেইকে আসতে দেখা গেল। তার পকেটে যে-টাকা আছে ওটা তার স্পষ্ট চিহ্ন, সমস্ত গ্রাম জুড়ে এবার ভোজ আর ফুর্তি শুরু হবে।

হলও তাই। নিকিতা সোজা চলে গেল শুঁড়িখানায়। দোকানদারনীর টেবিলের উপর এক গাদা রুবল রেখে বলল:

'উলিয়ানা, গেলাশ ভরে যাও যতক্ষণ না এরা গড়াগড়ি যায়। কোনো মশাই যেন না ভন্‌ভন্‌ করে এই বলে যে নিকিতা ঝাব্‌রেই সোনা রেখেছিল তার ঝুলিতে, কাউকেই তা দেখায় নি। চেয়ে দেখো — এই নাও!'

টেবিলের উপর ক্রমাগত সে রুবল ঢেলে চলল।

লোকে জানত নিকিতা ভোজ দিলে বেশ ভালো করেই দেয়, যতক্ষণ না শেষ রুবলটাও খরচ হয়ে যাচ্ছে। তাই সমস্ত গ্রামের লোক এল দৌড়ে। কেউ কেউ এল শুধু এই কথা ভেবে — যদি কেউ মদ খাওয়ায় তাহলে কেন খাব না? কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই সেয়ানা, ভাবল, ঝাব্‌রেই কি আর বকবক করতে শুরু করবে না, হয়তো তার মুখ ফসকে সেই জায়গাটার কথা বেরিয়ে পড়বে, যেখানে গাছের ছালের জুতোর মতো সোনার তাল পাওয়া যায়। কিন্তু ঝাব্‌রেই তার মাত্রা জানত। যতটা দরকার পান করে টেবিলের উপর আরো কিছু টাকা রেখে দোকানদারনীকে সে বলল:

'আপত্তি না করে ঢেলে যাও, উলিয়ানা। পুরুষদের দিও ভোদকা, আর মেয়ে, বৌদের দিও লাল মদ। যত খেতে পারে। এই টাকায় না কুলোলে আরো দেব, আর এই টাকা যদি বেশী হয় তাহলে বাড়তিটা তুমি রেখে দিও। কাল সকাল থেকে কিন্তু অন্য হিসেব।'

দোকানদারনী এত খুসি হয়ে উঠল যে আহ্লাদে আটখানা — এক হাত দিয়ে মদ ঢালে, অন্য হাত দিয়ে রুবল জড়ো করে, ঝুঁকে পড়ে কুর্নিশ করে ঝাব্‌রেইকে — যেমন বলেছ সেই রকমই হবে — স্বামীর কানে ফিসফিস করে বলে:

'ভাটিখানায় গিয়ে আরো দুটো পিপে নিয়ে এসো, নইলে কুলোবে না।'

যেমন সে বরাবরই করে, শুঁড়িখানা থেকে ঝাব্‌রেই সোজা গেল দোকানে। তার জন্যে তারা বহুকাল ধরে অপেক্ষা করছিল। দোকানদার খুব চালাক। গ্রামটা ছোট, কিন্তু দোকানটায় মজুত থাকত দামী-দামী জিনিস, কোনো সোনা-খুঁজিয়ের হঠাৎ কপাল ফিরলে সে তা কিনবে — যদিও গ্রামের লোকের তা সত্যিকারের কোনো কাজে লাগবে না।

সেগুলোর মধ্যে থেকে নিকিতা তার বুড়ি বৌয়ের জন্যে বাছল একটা শাল, সত্যিকারের সুন্দর, বকলেশ দেওয়া জুতো, খানিকটা সিল্ক, আর যাকিছু তার চোখে ধরল। নিজের জন্যেও নতুন জামাকাপড় কিনে দোকানদারকে সে বলল:

'এগুলো আমার বৌয়ের কাছে নিয়ে যাও। বলো, নিকিতা ইয়েভসেয়েভিচ তাকে সেলাম জানাচ্ছে আর তোমাকে বলতে বলেছে সে বেঁচে বর্তে আছে, শীগ্‌গীরই বাড়ী আসছে। বাঁধাকপির পিঠে আর ক্বাস তৈরি করে রাখো। অন্তত দু'টিন।'

দোকানদার ছুটে গেল। বেঞ্চির উপর নিকিতা বসে রইল তার ফেরার অপেক্ষায়। ফিরলে জিজ্ঞেস করল:

'কী ব্যাপার?'

'কী আবার, জিনিসগুলো দিয়ে এসেছি।'

'বুড়ি কী বলল?'

'জিনিসগুলো এক কোণে ছুঁড়ে ফেলল, কিন্তু কোনো কথা বলল না।'

তার কথা নিকিতা বিশ্বাস করল না:

'না, কোনো কথা না বলে স্বামীর উপহার নেবে, এ হতেই পারে না।'

তখন দোকানদার বলল:

'শুধু তিন কথা বলেছিল।'

নিকিতা প্রশ্ন করল, 'কী কথা?'

'জিনিসগুলো নেবার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: ওহ, বুড়ো বোকা!'

নিকিতা হেসে উঠল:

'ঠিক বলেছ! বুড়ির স্বভাবই এই। তার মানে, সব ভালোই আছে, তাড়াতাড়ি বাড়ী যাবার দরকার নেই। এবার ছেলেমেয়েদেরও একটু খুসি করি। ঝুড়িটা নিয়ে এসো!'

দোকানদার জানত কী ব্যাপার। সে ঝুড়ি এনে জিজ্ঞেস করল:

'কতটা ওজন করব, আর কী?'

'চোখ দিয়ে ওজন করো, এটা যেন ভরে যায়! সব ধরনের যেন থাকে। শুধু কাগজে মোড়াগুলোই। খোলা যেন না থাকে।'

দোকানদার তো, না ঠকিয়ে পারে না। সস্তার লজেন্স ঢালল বেশী করে, দামীগুলো দিল অল্প, কিন্তু দামটা হিসেব করল উল্টোভাবে। নিকিতা তর্ক করল না। টাকা দিয়ে ঝুড়ি নিয়ে সে এল বাইরের সিঁড়িতে। সমস্ত গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েরা এসেছিল। তারা কিন্তু দরজার কাছে ছিল না, খেলছিল একটু দূরে। কেউ খেলছিল বল নিয়ে, আর মেয়েরা খেলছিল তাদের নিজেদের খেলা। ঝাব্‌রেইয়ের স্বভাব তারা জানত: তার জন্যে তাদের অপেক্ষা করে থাকতে দেখলে ঝুড়িটা সে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। তাই ছেলেমেয়েরা দেখাত যেন তারা কিছুই জানে না, হঠাৎ যেন এসেছে খেলা করতে।

নিকিতা দেখত তার জন্যে কেউ অপেক্ষা করে নেই। তখন লজেন্স চারিদিকে মুঠো মুঠো ছড়াতে শুরু করত। ছেলেরা সচরাচর লজেন্স তো পেত না। ছুটে আসত তারা, শুরু হত দারুণ ধাক্কাধাক্কি। কেউ হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে পড়লে কিম্বা কোনো দুজনের মাথায় ঠোকাঠুকি লাগলে ঝাব্‌রেই শুধু হাসত। কিন্তু তারা যখন ঝগড়া আর মারামারি করতে শুরু করত, ঝুড়িটা ফেলে দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলত:

'মশাদের ছানারা দেখছি নিজেরাও মশা!'

মুখ কালো করে সে বাড়ী যেত। পাহাড়টায় চড়ে মাটির ঢিবির উপর বসে সে গোঁ গোঁ করত। ওরকম অবস্থায় তার কাছ থেকে দূরে থাকাই ভালো, যেকোনো লোককেই সে পারত ঘুষি মেরে ফেলে দিতে। শুধু সেই বুড়ি পারত তাকে সামলাতে।

13—1115

ঝাব্‌রেইয়ের ভোজের দরুন সমস্ত গ্রামে খুব হৈচৈ হত, এখানে গান, ওখানে নাচ। ঝাব্‌রেই কিন্তু নিজে বসে থাকত সেই ঢিবিটার উপর। গুনগুন করত:

'মশা, তোরা সব মশা, মশাদের রাজত্ব।'

রাত হয়ে গেলে বুড়ি এসে তাকে নিয়ে যেত ঘরে। ঘুমিয়ে সে চাঙ্গা হয়ে উঠত। সকাল বেলায় ব্যাপারটা আবার গোড়া থেকে শুরু করত। প্রথমে যেত শুঁড়িখানায়, তারপর তার বৌয়ের জন্যে নতুন কাপড়চোপড় আর ছেলেমেয়েদের জন্যে লজেন্স। মাঝে মাঝে নতুন নতুন জিনিসপত্রে বুড়ি একটা কোণ ভরে তুলত। তারপর টাকা ফুরিয়ে গেলে সেই দোকানদারের কাছে সেগুলো সে বিক্রি করে দিত। তাকে দেওয়া প্রতি দশ কপেক দামের বদলে বুড়ি পেত এক কপেক। যেটা দোকানদার বিক্রি করে পঞ্চাশে সেটা সে কিনে নিত পাঁচ দিয়ে, আর যেটা বিক্রি করে দশ দিয়ে — তার বদলে দিত এক।

ছেলেরা যখন লজেন্সের জন্যে মারামারি না করে হুড়োহুড়ি করত, ঝাব্‌রেই তখন সন্ধে পর্যন্ত থাকত গ্রামে। অন্যান্যদের সঙ্গে গান গাইত, নাচত, কিন্তু বাড়ী যেত একলা, কাউকে তার চাই না। কেউ তার সঙ্গে লেগে থাকলে ঝাব্‌রেই দিত তাকে ফিরিয়ে:

'বন্ধু, তুমি কিন্তু পাহাড়ে এসো না। সেটা পছন্দ করি না।'

এইভাবে টাকা না ফুরনো পর্যন্ত ভোজ চলত। কিন্তু এবার প্রথম দিনেই ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়াল।

নিকিতা তার লজেন্স ভরা ঝুড়িটা বার করে ছড়াতে শুরু করল। ছেলেমেয়েদের মধ্যে একজন ছিল, যার নাম অনাথ দেনিস্কো। তার বয়েস খুব বেশী নয়। কিন্তু চেহারাটা লম্বা। তার বয়েসী অন্যান্য ছেলেরা তার পিছনে লাগত:

'দেনিস্কো, নীচু হয়ে শরীরটা দু'ভাঁজ করে ফেল, তাহলে মাথায় আমরা সবাই সমান সমান হব!'

ছেলেটা অনাথ বলে বহুকাল বালি বইত। কিন্তু তার চেহারার জন্যে অধিকাংশ লোকেই তাকে মনে করত বুঝি বড় হয়ে উঠেছে। তাহলেও তখনো তার মন ছোট ছেলের মতো। ঝাব্‌রেইয়ের কাণ্ডকারখানা দেখতে তারও ইচ্ছে হয়েছিল। তাই অন্যদের সঙ্গে সে আসে দোকানের কাছে, ভাব দেখায় যেন খেলা করছে। ছেলেরা সবাই

লজেন্সের জন্যে দৌড়ে এসে ধাক্কাধাক্কি করতে লাগল, দেনিস্কো কিন্তু শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। নিকিতা সেটা লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠল:

'এই লিকলিকেটা, তুই লুফতে পারিস না?' বলে সে এক মুঠো লজেন্স দেনিস্কোর দিকে ছুঁড়ে দিল। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা সেগুলোর জন্যে গেল দৌড়ে, কিন্তু দেনিস্কো নিজে সামান্য সরে গেল যাতে ধাক্কা খেয়ে না পড়ে। নিকিতা তখন তাকে জিজ্ঞেস করল:

'তোর কী হয়েছে, দেনিস্কো? পিঠ ব্যথা করছে?'

ছেলেটি বলল, 'না, পিঠ ঠিকই আছে, কিন্তু এসব আমার জন্যে নয়। আমি বড় হয়ে উঠেছি।'

নিকিতা বলল, 'যদি তুই বড় হয়েই উঠেছিস তাহলে শুঁড়িখানায় যা, অন্তত শুধু লাল মদ খেয়েও আমার স্বাস্থ্য পান কর!'

দেনিস্কো বলল, 'মা মরবার সময় আমাকে বলেছিলেন: যতদিন না দাড়ি পুরো গজায়, ততদিন এক ফোঁটাও ছুঁবি না। তারপর তোর যা ভালো মনে হয় তাই করিস।'

'বটে!' নিকিতা বলল। বাস্তবিকই সে আশ্চর্য হল। 'তুই তাহলে এটা নে!' সে কতকগুলো রুপোর রুবল ছুঁড়ে দিল। দেনিস্কো কিন্তু সেগুলো কুড়িয়ে নিল না। বলল:

'আমার এখন ভিক্ষের দরকার নেই। বড় হয়ে উঠেছি, নিজের রোজগারেই খাই।'

সে-কথা শুনে নিকিতা রেগে উঠল বৈকি। ছেলেদের সে চিৎকার করে বলল:

'সরে যা এখান থেকে। দেখব এই গরবীর জোর কত!'

ভিতরের পকেট থেকে এক বাণ্ডিল বড় বড় নোট বার করে সে দেনিস্কোর সামনে ধরল। কিন্তু দেখা গেল এ ছেলেটারও মনের জোর আছে। বলল:

'আমি তো বলেছিই ভিক্ষে করি না, কুকুর নই।'

একথা শুনে নিকিতা একেবারে ক্ষেপে উঠল, দাঁড়িয়ে রইল দেনিস্কোর দিকে চোখ রাঙিয়ে, তারপর পায়ের উঁচু বুটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ছেঁড়া ন্যাকড়া-জড়ানো একটা বাণ্ডিল টেনে বার করে তার ভিতর থেকে প্রায় পাঁচ পাউণ্ড ওজনের একটা সোনার তাল দেনিস্কোর পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলল ধপ করে।

'বেশী বড়াই করিস না! এবার কুড়িয়ে নিবি!'

কিন্তু দেনিস্কো, হয়তো গোঁয়ার্তুমির জন্যে, হয়তো সোনার তালটার আসল দাম জানত না, কুড়িয়ে নিল না। সেটার দিকে তাকিয়ে বলল:

'এমন তাল নিজে খুঁজে পেলেই আনন্দ, পরেরটা চাই না।'

তারপর সে ঘুরে চলে গেল। নিকিতা খানিক প্রকৃতিস্থ হয়ে দৌড়ে গিয়ে টাকা আর সোনার তাল কুড়িয়ে দেনিস্কোকে বলল:

'তাহলে তুই চাস কী?'

দেনিস্কো বলল, 'কিছু না। শুধু লোকের কাছে তুমি যে বড়মানুষি দেখাচ্ছ তাই দেখতে এসেছিলাম।'

বাচ্চার কাছ থেকে এমন কথায় নিকিতার আঁতে ঘা লেগেছিল, তাহলেও সে চুপ করে রইল। খানিক বাদে সে ডাকল:

'দেনিস্কো, ফিরে আয়!'

ছেলের দলও তার সঙ্গে চেঁচাতে লাগল:

'দেনিস্কো, তোর পিঠ বাঁকা! দেনিস্কো, তোর পিঠ বাঁকা!'

দেনিস্কো কান দিল না, শুধু ফিরে এসে সেখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নিকিতা তখন ফিসফিস করে বলল যাতে কেউ না শুনতে পায়:

'সকালে আমার মাথা যখন খানিক ঠাণ্ডা হবে তখন আসিস। হয়তো পিঁপড়েদের সেই পথ আমি তোকে দেখিয়ে দেব, তারপর তুই নিজে বুঝবি। যদি পাথরের ঠোঁট তোকে ভিতরে ঢুকতে দেয় তাহলে দেখবি গরম লোহা কিম্বা ভিজে কাঠের কোদাল দিয়ে এঁটেল মাটি সরানো সহজ। তারপর পাবি সোনার তাল।'

ছেলেটি বলল, 'বেশ, নিকিতা খুড়ো। পথটা আমাকে দেখিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ দেব।'

নিকিতা বলল, 'তোর ধন্যবাদের জন্যে নয় রে, তোর ভিতরে লোভ নেই। ওধরনের একজনকে বহুকাল ধরে খুঁজছি।'

এই বলে তারা বিদায় নিল। তারপর আর কখনো তাদের দেখা হয় নি।

ঝাব্‌রেই সোজা তার পাহাড়ে চলে গেল। গেল সে আস্তে আস্তে, যেন গভীরভাবে কিছু ভাবছে, মশাদের সম্বন্ধে সেদিন কোনো গান ধরল না। দাওয়ার উপর বুড়ি

বৌয়ের সঙ্গে তাকে বসে থাকতে দেখল লোকে। অনেকক্ষণ ধরে তারা সেখানে বসে রইল, অনেকক্ষণ ধরে ফিসফিস করে কথা বলল, নতুন বিয়ে করে লোকে যে-রকম করে। দেখে গ্রামের লোক অবাক হয়ে গেল।

'ব্যাপারটা দেখো একবার, ঝাব্‌রেই আর তার বুড়ি বৌয়ের কথা যেন শেষ হতেই চায় না। যেন আজ রাত্রেই ওরা মরবে।'

ঠাট্টাই করেছিল অবশ্য, কিন্তু কথাটা সত্যি হয়ে দাঁড়াল। সকালবেলা দোনিস্কো গেল ঝাব্‌রেইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। দেখল, দরজা সব ঠিকই আছে। ভিতরে কিন্তু সবকিছু হয়ে গেছে তছনছ — এটা ছুঁড়ে ফেলা, ওটা ওল্টানো, কতক জিনিস হয়েছে গুঁড়িয়ে ফেলা। ঘরের মাঝখানে পড়ে রয়েছে একটা ভারি শাবল, কিন্তু লোকজন কেউই নেই।

দোনিস্কো ভয় পেয়ে ছুটে গ্রামে ফিরে গিয়ে যা দেখেছে লোকদের বলল — ওখানে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। লোকেদের তখনো নেশা ভালো করে কাটে নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা দৌড়ে গেল সেই পাহাড়টায়। সবকিছু তারা ভালো করে দেখে ওপরওয়ালার কাছে খবর পাঠাল। কেউই কিন্তু মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারল না। শুধু বোঝা গেল — দারুণ মারামারি হয়েছে অন্ধকারের মধ্যে। তল-ভাঁড়ার খুব খোঁজাখুঁজি করেছে, কিন্তু কোণের জামাকাপড়ের ঢিপ ছোঁয় নি, বুড়ি সেগুলো যেভাবে ছুঁড়ে ফেলে, পড়ে রয়েছে ঠিক সেইভাবেই। রক্ত-টক্ত কিছু ছিল না, ঘরের পাশে কোনো পায়ের দাগও দেখা গেল না। জমিটা, জানো তো, শক্ত আর পাথুরে, তাতে পায়ের ছাপ পড়ে না। তাছাড়া গ্রামের সবাই সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছে, দাগ কিছু থাকলেও গেছে একাকার হয়ে।

বুঝতেই পারছ, কর্তারা সেই খালি বাড়ীটার জন্যে রাখলেন একজন প্রহরী, সব লোককেই জেরা করতে শুরু করলেন, কার কী বলার আছে।

কিন্তু দেখা গেল গ্রামের কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। কেউ কেউ মদ খেয়ে পড়েছিল মড়ার মতো। কেউ কেউ ছিল লোকের চোখের সামনেই। কেউ কেউ বলল কুঙ্গুরকা থেকে কোনো ডাকাতদল এসে এটা করেছে; যে-চোরাকারবারী লুকিয়ে সোনা কেনে তার লোকেদের গাঁয়ে দেখা গিয়েছিল। অনেকেই বলল, ঝাব্‌রেইয়ের উপর নজর রাখার জন্যে সে বহুবার লোক লাগিয়েছে। তবে

ওপরওয়ালাদের যে অত টাকা দেয়, তার ঘাড়ে দোষ চাপাবে কে? তাই সব দোষ চাপল অনাথ দেনিস্কোর ঘাড়ে। ডাকাতদলকে সে নিয়ে আসে। নিকিতা তাকে টাকা আর সোনার তাল দেখায়। সকালবেলা সে-ই তো সেখানে যায়। এতেই ব্যাপারটা প্রমাণ হয়ে গেল।

জঘন্য ব্যাপার বৈকি, হতভাগ্য ছেলেটিকে ধরে নিয়ে গেল জেলে, আটক করে রাখল অনেক বছর ধরে। এক ঢিলে দু'পাখিই মারা হল — রক্ষা করা গেল চোরাকারবারীকে, ধরা হল অপরাধীকে। তখনকার দিনে এই হত।

কিছু দিনের মধ্যেই লোকে দেনিস্কোকে ভুলে গেল। চোখের বাইরে গেলেই খনি-শ্রমিকদের মন থেকেও লোকে মুছে যায়। অনবরত কত লোক আসছে-যাচ্ছে। দেনিস্কোর নিজের বলতে কেউই ছিল না, কেই বা শোক করবে। দেনিস্কো তাই জেলে থেকে মনে মনে ভাবত, হয়তো ঝাব্‌রেই আর তার বুড়ি বৌকে লোকে খুঁজে পাবে, তারপর সবকিছু যাবে পরিষ্কার হয়ে।

শেষে দেনিস্কোকে ছেড়ে দেওয়া হল। ফিরল সে বড়সড় হয়ে। প্রথম সে জানতে চাইল নিকিতা আর তার বৌ সম্পর্কে কোনো কথা জানা গেছে কিনা, তাদের ঘরে কে আছে। নানা লোককে সে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারল না। পাহাড়টার উপর ঘরটার কোনো চিহ্ন পড়ে নেই। মালিক না থাকলে ঘর তো আর বেশী দিন টেঁকে না, এটা-সেটা করে লোকে নিয়ে যায়। তাছাড়া লোকে ভোলে নি যে ডাকাতরা তল-ভাঁড়ার খুঁজেছিল। তাই তারাও সবকিছু খোঁড়াখুঁড়ি করতে শুরু করে, সবকিছুই ভেঙে ফেলে। ঝাব্‌রেইয়ের কুঁড়েটা যেখানে ছিল সেখানে খানিক গর্ত আর একটা পড়ো জমি ছাড়া কিছুই পড়ে রইল না।

এতে ভারি দুঃখ হল দেনিস্কোর। দ্যাখো তো, সোনার ব্যাপারে বুঝ-সমুঝ লোক ছিল একজন। নিজে সে কখনো টাকা জমায় নি, সবকিছুই বিলিয়ে দিত। কোথায় সোনা পাওয়া যায় সেরকম নতুন নতুন জায়গা দেখাত লোককে। তার বুড়ি বৌ কারুরই কোনো ক্ষতি করে নি। কিন্তু কী রইল তাদের, শুধু পড়ো জমি আর গর্ত।

পাহাড়ে উঠে সে ভাবনায় ডুবে গেল। মনে পড়ল, পরের দিন আসতে বলে নিকিতা কী বলেছিল।

'পিঁপড়ের কোন পথের কথা সে বলেছিল? আর পাথরের ঠোঁটই বা কী?'

ভেবে ভেবে সে ঠিক করল:

'পিঁপড়ের পথ তো কতই আছে, কে বলতে পারে কোনটা আসল, কিন্তু পাথরের ঠোঁট খোঁজা যায়। কপালজোরে পেতেও পারি।'

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে সে একবার নীচের দিকে তাকাল। দেখে, সে বসে রয়েছে একটা পিঁপড়ে যাবার পথের ঠিক পাশেই। একেবারে সাধারণ, সেখান দিয়ে পিঁপড়ে চলেছে ধীরে ধীরে। কিন্তু সবাই চলেছে একই দিকে, কেউই উল্টো দিকে নয়। এটা দেনিস্কোর অদ্ভুত মনে হল। ভাবল: 'দেখা যাক, কোথায় তাদের সংসার।' তাই সেই পথ ধরে সে চলল। গেল সে অনেক অনেক দূরে। দেখল অদ্ভুত একটা জিনিস — মনে হল পিঁপড়েগুলো যেন ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে, আর যে-জায়গাটা খানিক ফাঁকা সেখানে তাদের পায়ের নীচে কি যেন চকচক করছে। কী ব্যাপার? দু'একটা পিঁপড়ে তুলে সে নজর করল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। সেগুলো এতো ছোট যে ভালো করে ঠাহর হল না। আরো এগিয়ে সে দেখল, পিঁপড়েগুলো যত দূরে যাচ্ছে তত বড় হয়ে উঠছে। আবার সে দেখার জন্যে একটাকে তুলে নিল। এবার দেখতে পেল তার প্রত্যেকটি ছোট ছোট পায়ে চকচকে ফোঁটার মতো কী যেন রয়েছে। দেনিস্কো অবাক হয়ে সেই পথ ধরে চলল। পৌঁছল এক ফাঁকা ডাঙায়। সেখানে মাটি ফুঁড়ে দুটো পাথর উঠেছে, দেখতে চ্যাপ্টা পিঠের মতো, একটার উপর আর একটা। ঠোঁট ছাড়া আর কিছু নয়।

পথটা সোজা গেছে সেই ঠোঁটের কাছে। পিঁপড়েগুলো সেই ডাঙায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে বড় হয়ে উঠতে লাগল। এতো বড় যে আর তুলতে ভয় হল। আর তাদের সবাইকার পায়েই সেই জুতো। তারা সেই পাথরের ঠোঁটের কাছে গিয়ে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। তাহলে ভিতরে যাবার একটা পথ নিশ্চয়ই আছে।

কাছ থেকে দেখার জন্যে দেনিস্কো এগিয়ে গেল। সেই ঠোঁটদুটো গেল খুলে, যেন তাকে গিলে ফেলতে চায়। তাতে সে ভয় পেয়ে গেল বৈকি। লাফিয়ে সে পিছনে সরে এল, কিন্তু ঠোঁটগুলো বন্ধ হল না, যেন সেগুলো অপেক্ষা করে রয়েছে। পিঁপড়েরা ক্রমাগত সোজা ভিতরে যেতে লাগল, যেন কিছুই নয়। দেনিস্কো খানিক

সাহস করে ভিতরটা দেখার জন্যে কাছে এল। দেখল পথ চলে গেছে নীচে একেবারে খাড়া। কিন্তু তার সবটাই এঁটেল মাটি। এমন কি সেটা পেরুতে পিঁপড়েদেরও খুব কষ্ট হচ্ছিল। মাঝে মাঝে তাদের জুতো যাচ্ছিল আটকে, কিন্তু একই রকমে নয়। কাদাটা হয়তো হঠাৎ একটাকে ধরে ফেলে, তখন সে জুতো ফেলে আরো সহজে দৌড়ে যায়। অন্যটা যায় বিনা বাধায়, সর্বক্ষণ বড় হয়ে উঠতে উঠতে। একটা পিঁপড়ে হয়তো ভিতরে গেল গুবরে পোকার আকারে, আর যেতে যেতে বড় হয়ে উঠল ভেড়ার বাচ্চার মতো, তারপর ভেড়ার মতো, তারপর বাছুরের মতো, আর তারপর ষাঁড়ের মতো। আর তারপর সেটা হয়ে উঠল একটা বড় পাহাড়ের মতো, প্রত্যেকটা জুতোর ওজন হয়ে উঠল এক পুদ কিম্বা আরো বেশী। যতক্ষণ না কাদাটা জুতো কেড়ে নেয় সেটা যায় ধীরে ধীরে, কিন্তু শেষ জুতোটা খুলে যাবার পরেই ছুটতে থাকে একেবারে শন্‌শন্‌ করে।

দেনিস্কো এবার বুঝল সেই সোনার জুতো কোথা থেকে আসত। তবু ভেবে আশ্চর্য হল এত বড় বড় পিঁপড়েদের নিকিতা ভয় পেত না কেন। এই সব সে ভাবছে, ওদিকে একের পর এক যাচ্ছে পিঁপড়ে, তারপর আর কেউ ঢুকল না।

ভাবল: 'ব্যাপারটা তাহলে এই। মাঝে মাঝে তারা আসা বন্ধ করে। কিন্তু কে জানে সেটা কতক্ষণের জন্যে।'

আঠালো মাটি থেকে খালি হাতেই ঐ জুতো তুলে নেওয়া যায়, ভাবল নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করবে, অন্তত ওপর-ওপর সামান্য খুঁড়বে। কিন্তু আবার গাঁতি ছাড়া কী করে সেই খাড়া পিছল ঢালু জায়গাটা দিয়ে উঠে আসবে, সেটা সে ভেবে পেল না। সে খুঁজতে শুরু করল কাছাকাছি একটা গাঁটওলা গাছের শুকনো ডাল-টাল পাওয়া যায় কিনা। দেখে ঝোপের মধ্যে একটা বালতি। খুব বড় নয়, কিন্তু চওড়া। তার পাশে পড়ে কাটা কাঠ, একটা গাঁতি আর দুটো কোদাল: একটা লোহার, অন্যটা কাঠের।

সোনার খনিতে দেনিস্কো কাজ করেছিল অল্প বয়েস থেকেই। সে জানত ওগুলোর কী কাজ। কোদাল, গাঁতি আর বালতিটা সে তুলে নিল, এক বাণ্ডিল কাঠ গুঁজে দিল তার কোমরবন্ধে, তারপর ফিরে গেল সেই ঠোঁটের কাছে — আর সেগুলো গেল বুজে। শুধু দুটো পাথর, একটার উপর একটা, কোনো পথই নেই।

দুঃখ হল, কিন্তু কী আর করা যায়? গাঁতি দিয়ে সেরকম পাথর তো তোলা যায় না। জিনিসগুলো যেখানে পেয়েছিল সেখানে রেখে আসার জন্যে সে ফিরে দাঁড়াল, এমন সময় হঠাৎ সেই ঠোঁট আবার গেল খুলে। মস্তো বড় হাঁ হরে খুলে গেল — একেবারে খাই-খাই। দেনিস্কো ভয় পেল না। কোনো রকম দ্বিধা না করে ভিতরে ঢুকে গেল। কাদার মধ্যে অবশ্য কোনো সোনার জুতো সে খুঁজে পেল না, সেগুলো ডুবে আছে নীচেকার বালিতে। কিন্তু যে জানে তার পক্ষে পাওয়া কঠিন নয়। সেই এঁটেল কাদা সরাবার জন্যে লোকে ব্যবহার করে একটা গরম লোহা কিম্বা একটা ভিজে কাঠের কোদাল, আর পিঠের টুকরোর মতো তা উঠে আসে। দেনিস্কো চটপট কাজে লেগে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা জায়গা পরিষ্কার করে শুরু করল তলার বালি থেকে সোনার জুতো জোগাড় করতে। অনেক সে পেল, কোনোটা বড়, কোনোটা ছোট। কিন্তু তারপর দেখল অন্ধকার হয়ে আসছে, ঠোঁটদুটো আসছে বুজে... ভাবল:

'বেশী লোভ করেছি। এত নিয়ে কী করব? একটা নেব নিকিতার শ্রাদ্ধের খরচের জন্যে, আর একটা নেব আমার জন্যে, তাহলেই যথেষ্ট।'

যেই না ভাবা, অমনি ঠোঁট আবার খুলে গেল। যেন বলতে চাইল: বাইরে যাও।

গাঁতি দিয়ে যেকোনো ঢালু জায়গা বেয়ে ওঠা সহজ।

মাটিতে গেঁথে ভর দিয়ে ওঠো না কেন। দেনিস্কো বাইরে এসে যেখানে জিনিসগুলো পেয়েছিল সেখানে রেখে দিল। সবচেয়ে ছোট জুতোটা সে ঢুকিয়ে দিল তার উঁচু বুটের মধ্যে। আর অন্যটা — নিকিতার যে-রকমের ছিল হুবহু সেই ধরনের — সেটাকে লুকিয়ে রাখল জামার ভিতরে। তারপর সোজা চলে গেল কুঙ্গুরকায়।

যে-চোরাকারবারীকে নিয়ে কথা উঠেছিল, তাকে সে খুঁজে বার করল, ধরল তাকে একলা। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করল:

'জুড়ি করার জন্যে দ্বিতীয় জুতোটা চান?'

জুতোটা পকেট থেকে বার করে তাকে সে দেখাল। সওদাগর ভারি খুসি হয়ে উঠল।

'কত দাম চাও?'

দেনিস্কো বলল:

'বিনা পয়সায় এটা দিয়ে দেব যদি আমাকে দেখাও কোথায় নিকিতা আর তার বুড়ি বৌকে লুকিয়ে রেখেছ।'

লোভী সওদাগর হুঁশিয়ারি ভুলে বলল:

'ম্রামোর খনির পুরনো খাদে তাদের ফেলে দিয়েছি।'

দেনিস্কো বলল, 'জায়গাটা দেখাও।'

তারা সেই খনির কাছে গেল। সওদাগর বলল:

'এটাই সেই জায়গা!'

'তাহলে নাও তোমার পাওনা!'

এই বলে দেনিস্কো ঘুরে দাঁড়িয়ে জুতোটা দিয়ে লোকটার কপালে মারল। সোনার তালটার ওজন তো প্রায় পাঁচ পাউন্ড। বুঝতেই পারছ, কষে সেটা কারো মাথায় পড়লে কী ঘটে?

শীগ্‌গীরই লোকেরা পেল সেই সওদাগরকে, পাশে তার সোনার জুতোটা — যেটা তার কপালে ছাপ রেখে যায়।

তারপর প্রায় সব জজই সেই জুতোর জন্যে কাঠ-গড়ায় দাঁড়ায়। জানো তো, প্রত্যেকেই চাইছিল ওটা নিজে মেরে নিতে। কিন্তু অন্যরা তাকে নিতে না দিয়ে নালিশ করে উপরওয়ালাদের কাছে — ও লোকটা চোর, ডাকাত, ওকে জেলে ভরা উচিত। এইভাবে চলতে চলতে ব্যাপারটা পেঁছিল সবচেয়ে বড় জজের কাছে। কী কর্তব্য সে বিষয়ে তিনি দু'বার ভাবলেন না। বললেন:

'ও জুতোটা বাড়ী নিয়ে গিয়ে এ্যাসিড দিয়ে পরীক্ষা করে দেখব খাঁটি সোনার কিনা?'

এই বলে তিনি সেই সোনার জুতো বাড়ী নিয়ে গিয়ে সিন্দুকের তলায় রাখলেন লুকিয়ে; তারপর পুরনো একটা মোমবাতি-দানীর অংশ নিয়ে সেটা খানিক পরিষ্কার করে ফিরিয়ে আনলেন। বললেন:

'এর মধ্যে একটুও সোনা নেই।'

সবাই অবিশ্যি দেখল, একেবারে পুকুর চুরি, কিন্তু প্রধান জজের বিরুদ্ধে নালিশ

করতে কেউই ভরসা পেল না। তিনি নিজে খুব খুসি হয়ে উঠলেন, বড়াই করলেন:

‘চালাকি করে ওদের চোখে বেশ ধুলো দিয়েছি। আমাকে যে প্রধান জজ করেছে, সে তো খামকা নয়।’

বাড়ী ফিরে তিনি সোজা গেলেন সেই সিন্দুকের কাছে। কিন্তু দেখা গেল যেন পোকায় কেটেছে। ভিতরে কিছুই নেই। কত খোঁজাখুঁজি করলেন, কিন্তু কোনো ফল হল না। ছিল একটা সোনার জুতো, এখন তার জায়গায় রয়েছে একটা ফুটো। তা দিয়ে আর কী হবে।

দেনিস্কোকেও খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া গেল না। বোঝাই যায়, চলে গিয়েছিল সাইবেরিয়া কিম্বা অন্য কোনো জায়গায়।

আর পাথরের ঠোঁট কোথায় থাকতে পারে তা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়। কেউ কেউ বলে কাছে-পিঠেই, কিন্তু সঠিক আমি জানি না।

আর যা জানি না, তা জানি না, বানিয়ে বলতে ভালোবাসি না। সেটা আমার অভ্যেস নয়।

আগুনী-নাচুনী

বার বনের মধ্যে এক ধুনির চারপাশে এক দল সোনা-খুঁজিয়ে বসেছে। তাদের চার জন বয়স্ক, পঞ্চমটি ছেলে। বছর আটেক বয়েস, বেশী নয়। লোকে তাকে ডাকত ফেদিউন্‌কা বলে।

ঘুমবার সময় অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। কিন্তু গল্পটা ছিল মনের মতো। মানে, আর্টেলে বুড়ো ছিল ইয়েফিম দাদু। ছেলেবেলা থেকেই সে মাটি থেকে সোনার দানা বেছে আসছে। জীবনে তার ঘটনা তো কম ঘটে নি। তাই সে বলছিল, অন্য সবাই শুনছিল।

ফেদিউন্‌কার বাবা ক্রমাগত বলছিল:

'তোর শুতে যাওয়া উচিত!'

ছেলেটি কিন্তু শুনতে চায়।

'বাবা, আর একটুখানি! আরো একটুক্ষণ থাকি!'

তারপরে তো... শেষ হল ইয়েফিম দাদুর গল্প। আগুন এখন আঙার হয়ে গেছে, তাহলেও সবাই সেটার দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

হঠাৎ ছোট্ট একটি মেয়ে তার ভিতর থেকে লাফিয়ে বেরুল — দেখতে ঠিক পুতুলের মতো, কিন্তু জীবন্ত। চুল তার লালচে, সারাফান নীল, হাতে একটা নীল রুমাল।

তাদের দিকে সে খুসি খুসি চাইল। ঝকঝক করে উঠল তার শাদা দাঁত। তারপর একটা হাত কোমরে রেখে অন্য হাতে নীল রুমাল তুলে সে নাচতে শুরু করল। আর কী হালকা আর সুন্দর যে সেই নাচ কী বলব! নিশ্বাস বন্ধ করে রইল সবাই। দেখে দেখে যেন কখনো আশ মিটবে না। সবাই তন্ময়, যেন ভাবনায় ডুবে আছে।

প্রথমে সে মেয়েটি আঙারের উপর ঘুরে ঘুরে নাচল। কিন্তু বোঝা গেল জায়গাটা তার পক্ষে খুব ছোট, তাই নাচল আরো বড় পাক দিয়ে। তার জায়গা করে দেবার জন্যে লোকেরা পিছিয়ে গেল। আরো এক পাক ঘুরে আসার পর সে হয়ে উঠল একটু বড়। সোনা-খুঁজিয়েরা আবার পিছিয়ে গেল। মেয়েটি আর এক পাক নেচে হয়ে উঠল আরো একটু বড়। তারা যখন আগুন থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে, মেয়েটি তাদের মধ্যে এবং চারিদিকে পাক দিয়ে ঘুরতে লাগল। তারপর সোজা বাইরে বেরিয়ে ঘুরে চলল নিটোল পাকে। তখন তার চেহারাটা হয়ে উঠল ফেদিউন্‌কার মতো বড়। লম্বা একটা পাইন গাছের পাশে দাঁড়িয়ে সে পা ঠুকল, ঝিকিয়ে উঠল তার দাঁত, নাড়াল তার রুমাল আর শীস দিয়ে উঠল:

'ফি-ই-ই-ট! ই-উ-উ-উ...'

অমনি একটা পেঁচা ডেকে উঠল, মনে হল সেটা যেন হাসছে, মেয়েটিও অদৃশ্য হল।

শুধু বয়স্ক লোকেরা থাকলে ব্যাপারটা সেখানেই চুকে যেত। প্রত্যেকেই হয়তো ভাবত:

'অনেকক্ষণ ধরে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকলে এরকমই ঘটে। চোখে সিড়সিড় করে। হয়রানিতে কত অদ্ভুত জিনিসই না ঠাহর হয়।'

ফেদিউন্‌কা কিন্তু তা ভাবল না। বাবাকে জিজ্ঞেস করল:

'বাবা, ও কে?'

বাবা বলল:

'একটা পেঁচা। তাছাড়া আবার কী? আগে কখনো পেঁচা ডাকতে শুনিস নি?'

'পেঁচাটার কথা বলছি না, পেঁচাদের চিনি। তাদের একটুও ভয় পাই না। কিন্তু ঐ মেয়েটি কে?'

'কোন মেয়েটি?'

'কেন, সেই মেয়েটি, যে আঙারের ওপর নাচছিল। তাকে জায়গা করে দেবার জন্যে তুমি আর সবাই পিছনে সরে গিয়েছিলে।'

তখন ফেদিউন্‌কার বাবা আর অন্য সবাই তাকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করল কী সে দেখেছে। ছেলেটি সে কথা বলল। একজন জিজ্ঞেসও করল:

'মেয়েটি কত বড় ?'

'প্রথমে ছিল আমার চেটোর মতো, কিন্তু শেষে হয়ে ওঠে প্রায় আমার সমান।'

লোকটা তখন বলল:

'ফেদিউন্‌কা, তোর মতো আমিও একই আশ্চর্য ঘটনা দেখেছি।'

তার বাবা আর অন্যান্যরাও একই কথা বলল। শুধু ইয়েফিম দাদু পাইপ চুষতে লাগল, একটা কথাও বলল না।

'আর দাদু, তুমি কী বলো ?'

'আমিও একই জিনিস দেখেছি। ভেবেছিলাম বুঝি শুধুই আমার কল্পনা। কিন্তু মনে হচ্ছে আগুনী-নাচুনীই এসেছিল।'

'আগুনী-নাচুনী আবার কে ?'

তখন ইয়েফিম দাদু তাদের সব কথা বলল।

'বুড়োদের কাছে শুনেছিলাম, এটা সোনার চিহ্ন — ছোট্ট একটি মেয়ের নাচ। নাচুনী দেখা দিলে সেখানে সোনা থাকে। খুব বেশী সোনা নয়, তবে বেশ ভারি। সোনার স্তরও নয়। সেটা থাকে মাটির মধ্যে মুলোর মতো। ওপরটা চওড়া, যত নীচে যাও সোনা তত আসে কমে, শেষে আর থাকেই না। একবার তুলে নিলে আর কিছুই থাকে না। শুধু মনে নেই কোথায় খুঁজতে হবে — নাচুনী প্রথমে যেখানে দেখা দেয় সেখানে , না যেখানে মাটির মধ্যে ঢুকে যায়।'

লোকেরা বলল:

'সেটা আমরা বার করে ফেলব। আগুন যেখানে জ্বালিয়েছিলাম সেখানে খুঁড়ব সকালে, তারপর চেষ্টা করব ঐ পাইন গাছের নীচেটায়। তখন বুঝতে পারব তুমি আমাদের শুধুই গল্প বলছ, না তার মধ্যে কোনো সত্যি আছে।'

এই বলে তারা ঘুমতে গেল। ফেদিউন্‌কাও কুঁকড়ে শুল, কিন্তু ক্রমাগত ভাবতে লাগল:

'পেঁচাটা কার উদ্দেশে হাসল ?'

ইয়েফিম দাদুকে জিজ্ঞেস করতে তার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সেই বুড়ো ততক্ষণে নাক ডাকাচ্ছে।

পরের দিন সকালে দেরি করে ফেদিউন্‌কার ঘুম ভাঙল। সে দেখল আগুন যেখানে ছিল সেখানে একটা বিরাট গর্ত। চারটে বড় পাইন গাছের তলায় সোনা-খুঁজিয়েরা দাঁড়িয়ে, আর তাদের চার জনেই একই কথা বলছে:

'এইখান দিয়ে মেয়েটি নীচে চলে যায়।'

ফেদিউন্‌কা চেঁচিয়ে উঠল:

'আহ্, কী বলছ! তোমরা ভুলে গিয়েছ! এই পাইন গাছটার কাছে নাচুনী থেমেছিল। আর এইখানটায় পা ঠুকেছিল।'

এই কথা শুনে লোকেরা বাস্তবিক ধাঁধায় পড়ল।

'পাঁচ জনে আছে, পাঁচটা জায়গা। দশ জন থাকলে দশটা জায়গা হত। শুধু সময় নষ্ট করছি। এটা ছেড়ে দেওয়াই ভালো।'

তা সত্ত্বেও তারা সবকটা জায়গাতেই চেষ্টা করে দেখল, কিন্তু কিছুই পেল না। ইয়েফিম দাদু ফেদিউন্‌কাকে বলল:

'মনে হচ্ছে তোমার কপাল খারাপ।'

এটা ছেলেটির মোটেই ভালো লাগল না। বলল:

'পেঁচাটাই সবকিছু পণ্ড করেছে। সে ডাক ছেড়ে হেসে আমাদের ভাগ্যকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

ইয়েফিম দাদু বলল:

'না, পেঁচাটা কোনো কারণ নয়।'

'সে-ই কারণ!'

'না, সে নয়!'

'সে-ই!'

এইভাবে তারা তর্ক করে চলল। শেষটায় অন্যরা তাদের দুজনকে নিয়ে হাসাহাসি করল। নিজেদের নিয়েও।

'বুড়োও জানে না, বাচ্চাও জানে না। আর আমরা হাঁদারাম ওদের কথায় কান দিয়ে সময় নষ্ট করছি!'

সেদিন থেকে লোকেরা বুড়োর নাম দিল 'সোনার মুলো ইয়েফিম' আর ছেলেটির নাম — 'আগুনী-নাচিয়ে ফেদিউন্‌কা'।

খনির ছেলেরা জানতে পেরে ছেলেটিকে শান্তিতে থাকতে দিল না। তাকে দেখলেই শুরু করত:

'নাচুনী ফেদিউন্‌কা! নাচুনী ফেদিউন্‌কা! মেয়েটার গল্পটা বল-না!'

লোকে তাকে যেকোনো নামেই ডাকুক না কেন, বুড়ো লোকটি তাতে কিছু মনে করত না। তাকে তারা হাঁড়ি বলে ডাকতে পারে, আগুনের উপর না চাপালেই হল। কিন্তু ফেদিউন্‌কা ছেলেমানুষ, তাকে তারা যে ঠাট্টা করছে এটা তার ভালো লাগত না। ঝগড়া মারামারি করত সে। কয়েকবার কেঁদেও ফেলেছে। তাতে কিন্তু ছেলের দল তাকে আরো বেশী ঠাট্টা করত। খনি থেকে বাড়ী ফেরাই দায় হত। তারপর আরো একটা ব্যাপার ঘটল। আবার বিয়ে করল তার বাবা। সৎমাটি একেবারে ভালুকীর মতো হিংস্র। তাই যাকে বাড়ী বলা যায় সেরকম কোনো বাড়ী তার রইল না।

ইয়েফিম দাদুও সোনার খনি থেকে ঘন ঘন বাড়ী যেত না। সমস্ত সপ্তাহের খাটুনির পর সে পড়ত ক্লান্ত হয়ে, তার বুড়ো পাদুটোকে আর বেশী সে খাটাতে চাইত না। আর বাড়ীতে যাবেই বা কার কাছে। থাকত একা। তাই শনিবার এলে অন্যেরা যখন গ্রামে যেত, বুড়ো লোকটি আর ছেলেটি দুজনে থাকত সেখানে।

কিন্তু দুজনে করবে কী? নানা কথাবার্তা বলত। ফেদিউন্‌কাকে ইয়েফিম দাদু বলত সে যাকিছু দেখেছে আর শুনেছে সেসব কথা, আর তাকে সেই চিহ্নগুলো শেখাত যেগুলো থেকে বোঝা যায় সোনা কোথায় আছে — এই ধরনের সব জিনিস। আগুনী-নাচুনীর কথাটাও তাদের মনে পড়ত। সবকিছুই চলছিল ভারি সুন্দর আর মিলেমিশে। শুধু একটি ব্যাপারে তাদের মিল হত না। ফেদিউন্‌কা বলত পেঁচাটার দোষেই তারা সোনা পায় নি, আর ইয়েফিম দাদু বলত এ ব্যাপারে পেঁচাটার কোনো হাত ছিল না।

একদিন এটা নিয়ে আবার তাদের তর্ক শুরু হল। দিনটা শান্ত, আকাশে সূর্য। কিন্তু গুমটিতে তারা আগুন জ্বালাল, আগুন বলতে কিছু নয়, শুধু ধোঁয়া, মশা তাড়াবার জন্যে। ছোট্ট একটি শিখা, কিন্তু প্রচুর ধোঁয়া। সেটার দিকে যখন তারা চেয়ে আছে ছোট্ট একটি মেয়ে বেরুল তার ভিতর থেকে। অন্যবার তারা যেরকম

দেখেছিল ঠিক সেই রকমই। শুধু মেয়েটির সারাফান আর রুমাল আরো গাঢ় রঙের। হাসি হাসি চোখ নিয়ে তাদের দিকে সে তাকাল, ঝকঝক করে উঠল তার দাঁত, সে রুমাল নাড়িয়ে পা ঠুকে শুরু করল নাচতে।

প্রথম সে ঘুরল ছোট একটি চক্রে, তারপর সেই চক্র ক্রমশ হয়ে উঠতে লাগল বড়, নিজেও। গুমটিতে আটকাবার কথা, কিন্তু তার কোনো বাধা হল না। যেন গুমটি নেই। ক্রমাগত চক্রাকারে সে নেচে চলল। ফেদিউন্‌কার মতো বড় হয়ে উঠল সে, থামল গিয়ে বিরাট একটা পাইন গাছের তলায়। সে হাসল, মাটিতে পা ঠুকল, নাড়াল তার রুমাল আর শীস দিয়ে উঠল:

'ফি-ই-ই-ট! ই-উ-উ-উ...'

সঙ্গে সঙ্গে একটা পেঁচা ডেকে হেসে উঠল। ইয়েফিম দাদু অবাক হয়ে গেল:

'সূর্য এখনো আকাশে, পেঁচা এল কোত্থেকে?'

'দেখলে তো? আবার পেঁচাটা আমাদের সৌভাগ্যকে ভয় পাইয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। সম্ভবত ঐ পেঁচার কাছ থেকেই নাচুনী এসেছে পালিয়ে।'

'কেন, তুমি কি নাচুনীকে দেখেছিলে?'

'কেন, তুমি দেখো নি?'

কে কী দেখেছে সে-কথা বলাবলি করল ওরা। দেখা গেল, হুবহু এক জিনিসই দেখেছে, শুধু সেই জায়গাটা ছাড়া, যেখানে আগুনী-নাচুনী পা ঠুকে। তাকে তারা দেখে বিভিন্ন পাইন গাছের তলায়।

বলাবলি করে ইয়েফিম দাদু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল:

'এ-হে-হে! মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত এটা কিছুই না। আমাদের শুধু কল্পনা।'

কথাটা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যে-ঘাস দিয়ে গুমটির ছাদটা ছাওয়া হয় সেখান থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া আসতে লাগল। দৌড়ে তারা দেখল যে-খুঁটিটার উপর সবকিছু ভর করে রয়েছে সেটায় গেছে আগুন ধরে। ভাগ্য ভালো, তাদের কাছেই জল ছিল। তাই অল্পক্ষণের মধ্যেই আগুনটা তারা নিবিয়ে ফেলল। দাদুর দস্তানা ছাড়া আর কোনো জিনিসেরই ক্ষতি হয় নি, দস্তানা সামান্য পুড়ে যায়। ফেদিউন্‌কা সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে দেখল তাদের মধ্যে আগুনে পুড়ে যে-গর্ত হয়েছে সেই

14—1115

গর্ত হুবহু ছোট ছোট পায়ের আকারের। এই আশ্চর্য ব্যাপারটা ইয়েফিম দাদুকে সে দেখাল:

'হয়তো বলবে এটাও কল্পনা?'

এটার বিরুদ্ধে বলার কোনো কথাই ইয়েফিম খুঁজে পেল না।

'তোমার কথাই ঠিক, ফেদিউন্‌কা। আগুনী-নাচুনী যে এখানে এসেছিল এটা তার খাঁটি চিহ্ন। সকাল বেলা আমাদের খুঁড়তে হবে, পরখ করতে হবে আমাদের ভাগ্য।'

রবিবার তারা সেই কাজে কাটাল। তিনটে গর্ত খুঁড়ল, কিন্তু সোনার কোনো চিহ্নই দেখতে পেল না। ইয়েফিম দাদু বিলাপ করে বলল:

'ভারি খারাপ আমাদের ভাগ্য, লোকেরা হাসাহাসি করবে।'

ফেদিউন্‌কা আবার পেঁচাটাকে দোষ দিল:

'ঐ ঢিপ-চোখোটা ডেকে আর হেসে আমাদের সৌভাগ্যকে তাড়িয়েছে। ইচ্ছে হচ্ছে লাঠি পেটা করি।'

সোমবার সকালে সোনা-খুঁজিয়েরা গ্রাম থেকে ফিরে গুমটির পাশেই নতুন খোঁড়া গর্ত দেখল। সঙ্গে সঙ্গে কারণটা অনুমান করে সেই বুড়ো লোকটির উদ্দেশে হাসতে লাগল:

'আমাদের 'মুলো' মুলো খুঁড়ছিল!'

তারপর তারা দেখল গুমটিতে আগুন ধরেছিল। তাদের দুজনকে খুব বকাবকি করতে লাগল। ফেদিউন্‌কার বাবা ভালুকের মতো ছেলেটির দিকে ছুটে এসে মারতে যাচ্ছিল, কিন্তু ইয়েফিম দাদু তাকে থামাল:

'ছেলেটাকে মারতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত! এমনিতেই সে বাড়ী যেতে ভয় পায়, কারণ তাকে চতুর্দিক থেকে সবাই ঠাট্টা করে, আর তার পিছনে লাগে। দোষটা কি তার? আমি এখানে ছিলাম। তোমাদের কিছু লোকসান গেলে আমাকে দোষ দাও। আমার পাইপটা নেভবার আগেই হয়তো ঝেড়েছিলাম, তাই থেকেই আগুন ধরে হয়ত। দোষটা আমার, জবাবদিহিও আমারই।'

ফেদিউন্‌কার বাবাকে সে বকল। কিন্তু পরে কেউ যখন সেখানে ছিল না, ছেলেটিকে সে বলল:

'এহ্ ফেদিউন্‌কা, ঐ নাচুনী আমাদের নিয়ে তামাসা করছে। আবার তাকে দেখতে পেলে তার মুখে থুথু ফেলাই ভালো। লেকেদের যেন আর ভুল পথে না নিয়ে যায়, হাস্যাস্পদ না করে!'

ফেদিউন্‌কা কিন্তু তখনো ক্রমাগতই একগুঁয়ের মতো তার মত ধরে রইল:

'দাদু, সে ইচ্ছে করে এটা করে না। পেঁচাটা তাকে বাধা দেয়।'

ইয়েফিম বলল, 'সে তুই বোঝ। তবে আমি আর গর্ত খুঁড়তে যাচ্ছি না। যথেষ্ট হয়েছে, নাচুনীর পিছনে ছোটার মতো বয়েস নেই।'

বুড়ো গজগজ করল, কিন্তু আগুনী-নাচুনীর জন্যে দুঃখ হল ফেদিউন্‌কার।

'দাদু, ওর ওপর রাগ করো না। দ্যাখো না কী রকম সে ভালো আর সুন্দর। পেঁচাটা বাধা না দিলে সে আমাদের ভাগ্য খুলে দিত।'

ইয়েফিম দাদু সেই পেঁচাটা সম্বন্ধে কিছু বলল না, কিন্তু সেই নাচুনীকে নিয়ে ক্রমাগত গজরাতে লাগল:

'চমৎকার ভাগ্য সে আমাদের দিয়েছে! এমন কি বাড়ী যেতে আমাদের লজ্জা করে।'

যতই কেন না দাদু গজরাক, ফেদিউন্‌কা তার মত ছাড়ল না:

'দাদু, যখন সে নাচে তখন তাকে কী সুন্দর দেখায়!'

'সে নাচে তো সুন্দর, কিন্তু তাতে আমাদের লাভ কী? তাকে দেখতেও আমার ইচ্ছে নেই।'

'পারলে এখনই তাকে আবার দেখি,' ফেদিউন্‌কা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর প্রশ্ন করল, 'আর দাদু, তুমি — তুমি কি পিছন ফিরে থাকবে? দেখতে কি ভালো লাগে না?'

'কেন লাগবে না?' বুড়ো লোকটির মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেল। তারপর কিন্তু নিজেকে সামলিয়ে ফেদিউন্‌কাকে আবার বকতে শুরু করল। 'তুই একগুঁয়ে ছেলে, ওহ্ কী একগুঁয়ে! একবার মাথায় কিছু ঢুকলে তা থেকে আর নিস্তার নেই। আমার মতোই তুই হবি, সমস্ত জীবন ধরে ছুটবি সৌভাগ্যের পিছনে। সেটা হয়তো শুধুই আলেয়া, আর কিছু নয়।'

'কিছু নয় মানে, আমি তো মেয়েটিকে নিজের চোখে দেখেছি?'

'বেশ, ওর পিছনে যত খুসি ছোট, কিন্তু আমি থামলাম। অনেক ছুটেছি। পা ধরে গেছে।'

যতই তারা তর্ক করুক না কেন তাদের বন্ধুত্ব কিন্তু ঘুচল না।

কাজের সময় ইয়েফিম দাদু ফেদিউন্‌কাকে শেখাত, তাকে দেখিয়ে দিত সব কায়দাগুলো, আর বিশ্রামের সময় তাকে গল্প বলত কী সব জিনিস সে দেখেছে আর করেছে। মানে শেখাত কী করে বাঁচতে হয়। খনিতে তারা যখন একলা থাকত, সেই দিনগুলিই হত সবচেয়ে ভালো।

শীতে সোনা-খুঁজিয়েদের বাড়ী ফিরে আসতে হল। আগামী বসন্ত পর্যন্ত গোমস্তা তাদের যাকে যেমন পেল কাজে ঢোকাল, শুধু ফেদিউন্‌কাকে ছাড়া। তখনো সে নেহাৎ বাচ্চা, তাই তাকে বাড়ীতে রেখে যাওয়া হল। কিন্তু বাড়ীর জীবন তো সুখের ছিল না। তারপর হল নতুন বিপদ — কারখানায় তার বাবা জখম হল, তাই তাকে নিয়ে যাওয়া হল রুগীদের ঘরে। মড়ার মতো সেখানে সে পড়ে রইল। তারপর তার সৎমা হয়ে উঠল একেবারেই ভালুক। দিনে-রাতে কখনোই ছেলেটাকে সে শান্তি দিত না। যতদিন পারল সে সহ্য করল, তারপর বলল:

'আমি যাচ্ছি ইয়েফিম দাদুর সঙ্গে থাকতে।'

তার সৎমার কী এসে যায়?

সে চেঁচিয়ে উঠল, 'তাহলে দূর হ, দূর হ! ইচ্ছে হলে তোর সেই নাচুনীর কাছে যা!'

ফেদিউন্‌কা তাই তার ফেল্টের জুতো পরল, পাতলা ভেড়ার চামড়ার কোটটা যত কষে পারল নিজের গায়ে আঁটল। তার বাবার গরম টুপিটা নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তার সৎমা দিল না। তাই নিজেরটাই পরল, যদিও তার পক্ষে সেটা খুব ছোট। তারপর চলে গেল।

যেই না সে বাইরে বেরিয়েছে অমনি ছেলেমেয়ের দল ঠাট্টা করতে করতে তার পিছনে ছুটে এল:

'নাচুনী ফেদিউন্‌কা! নাচুনী ফেদিউন্‌কা! মেয়েটার গল্পটা বল-না!'

ফেদিউন্‌কা সোজা এগিয়ে চলল। শুধু বলল:

'এহ্‌ বোঝে না এখনো!'

তাই শ্বনে ছেলেমেয়েদের খানিক লজ্জা হল। ভালোভাবে তাকে জিজ্ঞেস করল:

'কোথায় চললি?'

'ইয়েফিম দাদ্বর কাছে।'

'সোনার ম্বলোর কাছে?'

'কারো কাছে ম্বলো, আমার কাছে দাদ্ব।'

'সে তো অনেকদ্বরের পথ! তুই হারিয়ে যাবি।'

'পথ আমি চিনি।'

'তাহলেও তুই জমে যাবি। এখন ঠাণ্ডা, তোর দস্তানাও নেই।'

'আমার দস্তানা নেই বটে, কিন্তু হাত আছে। আর আছে জামার হাতা। জামার হাতার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে গরম হয়ে উঠবে। কথাটা তোদের মাথায় আসে নি, তাই না?'

ফেদিউন্‌কা যেভাবে কথা বলছিল ছেলেদের সেটা বেশ লাগল, তাই তারা আবার তাকে প্রশ্ন করতে শ্বর্ব করল ভালো মনেই:

'ফেদিউন্‌কা, সত্যিই আগ্বনের মধ্যে তুই নাচুনীকে দেখেছিলি?'

'আগ্বনের মধ্যেও দেখেছি, ধোঁয়ার মধ্যেও দেখেছি,' ফেদিউন্‌কা বলল, 'হয়তো আবার তাকে দেখতে পাব কোথাও, কিন্তু এখন সেকথা তোদের বলার একেবারেই সময় নেই।' এই বলে সে নিজের পথ ধরল।

ইয়েফিম দাদ্ব থাকত কসোই-ব্রদে, কিম্বা হয়তো সেভেরনাতে। লোকে বলে তার কুটীর ছিল একেবারে গ্রামটার পাশে। জানালার সামনে ছিল একটা প্বরনো পাইন গাছ। পথ বহ্ব দ্বর। আর ঠাণ্ডাটাও প্রচণ্ড। শীতকালের একেবারে মাঝামাঝি সময়। অল্প সময়ের মধ্যেই ফেদিউন্‌কার হাড়ে কাঁপ্বনি ধরে গেল। কিন্তু না পেঁাছনো পর্যন্ত থামল না। সবে সে ছিটকিনি খ্বলতে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ শ্বনতে পেল:

'ফি-ই-ই-ট! ই-উ-উ-উ...'

ফিরে তাকিয়ে সে দেখল পথের উপর তুষার কণা পাক দিচ্ছে। তার মাঝখানে তুষারের ঢেলা। দেখতে অনেকটা সেই নাচুনীর মতো। ফেদিউন্‌কা দৌড়ল দেখার জন্যে, কিন্তু সেখানে পেঁাছবার আগেই সেটা চলে গেল অনেক দ্বরে। সেটার পিছন

পিছন ছুটতে ছুটতে শেষে পেঁাছল একেবারে অচেনা জায়গায়। ফাঁকা মতো জায়গাটা, চারিদিকে গভীর বন। মাঝখানে একটা বার্চ গাছ, ভারি বুড়ো, মনে হয় যেন একেবারে মরা। তার চারিপাশে উঁচু হয়ে তুষার জমেছে। তুষারের ঢেলাটা গড়িয়ে গেল সেই গাছটার কাছে। তারপর শুরু করল সেটার চারিধারে ঘুরতে।

উত্তেজনায় ফেদিউন্কা লক্ষ্যই করল না যে এখানে কোনো পথ নেই। গভীর তুষার ঠেলে সে চলল।

ভাবল, 'এতো দূরে যখন এসেছি তখন আর ফিরে যাব না।'

সেই বার্চ গাছটার কাছে সে পেঁাছল। সঙ্গে সঙ্গেই তুষারের ঢেলাটা ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ল। তার চোখদুটো ভরে গেল তুষারের গুঁড়োয়।

অভিমানে কান্না পেয়ে গিয়েছিল তার। হঠাৎ তার পায়ের চারিপাশে তুষার গলে একটা গর্ত করে দিল। দেখে, গর্তের তলায় সেই নাচুনী। তার দিকে মেয়েটি খুসিখুসি চোখে তাকিয়ে নরম করে হাসল। তারপর তার রুমাল নাড়িয়ে শুরু করল নাচতে, আর তার সামনে থেকে গলে যেতে লাগল তুষার। যেখানেই তার পা পড়ে সেখানেই জেগে ওঠে সবুজ ঘাস আর মেঠো ফুল।

এক পাক দিল — ফেদিউন্কার বেশ গরম বোধ হতে লাগল। ক্রমাগত বড় বড় পাকে সে নাচে, নিজেও বড় হতে লাগল সেই সঙ্গে। ফাঁকা জায়গাটাও বড় হয়ে ওঠে। বার্চ গাছে পাতা মর্মর করে উঠল। আরো জোরালো হয়ে উঠল আগুনী-নাচুনীর নাচ। এবার সে গান ধরল:

যেখানে আমি সেখানে গরম,
যেখানে আমি সেখানে আলো,
রঙীন গ্রীষ্মকালও!

ঘুরে ঘুরে সে নেচে চলল। অথচ সারাফানটা তো এইটুকু।

ফেদিউন্কার মতো বড় হয়ে উঠতে ফাঁকা জায়গাটা একেবারেই বড় হয়ে গেল, বার্চ গাছটায় নানা পাখি গান গাইছে। এমন গরম হয়ে উঠল, যেন গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সময়। ফেদিউন্কার নাক বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়তে লাগল। টুপিটা সে অনেক আগেই খুলে ফেলেছিল। তার ইচ্ছে হল ভেড়ার চামড়ার কোটটাও খুলে ফেলতে। কিন্তু আগুনী-নাচুনী বলল:

‘তোমার, গায়ের তাপটা জমিয়ে রাখো খোকা, ভাবো বরং কী করে ফিরে যাবে!’

ফেদিউন্‌কার উত্তর তৈরিই ছিল:

‘তুমি আমায় এনেছ, তুমিই আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে!’

কথাটা শুনে মেয়েটি হাসল।

‘কী তুখোড়! কিন্তু যদি বলি আমার সময় নেই, তাহলে?’

‘সময় হবে। আমি সবুর করব।’

মেয়েটি তখন বলল:

‘তাহলে ঐ কোদালটা নাও। তুষারের মধ্যে এটা তোমাকে গরম করে তুলবে আর বাড়ী নিয়ে যাবে।’

ফেদিউন্‌কা তাকিয়ে দেখল যে, বার্চ গাছটার পাশে একটা পুরনো কোদাল পড়ে রয়েছে। সর্বাঙ্গ মর্চে-ধরা, হাতলটা ফাটা।

কোদালটা সে তুলে নিল। আগুনী-নাচুনী তাকে সাবধান করে দিল:

‘দেখো, এটা যেন হাত ছাড়া করো না! জোর করে ধরে থেকো! পথটায় চিহ্ন রেখে রেখে যেও, কারণ কোদালটা তোমাকে এখানে আর কখনো পথ দেখিয়ে আনবে না। বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে আসবে তো, তাই না?’

‘নিশ্চয়ই আসব। আসব ইয়েফিম দাদুর সঙ্গে। বসন্তের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আসব এখানে। তুমিও এসো, আবার নেচো।’

‘আমার সময় নেই। নিজেই তুমি নেচো আর ইয়েফিম দাদুকে নিও তোমার নাচের তাল দিতে!’

‘কী তোমার কাজ?’

‘দেখতে পাচ্ছ না? শীতকালকে করি গ্রীষ্মকাল আর তোমাদের মতো মেহনতীদের দিই আনন্দ। ভেবেছ সহজ?’

হাসল সে, ঘুরল লাট্টুর মতো, তারপর তার রুমাল নাড়িয়ে দিল একটা শীস:

‘ফি-ই-ই-ট! ই-উ-উ-উ...’

অমনি অদৃশ্য হল মেয়েটি, ঘাস আর ফুলও আর নেই। বার্চ গাছটা দাঁড়িয়ে আছে একেবারে ন্যাড়া, যেন মরে গেছে। সেটার মগডালে বসে একটা পেঁচা। সে

ডাকল না, কিন্তু মাথা নাড়াতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বার্চ গাছের চারিধারে তুষার উঠল উঁচু হয়ে জমে। ফেদিউন্‌কার মাথা পর্যন্ত প্রায় ডুবে গেল। কোদালটা দিয়ে সে ভয় দেখাল পেঁচাটাকে। নাচুনীর গ্রীষ্মকালের কিছুই আর বাকি নেই। শুধু ফেদিউন্‌কার হাতের কোদালটা বেশ গরম। হাতও গরম, সর্বাঙ্গে সুন্দর তাপ।

হঠাৎ কোদালটা একটানে ফেদিউন্‌কাকে বরফের ভিতর থেকে একেবারে বাইরে নিয়ে এল। আর একটু হলেই হাত থেকে সেটা পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তারপর সে কায়দাটা রপ্ত করে নিল। তখন আর অসুবিধা হল না। মাঝে মাঝে সে হাঁটে, মাঝে মাঝে সেটা তাকে টেনে নিয়ে চলে বরফের মধ্যে দিয়ে। এটা তার ভালোই লাগল। গাছগুলোয় চিহ্ন রেখে যেতেও ভুলল না সে। কাজটাও সহজ — চিহ্ন আঁকার কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই কোদালটা উঠতে লাগল লাফিয়ে টুক-টুক শব্দ করে আর দেখা যেতে লাগল দুটি করে সমানমাপের কাটার দাগ তৈরি হয়ে গেছে।

সবে যখন গোধূলি নেবে আসছে, কোদালটা ফেদিউন্‌কাকে নিয়ে এল ইয়েফিম দাদুর কুটীরে। চুল্লির পাশের কাঠের তাকের উপর ঘুমবার জন্যে বুড়ো ততক্ষণে উঠে পড়েছিল। তাকে দেখে সে খুসি হল বৈকি। শুরু করল তাকে নানা প্রশ্ন করতে। যা-সব ঘটেছে ফেদিউন্‌কা তাকে বলল। কিন্তু বুড়োর বিশ্বাস হয় না। ফেদিউন্‌কা তখন বলল:

'তাহলে কোদালটা দেখো-না! ঢোকার বারান্দায় রেখে এসেছি।'

ইয়েফিম দাদু কোদালটা আনল। দেখা গেল তার মর্চের মধ্যে মধ্যে সোনার আরশুলা বসানো। একেবারে ছয় ছয়টা।

দাদু তখন ছেলেটার কথা বিশ্বাস করল, জিজ্ঞেস করল:

'আবার তুই জায়গাটা খুঁজে বার করতে পারবি?'

'পারব না কেন? পথে চিহ্ন রেখে এসেছি।'

পরের দিন ইয়েফিম দাদু তার পরিচিত এক শিকারীর কাছ থেকে স্কি ধার করল।

কাঁটায় কাঁটায় তারা সেই দাগ ধরে চলল। সহজেই বার করে ফেলল জায়গাটা। ইয়েফিম দাদু তখন খুব খুসি। সোনার আরশুলাগুলো বিক্রি করে দিল এক চোরাকারবারীর কাছে। তাই দিয়ে গোটা শীতকাল কাটল অভাব-অনটন ছাড়াই।

বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গেই তারা গেল সেই বুড়ো বার্চ গাছটার কাছে। তারপর জানো, কী ব্যাপার? প্রথম কোদাল ভর্তি যে-বালি তারা পায় তাকে ধোবারও দরকার নেই। স্রেফ হাত দিয়ে সোনা তুলে নিলেই হল। আনন্দে ইয়েফিম দাদু এমন কি নেচেও নিল।

তবে বুঝতেই পারছ তাদের এই দৌলত তারা লুকিয়ে রাখতে পারে নি। ফেদিউন্‌কা নেহাৎই ছোট, আর ইয়েফিম দাদু বুড়ো হলেও সহজ-সরল লোক।

তাই চারিদিক থেকে লোকে এল ভিড় করে। তারপর, জানোই তো, সবাইকেই তাড়িয়ে কর্তা নিজেই দখল করল জায়গাটা। পেঁচাটা যে মাথা নেড়েছিল, সে তো আর খামকা নয়।

তাহলেও ইয়েফিম দাদু আর ফেদিউন্‌কা প্রথমে যা-পায় তাই থেকে নিজেদের কিছুটা সুবিধে করে নেয়। গোটা পাঁচেক বছর আরামে থাকার পক্ষে তা যথেষ্ট। মাঝে মাঝে তারা সেই নাচুনীর গল্প করত:

‘ইস, আর একবার যদি দেখা পেতাম!’

কিন্তু আর কখনো সে দেখা দেয় নি। তবে আজ পর্যন্ত কিন্তু জায়গাটার নাম ‘নাচুনীর খনি’।

নীল নাগিনী
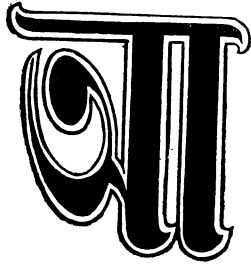
আমাদের খনিতে দুটি ছেলে থাকত। তাদের ভারি ভাব। লোকে তাদের ডাকত 'লাঙেকা পালান-গো' আর 'লেইকো টুপি' বলে।

কারা যে তাদের ঐ ঠাট্টার নাম দিয়েছিল তা আমি বলতে পারি না। দুজনের খুব বন্ধুত্ব। দুজনকে মানাতোও ভালো। দুজনেই সমান চালাক, দুজনেরই সমান জোর, দুজনেই মাথাতেও এক। বয়েসও সমান। সাংসারিক জীবনেও তাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। লাঙেকার বাবা কাজ করত ধাতুর খনিতে। লেইকোর বাবা ছিল সোনার খনিতে বালিধোয়ার কাজে। তাদের দুজনকার মা'দেরই, বুঝতেই পারছ, ব্যস্ত থাকতে হত ঘর-কন্নার কাজে। তাই কিছু নিয়ে তাদের কারুরই বড়াই করার কিছু ছিল না।

শুধু একটি ব্যাপারে মিল ছিল না। লাঙেকা তার ঠাট্টার নামটা পছন্দ করত না। লোকে যেন ঠাট্টা করছে সে ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়; এদিকে লেইকো তার নামটা একেবারেই অপছন্দ করত না, এমন কি পছন্দই করত। মনে হত নামটা যেন বেশ সোহাগী। প্রায়ই তার মাকে অনুনয় করে বলত:

'আমার জন্যে একটা নতুন টুপি করে দাও। ওরা আমায় ডাকে লেইকো টুপি বলে, এদিকে আমার বাবার ফারের টুপি ছাড়া আর কিছুই নেই, সেটাও আবার পুরনো।'

এই পার্থক্য সত্ত্বেও ছেলেদুটির মধ্যে খুব ভাব। যেকোনো ছেলেই লাঙেকাকে পালান-গো বলে ডাকলেই লেইকোই তাকে প্রথম মারত ঘুষি।

‘কোথায় ও পালান-গো। কাকে ও ভয় পেয়েছে?’

এইভাবে তারা থাকত, সর্বদাই একত্র। ঝগড়া তাদের অবশ্য হত, কিন্তু বেশী দিন নয়। দেখতে না দেখতে আবার তাদের মিল হয়ে যেত।

আরো একটা ব্যাপারে তারা ছিল সমান — দুজনেই পরিবারের সবাইকার ছোট। সেধরনের ছেলে সর্বদাই খেলার বেশী সময় পায়। ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করতে হয় না। শীতের শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত তারা শুধু বাড়ীতে আসত খেতে আর শুতে। ও বয়েসের ছেলেদের কত কাজ — বল নিয়ে খেলা, মাছ ধরতে যাওয়া, সাঁতার কাটা, বেরি আর ব্যাঙের ছাতা তোলা, সমস্ত পাহাড়ে চড়া, প্রত্যেকটা গাছের গুঁড়ির চারধারে এক পায়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে ঘোরা। খুব সকালে তারা বেরিয়ে পড়ত — তারপর খুঁজে দেখো! কিন্তু কেউই তাদের বিশেষ খোঁজ করত না। সন্ধেয় বাড়ী ফিরত। মায়েরা তাদের সামান্য বকত:

‘তাহলে ফিরলি, ভবঘুরে কোথাকার! সমস্ত দিন টো-টো করে ঘোরা, এখন গেলাতে হবে!’

কিন্তু শীতকালে অন্য ব্যাপার। শীতে, বোঝোই তো সব জন্তুর ল্যাজই গুটিয়ে আসে, মানুষও পার পায় না। লাঙ্কো আর লেইকোকে শীত তাড়িয়ে নিয়ে যেত তাদের বাড়ীর মধ্যে। গরম জামাকাপড় বিশেষ ছিল না তো। খারাপ জুতো, তা পরে বেশী দূর যেতে পারো না। এক বাড়ী থেকে আরেক বাড়ী যাওয়া পর্যন্ত পা গরম থাকত।

বড় ইঁটের চুল্লির লগোয়া মাচাটায় তারা সাধারণত উঠত যাতে বড়দের চোখে না পড়ে। সেখানে থাকত বসে। দুজনে থাকলে অত একঘেয়ে লাগত না। কিছু নিয়ে খেলত, গল্প করত গ্রীষ্মকালের, কিম্বা শুনত বড়দের কথাবার্তা।

ঐভাবে তারা একদিন বসে আছে, এমন সময় লেইকোর বোন মারিউশ্‌কার কাছে তার সই এল। তখন নতুন বছর ঘনিয়ে এসেছে, সে সময় আমাদের দেশের মেয়েদের একটা প্রথা — ভাগ্য গণনা করা, কার সঙ্গে বিয়ে হবে। তাই করছিল তারা। ছেলেদের ইচ্ছে আরো কাছ থেকে দেখতে, কিন্তু মেয়েরা তাদের কাছে ঘেঁষতে দিল না। সঙ্গে সঙ্গে তাদের তাড়িয়ে দিল মারিউশ্‌কা, মাথায় মারল কয়েকটা চাঁটি।

‘তোদের যেখানে থাকার কথা সেখানে যা!’

মানে, কী জানো, মারিউশ্‌কা ছিল বদরাগী, কতদিন বিয়ের বয়েস হয়ে গেছে, অথচ বর জুটছে না। চেহারা তার ভালোই, তবে মুখটা একটু বাঁকা। সেটাকে বড় কোনো খুঁত বলা যায় না, কিন্তু সে কারণেই ছেলেরা তাকে আমল দিত না। এতে মন তার তেতো হয়ে গিয়েছিল।

ছেলেরা মাচার উপর চড়ে খানিক গজগজ করে ঠাণ্ডা হয়ে গেল; কিন্তু মেয়েদের তখন খুব ফুর্তি। তারা শুধু জোরে হাসাহাসি করল। মারিউশ্‌কা তখনও মনমরা। গণনায় তার আর বিশ্বাস নেই।

'গাঁজাখুরি ব্যাপার। শুধুই তামাসা।'

তখন মেয়েদের একজন বলল:

'তোমার ভাগ্য জানার সত্যিই একটা উপায় আছে, কিন্তু সেটা ভয়ের।'

মারিউশ্‌কা জিজ্ঞেস করল, 'কী সেটা?'

মেয়েটি তাকে বলল:

'বুড়ি দিদিমার কাছে শুনেছি, সত্যিকারের ভাগ্য জানার উপায় হল এই। গভীর রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন টঙে সুতোয় বেঁধে চিরুণী ঝুলিয়ে দিতে হবে আর পরদিন কেউ জেগে ওঠার আগেই সেটা হবে খুলে নিতে। তখন সব কথা পারবে জানতে।'

সবাই দারুণ উৎসুক হয়ে উঠল কেমন করে। মেয়েটি বলল:

'চিরুণীতে যদি চুল থাকে তাহলে তোমার বিয়ে সেই বছরেই। যদি না থাকে তাহলে তোমার কপালে বিয়ে নেই। আর তা দেখে বোঝা যাবে বরের চুলও কী হবে।'

লাঙ্কো আর লেইকো দুজনেই সব কথা শুনল। ভাবল, মারিউশ্‌কা নিশ্চয়ই ঐভাবে তার ভাগ্য পরীক্ষা করবে। সেই চাঁটির জন্যে তাদের দুজনেরই তার ওপর রাগ ছিল। ঠিক করল:

'দাঁড়াও-না! আমরা শোধ তুলব!'

সেই রাত্রে ঘুমবার জন্যে লাঙ্কো বাড়ী গেল না, লেইকোর সঙ্গে থেকে গেল মাচায়। শুয়ে রইল সেইখানে, খানিক নাক ডাকাল, কিন্তু কেবলি এ-ওকে খোঁচা মারতে লাগল — লক্ষ্য রাখ, জেগে থাক!

বড়রা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ছেলেরা শুনল মারিউশ্‌কা খিড়কি দরজার দিকে যাচ্ছে। পিছন পিছন পা টিপে টিপে চলল তারাও। লক্ষ্য করল সে টঙে উঠে চালটা হাতড়াচ্ছে। জায়গাটা তারা লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি ফিরে এল ঘরের মধ্যে। মারিউশ্‌কাও তাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরল; কাঁপছিল, দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল। ঠাণ্ডায় নাকি ভয়ে, কে জানে। সে শুয়ে আরো খানিক কাঁপল। তারপর শোনা গেল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেরাও তাই চায়। তারা নেমে এসে যেকোনো পোষাক পেল পরে গুটিগুটি নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল। আগে থেকেই তারা ভেবে রেখেছিল কী করবে।

লেইকোর একটা ঘোড়া ছিল। চিতি ঘোড়া কিম্বা কালচে লাল রঙের। নাম গোলুব্‌কো। ছেলেরা ঠিক করেছিল মারিউশ্‌কার চিরুণীটা দিয়ে সেই ঘোড়াটাকে আঁচড়াবে। রাত্রিবেলা টঙের ভিতরটা সামান্য ভয় ভয় ধরনের, কিন্তু দুজনাই দুজনার কাছে সাহস দেখাতে চায়। টঙে তারা চিরুণীটা পেল, গোলুব্‌কোর কিছু লোম আঁচড়াল, তারপর যথাস্থানে রেখে দিল চিরুণীটা। কুটীরে ফিরে তারা গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল দেরি করে। যখন জাগল তখন লেইকোর মা ছাড়া কুটীরে আর কেউ নেই, সে তখন চুল্লিতে আঁচ দিচ্ছিল।

ছেলেরা যখন ঘুমচ্ছিল তখন এই ঘটনা ঘটে। সকালে মারিউশ্‌কা সবাইকার আগে উঠে যায় চিরুণীটা আনতে। দেখে সেটা চুলে ভরা। সে খুব খুসি হয়ে ওঠে, কোঁকড়া-চুল বর তার হবে। তাই ছুটে যায় বন্ধুদের কথাটা বলতে। তারা চিরুণীটা দেখে, কিন্তু তাদের মনে হয় চুলগুলোর মধ্যে কিছু যেন গণ্ডোগোল রয়েছে। কেমন যেন অদ্ভুত দেখতে সেগুলো। তাদের পরিচিত কোনো ছেলের মাথাতেই ওরকম চুল কখনো তারা দেখে নি। তারপর কার যেন চোখ পড়ে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ঘোড়ার ল্যাজের একটা চুল। তাই তারা মারিউশ্‌কাকে ঠাট্টা করতে শুরু করল।

বলল, 'তোর বর দেখছি গোলুব্‌কো।'

মারিউশ্‌কার ভয়ানক অপমান হল। গালাগালি করল তার সইদের। তারা কিন্তু ক্রমাগত চলল হেসে। তারও একটা ঠাট্টার নাম তারা দিল — গোলুব্‌কোর কনে।

মার কাছে নালিশ করার জন্যে মারিউশ্‌কা দৌড়ে বাড়ীতে এল। ছেলেরা কিন্তু সেই চাঁটির কথা ভোলে নি, তাই তারা মাচার উপর থেকে টিটকারি দিতে লাগল:

'গোলুব্‌কোর কনে! গোলুব্‌কোর কনে!'

মারিউশ্‌কা কেঁদে ফেলে ফোঁপাতে লাগল, কিন্তু মা আন্দাজ করল এটা কাদের কীর্তি। তাই ছেলেদের বকল:

'লজ্জা হয় না, কী করেছিস! এমনিতেই বর জুটছে না, তার ওপর তোরা কিনা তাকে দিয়ে লোক হাসিয়েছিস।'

ছেলেরা দেখল ঠাট্টাটা মর্মান্তিক হয়েছে, তাই তারা এ ওর ঘাড়ে দোষ চাপাতে লাগল:

'তুই শুরু করেছিলি!'

'না, তুই করেছিলি!'

মারিউশ্‌কা শুনে জানল কারা তার সঙ্গে তামাসা করেছে। সে চিৎকার করে উঠল:

'তোরা দুজনেই যেন সেই নীল নাগিনী দেখতে পাস!'

তখন তাদের মা মারিউশ্‌কাকে ধমকাল:

'চুপ কর্, বোকা মেয়ে! ঐভাবে কথা বলে! বাড়ীর সবাইকে তুই বিপদে ফেলবি!'

কিন্তু মারিউশ্‌কা শুধু বলল:

'বয়ে গেল আমার! কেন যে আমি জন্মালাম!'

দরজাটা জোরে বন্ধ করে দৌড়ে সে উঠনে বেরিয়ে গেল। সেখানে একটা কাঠের কোদাল নিয়ে তেড়ে গেল গোলুব্‌কোর দিকে, যেন এটা তার দোষ। মা বাইরে বেরিয়ে মেয়েকে বকে, তাকে ঘরে এনে বোঝাতে চেষ্টা করল। ছেলেরা দেখল তাদের এখন সামনে না থাকাই ভালো, তাই তারা চলে গেল লাঙ্কোর বাড়ীতে। মাচার ওপর উঠে ইঁদুরের মতো বসে রইল চুপটি মেরে। মারিউশ্‌কার জন্যে তাদের দুঃখ হল, কিন্তু এখন আর উপায় কী? সেই নীল নাগিনীর কথাটা তাদের মাথায় ঘুরছিল, ফিসফিস করে বলাবলি করল:

'লেইকো, তুই কখনো ঐ নীল নাগিনীর কথা শুনেছিস?'

'জীবনে শুনি নি, আর তুই?'

'না, আমিও শুনি নি।'

তারা খানিক ফিসফিস করে ঠিক করল, এই গণ্ডোগোলটা চুকে গেলে বড়দের জিজ্ঞেস করবে। তাই তারা করল। মারিউশ্‌কার উপর তাদের তামাসা করার কথাটা লোকেরা ভুলে গেলে তারা চেষ্টা করল ব্যাপারটা জানতে। কিন্তু যাদেরই প্রশ্ন করে তারাই হাঁকিয়ে দেয়: কিছু জানি না, এমন কি ভয়ও দেখায়:

'একটা ছপ্‌টি দিয়ে তোদের পিঠের চামড়া তুলব! ওসব কথা ভুলে যা।'

এতে ছেলেরা আরো বেশী কৌতূহলী হয়ে উঠল। কী ধরনের নাগিনী সেটা, যার কথা মুখে আনাও বারণ?

কিন্তু ভাগ্য তাদের সহায় হল। সেদিন পরবের দিন, লাঙ্কোর বাবা ফিরে এল বেশ কিছুটা মাতাল হয়ে। মাটির দাওয়ায় বসল। ছেলেরা জানত পেটে কিছু পড়লে সে বকবক করে। তাই লাঙ্কো চেষ্টা করে দেখল:

'বাবা, কখনো তুমি নীল নাগিনী দেখেছ?'

তাতে মনে হল মানুষটার নেশা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেছে, সে এমন কি খানিক সরে গিয়ে নানা মন্ত্র উচ্চারণ করল।

'আলাই বালাই দূর! দূর! কান দিস না, বাড়ী আর চুল্লি! এখানে নাম কেউ নেয় নি!'

তারপর ছেলেদের সাবধান করে দিল ওধরনের কথা আর না বলতে, কিন্তু তখনো তার পেটে রয়েছে মদ, নিজেই চাইছিল কথা বলতে। তাই খানিক কোনো কথা না বলে চুপচাপ বসে থেকে তারপর বলল:

'নদীর তীরে আয়। খোলা জায়গা, যেকোনো কথা বলা যায়।'

নদীর তীরে গেল তারা। লাঙ্কোর বাবা পাইপ ধরিয়ে সাবধানে চারিদিকে তাকাল। বলল:

'বেশ, তোদের বলব, নইলে তোরা হয়তো কথা বলে বিপদ ঘটাবি। শোন তবে।'

আমাদের এলাকায় ছোট্ট একটা সাপ আছে, নীল রঙের। লম্বায় সাত ইঞ্চির বেশী নয়, আর এতো হাল্কা যে, মনেই হয় না ওজন আছে। যখন সেটা ঘাসের ওপর দিয়ে যায় তখন একটা ঘাসও নুয়ে পড়ে না। অন্য সাপেদের মতো সেটা বুকে

হে'টে যায় না। পাকিয়ে গোল হয়, তার মাথাটা থাকে সামনে, আর ল্যাজের ওপর ভর করে চলে লাফিয়ে লাফিয়ে — এতো জোরে চলে যে, কখনো তাকে ধরা যায় না। যখন সেটা সেইভাবে লাফায়, তার ডান দিকে সোনালী ঝর্না, বাঁ দিকে ঝুলের মতো কালো ছায়া।

একলা একলা কারো চোখে পড়লে একেবারে সৌভাগ্য। সোনালী ঝর্না যেখানে পড়ে সেখানে মাটির উপরই নির্ঘাৎ পাওয়া যাবে সোনা। পাবি অনেক অনেক সোনা। মাটির একেবারে ওপরে পড়ে থাকবে বড় বড় সোনার তাল। কিন্তু এর মধ্যে একটা বিপদও আছে। অনেক সোনা কুড়িয়ে যদি একটাও ফেলিস মাটিতে, এমন কি একটা দানাও, তাহলে সব সোনা হয়ে যায় সাধারণ পাথর। তারপর সে জায়গাটা কখনো পারবি না খংজে বার করতে, সেটার কথা একেবারে যাবি ভুলে।

কিন্তু সাপটা যদি দ'তিনজন লোকের সামনে আসে, কিম্বা আসে কোনো আর্টেলে, তাহলে দারণ বিপদ। সবাই তারা শর করে ঝগড়া করতে, আর এমন আক্রোশ শর হয় যে খনখারাবি পর্যন্ত গড়ায়। ঐ নীল নাগিনীর জন্যে আমার বাবা যায় কয়েদ-খাটুনিতে। আর্টেলে তারা বসে গল্প করছিল, এমন সময় সেটা দেখা দিল। তারপর শর হয় মারপিট। দজন যায় খন হয়ে, অন্য পাঁচজনের কয়েদ হয়। সোনাও একেবারেই পাওয়া যায় নি। সে কারণেই নীল নাগিনীর কথা কেউ তুলতে চায় না। তারা ভয় পায়, হয়তো আসবে যখন দই কিম্বা তিনজন একত্রে আছে। আর যেকোনো জায়গাতেই সেটা পারে আসতে — বনে কিম্বা মাঠে, ঘরে কিম্বা পথে। হ্যাঁ, লোকে আরো বলে, মাঝে মাঝে মানষের চেহারা সে নেয়, কিন্তু সর্বদাই তাকে চেনা যায়। কারণ সবচেয়ে নরম বালির ওপরেও তার পায়ের ছাপ পড়ে না। এমন কি তার পায়ের তলায় ঘাসও নয়ে যায় না। সেটাই প্রথম চিহ্ন। দ্বিতীয়টা হল তার ডান হাতের আস্তিন থেকে ঝরে সোনার গংড়ো আর বাঁ হাতের আস্তিন থেকে কালো ধলো।

কথাগলো লাঙেকার বাবা তাদের বলে দজনকে দিল সাবধান করে:

'মনে রাখিস, এসব কথা অন্য কাউকে যেন বলিস না, আর তোরা যখন দজনে একসঙ্গে থাকবি তখন তার কথা মনেও আনবি না। কিন্তু যদি তোরা একলা থাকিস, আর কাছে-পিঠে কেউ না থাকে, তখন ইচ্ছে হলে তার নাম ধরে ডাকতে পারিস।'

ছেলেরা প্রশ্ন করল, 'কীভাবে তাকে ডাকতে হয়?'

বলল, 'তা, বাপু, জানি না, জানলেও তোদের বলতাম না। ভারি বিপদের ব্যাপার।'

এইভাবে তাদের আলাপ শেষ হল। লাঙেকার বাবা আবার তাদের সাবধান করে দিল এবিষয়ে আলোচনা যেন না করে আর দুজনে একসঙ্গে থাকার সময় কখনোই যেন সেই সাপটার কথা না ভাবে।

প্রথমে ছেলেরা সাবধান ছিল, একে অন্যকে মনে করিয়ে দিত:

'মনে রাখিস, দেখিস ওটার কথা যেন কখনো বলে ফেলিস না। দুজনে যখন একসঙ্গে থাকবি তখন ওটার কথা ভাববি না। একলা থাকলে ওটার কথা ভাববি।'

কিন্তু এতে লাভ কী, সর্বক্ষণই তো তারা একসঙ্গে থাকে। নীল নাগিনীর কথা যে তারা ভুলতেই পারে না! তখন গরম পড়তে শুরু করেছে। বরফ গলে জল ছুটছে ছোট ছোট স্রোতে। জল যখন আবার বসন্তে জীবন্ত হয়ে ওঠে তখন তাকে নিয়ে খেলার চেয়ে আরো ভালো খেলা কোথায় — নৌকো ভাসানো, বাঁধ বাঁধা, কিম্বা ফ্ল্যাটার-মিল চালানো? কিন্তু যে-পাড়ায় ছেলেরা থাকত সেটা খাড়া নেমে গিয়েছে পুকুরে। বরফ গলা জল সেখানে চট করেই ফুরিয়ে গেছে, অথচ ছেলেদের খেলার সাধ মেটে নি। এখন তারা করে কী? প্রত্যেকে একটা করে কোদাল নিয়ে চলে গেল খনিতে। তারা ভাবল, বন থেকে সেখানে অনেক দিন স্রোত বয়ে আসবে, যেকোনো খেলা খেলতে পারবে। ভেবেছিল তারা ঠিকই। তাই তারা সবচেয়ে ভালো একটা জায়গা বেছে বানাতে শুরু করল বাঁধ। তর্ক শুরু হল কে সবচেয়ে ভালো বানাতে পারে। তারা ঠিক করল, কাজে দেখা যাবে — একলা একলা তারা বানাবে একটা করে বাঁধ। তাই তারা স্রোত ধরে ছড়িয়ে পড়ল। লেইকো গেল নীচের দিকে, লাঙেকা গেল উপরের দিকে, ধরো এই পঞ্চাশ পা। প্রথমটা ডাকাডাকি করে জানানি দিচ্ছিল:

'এ-এ-এ-ই, আমারটার দিকে তাকিয়ে দেখ!'

'আর আমারটা — এটা দিয়ে একটা পেষাইকল চালানো যায়!'

হাজার হলেও এটা কাজ। তাই তারা দুজনেই মন দিয়ে কাজ শুরু করে দিল। কাজের জন্যে চেঁচানো বন্ধ করল। প্রত্যেকেই চাইল সবচেয়ে ভালো করে তৈরি

15—1115

করতে। কাজ করার সময় লেইকোর গুন্‌গুন্‌ করার অভ্যেস, সুরের সঙ্গে যেকোনো কথাই সে বসিয়ে দেয়, মিললেই হল। এখন সেইভাবে সে শুরু করল। গাইল:

আয়-না ওরে, আয়-না ওরে,
নীল নাগিনী ঠারে-ঠোরে,
আয়-না এসে দে-না দেখা,
গড়িয়ে যাবি যেন চাকা।

গাইতেই সে দেখে ঢালু জমির উপর থেকে নীল একটা চাকার মতো কী যেন গড়িয়ে আসছে। এতো হালকা যে, শুকনো ঘাসও তার চাপে নুয়ে পড়ছে না। খুব কাছে এসে পড়তে লেইকো দেখল সেটা গোল করে পাকানো একটা সাপ। মাথাটা সামনের দিকে, ল্যাজ দিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে। সোনালী ফুলকি ঝরছে একদিক থেকে আর কালো ছিটকানি আরেকদিকে। লেইকো সেদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, ওদিকে লাঙ্কো চেঁচিয়ে উঠল:

'দেখ্, লেইকো, নীল নাগিনী!'

বোঝা গেল লাঙ্কো একই জিনিস দেখেছে। সাপটা তার দিকে এসেছিল পাহাড়ের তলা থেকে। লাঙ্কো চিৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে সাপটা অদৃশ্য হল। তারপর ছেলে দুজন দৌড়ে এসে আলোচনা করতে লাগল, প্রত্যেকেই গর্ব করে বলতে লাগল কী দেখেছে:

'তার চোখদুটোও স্পষ্ট দেখেছি!'

'আমি দেখেছি তার ল্যাজটা। সেটার ওপর ভর দিয়ে সে লাফায়।'

'আর আমি দেখি নি নাকি? চাকাটার ভেতর থেকে সেটা বেরিয়েছিল।'

লেইকো একটু বেশী চটপটে। স্রোতটার কাছে সে ছুটে গেল কোদাল আনবার জন্যে।

চেঁচিয়ে বলল, 'এবার আমরা সোনা পাব।'

কোদাল নিয়ে দৌড়ে সে এল। যেখানে সোনা চকচক করতে দেখেছিল সেখানটা যেই খুঁড়তে যাবে অমনি লাঙ্কো তার দিকে তেড়ে এল:

'থাম, কী করছিস? নিজেকে মারবি! ঐখানে বিপদ ছড়ানো!'

লেইকোকে সে ঠেলে সরিয়ে দিল। লেইকোও চেঁচিয়ে চেষ্টা করল নিজের মত বজায় রাখতে। শেষ পর্যন্ত মারামারি শুরু হয়ে গেল। লাঙ্কোর সুবিধে। তার পিছনে পাহাড়, তাই লেইকোকে নীচে ঠেলতে ঠেলতে ক্রমাগত সে চেঁচিয়ে চলল:

'ওখানে তুই খুঁড়তে পাবি না, কক্ষোনো না। তাহলে তোর বিপদ হবে! অন্যদিকে আমাদের খুঁড়তে হবে!'

তারপর লেইকো তার উদ্দেশে চেঁচাতে লাগল:

'তোকে খুঁড়তে দেব না! এতে বিপদ ঘটবে! তুই নিজেই দেখেছিস ঐ পাশটায় কালো ধুলো পড়ছিল।'

মারামারি করে চলল তারা। প্রত্যেকেই চায় অন্যকে বিপদ থেকে বাঁচাতে, ঘুষি মারছে। মারামারি করেই চলল। শেষে দুজনেই কেঁদে ফেলল। তারপর থামল ব্যাপারটা আরেকবার গোড়া থেকে ভালো করে ভাববার জন্যে। দেখল কী হয়েছে। সাপটাকে তারা দেখেছে দুই উল্টো দিক থেকে, তাই একজনের কাছে যেটা বাঁ অন্যের কাছে সেটা ডান দিক। ছেলেরা অবাক হয়ে গেল:

'দেখ, কেমন আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। দুজনেই তাকে দেখি দুজনের দিকেই আসছে। শুধু ঠাট্টা করেছে, আমাদের মধ্যে লাগিয়ে দিয়েছিল মারামারি। এখন আর আসল জায়গাটা খুঁজে বার করা যাবে না। আর কখনো তোমাকে আমরা ডাকব না, রাগ করো না। জানি কেমন করে ডাকতে হয়, কিন্তু ডাকব না!'

এই কথা তারা বলল বটে কিন্তু তাকে ভুলতে পারল না — আরেকবার তাদের সাপটাকে দেখার ইচ্ছে ছিল। প্রত্যেকেই ভাবছিল — একা চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়? সেটা ভয়েরও ব্যাপার, অস্বস্তিরও কথা, বন্ধুকে লুকিয়ে তো। এইভাবে কাটল একপক্ষ কি কিছু বেশী, কিন্তু সেই নীল নাগিনী সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই হল না। তারপর লেইকো বলল:

'নীল নাগিনীকে আর একবার ডাকলে কেমন হয়? শুধু একদিক থেকে আমাদের দেখতে হবে।'

'আর লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মারামারি না করি,' লাঙ্কো যোগ করে দিল। 'আগে ভালো করে ভাবব আর দেখব তার মধ্যে কোনো রকম চালাকি আছে কিনা।'

এই ঠিক করে প্রত্যেকে তারা একটুকরো রুটি আর একটা করে কোদাল নিয়ে আবার ঠিক সেই জায়গায় গেল। সেই বছর বসন্ত এসেছে আগে। সমস্ত তামাটে মাটি কচি ঘাস ঢেকে দিয়েছে। বসন্তের জলের স্রোত শুকিয়ে গেছে। প্রচুর ফুল ফুটেছে। ছেলেরা গিয়ে থামল লেইকোর পুরনো বাঁধের কাছে। তারপর শুরু করল গান গাইতে:

আয়-না ওরে, আয়-না ওরে,
নীল নাগিনী ঠারে-ঠোরে,
আয়-না এসে দে-না দেখা,
গড়িয়ে যাবি যেন চাকা।

তারা দাঁড়িয়ে রইল পাশাপাশি, যা ঠিক করেছিল। গরম, তাই দুজনেরই পা খালি। ছড়াটা শেষ করার আগেই নীল সাপটা লাঙ্কোর বাঁধ থেকে লাফিয়ে উঠল। লাফাতে লাফাতে সেটা কচি ঘাসের উপর দিয়ে আসতে লাগল। ডান দিকে সোনালী ফুলকির ঘন মেঘ, বাঁ দিকে তেমনি গাঢ় কালো ধুলো। সোজা সেটা আসতে লাগল ছেলেদের দিকে। প্রায় তারা দু'দিকে ছুটে যাবে ভাবছিল, এমন সময় লেইকোর বুদ্ধি হল। লাঙ্কোর বেল্ট ধরে সে নিজের সামনে তাকে টানল। ফিসফিস করে বলল:

'কালো দিকটায় থাকিস না!'

কিন্তু সাপটা তাদের চেয়ে অনেক চালাক। তাদের পায়ের ফাঁক দিয়ে চলে গেল। তাদের প্রত্যেকেরই প্যান্টের একটা পা হয়ে গেল সোনালী আর একটা এমন কালো যেন আলকাতরায় ডোবানো। কিন্তু ছেলেরা তা লক্ষ্য করল না, লক্ষ্য করতে লাগল এরপর কী ঘটে। লাফাতে লাফাতে সাপটা বিরাট একটা গাছের গুঁড়ির কাছে গিয়ে অদৃশ্য হল। গাছের গুঁড়ির কাছে তারা দৌড়ে গিয়ে দেখে তার একটা দিক সোনার, আর অন্য দিক যতদূর হতে হয় কালো। সেটা পাথরের মতো শক্ত। গুঁড়িটার কাছে পাথরের একটা পথ, সেই পথের ডান দিকের পাথর হলদে, বাঁ দিকের কালো।

ছেলেরা অবিশ্যি জানত না সোনার তালের ওজন কেমন। কিন্তু না ভেবেই লাঙ্কো একটা তুলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল, ওহ্, কী ভারি, কখনোই সেটা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। আবার ফেলে দিতেও ভয় হল। মনে পড়ল বাবা তাদের

কী বলেছিল — একটুও যদি ফেলিস তাহলে সবগুলোই সাধারণ পাথর হয়ে যাবে। তাই সে লেইকোকে চেঁচিয়ে বলল:

'ছোট দেখে একটা কুড়ো! এটা খুব ভারি!'

লেইকো তার কথা শুনে ছোট একটা কুড়ল। সেটাও কিন্তু খুব ভারি। বুঝতে পারল লাঙ্কো নিজেরটা কখনো বাড়ী পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

চেঁচিয়ে সে বলল:

'ফেলে দে, নইলে তোর অপকার হবে।'

লাঙ্কো কিন্তু উত্তর দিল:

'এটা যদি ফেলে দিই তাহলে সমস্তটাই সাধারণ পাথর হয়ে যাবে।'

'ফেলে দে, বলছি,' লেইকো চেঁচিয়ে উঠল। লাঙ্কো কিন্তু তর্ক করে চলল — না, ফেলা উচিত হবে না, আবার তাদের মারামারি বাধল। ঘুষোঘুষি করে কেঁদেকেটে, গেল তারা গাছের গুঁড়ি আর সেই পাথরের পথটার কাছে। দেখে কিছুই নেই। গাছের গুঁড়ি যেমন হয় তেমনি। সোনার বা সাধারণ কোনো পাথরই নেই। ছেলেরা বলাবলি করল:

'সাপটার সবকিছুই ভেল্‌কি। ওটার কথা আর আমরা কখনো ভাবব না।'

বাড়ী ফিরল, প্যাণ্টের জন্যে পড়ল বিপদে। দুজনকার মা'ই ভালো করে উত্তম মধ্যম দিল। আশ্চর্যও হল:

'একইভাবে কী করে নোংরা হয়। একটা পায়ে কাদা আর অন্যটায় পাঁচ! নিশ্চয়ই কোনো বজ্জাতি আছে!'

এরপর নীল সাপটার উপর ছেলেরা একেবারেই রেগে গেল।

'আর কখনো ওটার কথাই তুলব না!'

এইবার তারা তাদের কথা রাখল। সেই নীল সাপটার সম্বন্ধে তাদের কেউই কোনো কথা বলল না, এমন কি যে-জায়গায় সেটাকে তারা দেখে সে-জায়গাটাও তারা এড়িয়ে চলল।

একদিন তারা গেল বেরি তুলতে। প্রত্যেকেই পেল এক এক ঝুড়ি, তারপর তারা একটা মাঠে এসে জিরতে বসল। ঘন ঘাসের মধ্যে বসে খানিক তারা কথা কইতে লাগল — কে পেয়েছে বেশী বেরি, কার গুলো সবচেয়ে বড়। তাদের কারুরই মনে

সেই নীল সাপটার কথা ছিল না। হঠাৎ দেখে মাঠ পেরিয়ে একটি মেয়ে সোজা তাদের দিকে আসছে। প্রথমে তারা লক্ষ্যই করল না, সেই সময় বনের মধ্যে কত মেয়েই তো থাকে: কেউ বেরি তোলে, কেউ ঘাস কাটে। কিন্তু তারপর তারা একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করল। মেয়েটা আসছে যেন উড়ে, হালকা পায়ে। মেয়েটি কাছে এলে তারা দেখতে পেল তার পায়ের নীচে একটা ফুল কিম্বা ঘাসও নুয়ে যাচ্ছে না। আবার তারা তাকাল, দেখল তার ডান দিকে ভাসছে একটা সোনালী মেঘ, আর বাঁ দিকে কালো। ছেলেরা বলাবলি করল:

'আমরা পিছন ফিরে থাকব। দেখব না। নইলে মেয়েটা হয়তো আবার আমাদের মারামারি লাগিয়ে দেবে।'

তাই তারা করল। মেয়েটির দিকে পিছন ফিরে প্রাণপণে চোখ বন্ধ করল। হঠাৎ তাদের মনে হল কী যেন তাদের তুলছে। চোখ খুলে দেখল একই জায়গায় বসে আছে, কিন্তু চেপে যাওয়া ঘাসগুলো আবার উঠছে দাঁড়িয়ে, আর তাদের চারদিকে রয়েছে বড় বড় দুটো গণ্ডি, একটা সোনার আর একটা কালো পাথরের। মেয়েটা নিশ্চয়ই তাদের চারিদিকে ঘুরেছে আর তার জামার হাতার ভিতর থেকে ফেলেছে ঝেড়ে ঝেড়ে। দৌড়ে পালাবার জন্যে ছেলেরা লাফিয়ে উঠল, কিন্তু সোনার গণ্ডি তাদের বেরুতে দিল না। যেই তারা সেটার উপর দিয়ে পা বাড়াতে যায় অমনি সেটা ওঠে ওপরে, তলা দিয়েও দেয় না যেতে। মেয়েটি শুধু হাসতে লাগল:

'আমি বেরুতে না দিলে আমার গণ্ডির ভিতর থেকে কেউ বেরুতে পারে না।'

তখন লেইকো আর লাঙেকা অনুনয় করতে শুরু করল:

'হেই গো, আমরা তো তোমাকে ডাকি নি!'

সে বলল, 'আমি নিজে থেকেই এসেছি। যারা না খেটেই সোনা পেতে চায় তাদের দেখতে এলাম।'

ছেলেরা অনুনয় বিনয় করে:

'হেই গো, যেতে দাও, আর কখনো করব না। এমনিতেই দুবার আমাদের মধ্যে তুমি মারামারি বাধিয়েছ!'

মেয়েটি বলল, 'সব মারামারিকেই দোষ দেওয়া যায় না, কোনো কোনোটাকে বাহবা দিতে হয়। তোমরা মারামারি করেছিলে ভালো মনে। স্বার্থ লোভের জন্যে নয়,

দ্বজন দ্বজনকে বাঁচাতে চেয়েছিলে। কালো বিপদ থেকে সোনার গণ্ডিটা তোমাদের ঘিরে রেখেছে খামকা নয়। কিন্তু আরেকবার তোমাদের পরখ করে দেখতে চাই।'

ডান হাতের হাতা থেকে সে ঢালল সোনার ধ্বলো, বাঁ হাত থেকে ঢালল কালো। তারপর নিজের হাতের মধ্যে সেগ্বলো মেশাল। সেগ্বলো হয়ে উঠল একটুকরো কালো-সোনার পাথর। তারপর সেটায় সে নখ দিয়ে দাগ দিল আর সেটা হয়ে গেল দ্বখানা। দ্বটি ছেলেকেই সে একটি একটি করে দিল।

'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ সত্যি সত্যিই অপরের ভালো চেয়ে থাকো, তাহলে তারটা হয়ে যাবে খাঁটি সোনা, কিন্তু যদি বাজে ব্যাপার হয়, তাহলে এটা হয়ে যাবে ঝামা পাথর।'

মারিউশ্কার উপর সেই বিছছিরি তামাসা করার পর বহ্বকাল থেকে তাদের বিবেকে লাগত। সেটা নিয়ে তাদের মারিউশ্কা আর কোনো কথা বলে নি, কিন্তু তারা লক্ষ্য করেছিল মনমরা হয়ে পড়েছে সে। এখন সে-কথা তাদের মনে পড়ল, আর তারা প্রত্যেকে কামনা করল:

'লোকেরা যেন 'গোল্বব্কোর কনে', — এই নামটা তাড়াতাড়ি ভুলে যায় আর মারিউশ্কার যেন বিয়ে হয়!'

যেই না ভাবা, অমনি তাদের হাতের পাথরের টুকরো হয়ে গেল সোনা। মেয়েটি হাসল।

'তোমাদের ইচ্ছেটা ভালো। এই নাও তোমাদের প্বরস্কার।'

তাদের প্রত্যেককে সে দিল একটা করে চামড়ার থলি, ম্বখের কাছটা চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা।

মেয়েটি বলল, 'এর মধ্যে সোনার গ্বঁড়ো আছে। বড়রা যদি জিজ্ঞেস করে কোথা থেকে পেয়েছ তাহলে বলো: নীল নাগিনী আমাদের দিয়েছে আর বলেছে আমরা যেন আর বেশী খ্বঁজতে না যাই। তখন তারা তোমাদের কাছ থেকে আরো বেশী জানতে সাহস করবে না।'

তারপর মেয়েটি সেই গণ্ডিদ্বটোকে কাত করে দাঁড় করাল। তার ডান হাতটা রাখল সোনার উপর, বাঁ হাতটা কালোয় — আর তারপর মাঠের উপর দিয়ে সেগ্বলো গড়াতে গড়াতে নিয়ে চলে গেল। ছেলেরা তাকিয়ে দেখে — তখন সে আর মেয়ে

নয়, সেই নীল নাগিনী, আর সেই গাঁন্ডদুটো হয়ে গেছে ধুলো — ডান দিকেরটা সোনালী, বাঁ দিকেরটা কালো।

সেখানে তারা খানিক দাঁড়িয়ে থেকে পকেটের মধ্যে সেই সোনার তাল আর থলি রেখে বাড়ীর দিকে চলল। লাঙেকা কিন্তু বলল:

'যাই বল, ও কিন্তু আমাদের খুব বেশী সোনার গুঁড়ো দেয় নি।'

লেইকো উত্তর দিল:

'আমাদের যতটা পাওয়া উচিত, বোধ হয় ততটাই দিয়েছে।'

পথে যেতে যেতে লেইকো টের পেল যেন তার পকেটটা ভারি হয়ে উঠছে। থলিটা বার করে দেখল সেটা বড় হয়ে উঠেছে। লাঙেকাকে সে জিজ্ঞেস করল:

'তোর থলিটাও বড় হয়ে উঠেছে?'

'না, আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে।'

তাদের দুজনের সমান নেই বলে লেইকোর অস্বস্তি হচ্ছিল, বলল:

'আয়, আমার কিছু সোনার গুঁড়ো তোর-টায় ভরে দিই।'

লাঙেকা বলল, 'বেশ তো, দিতে যদি তোর কষ্ট না হয়।'

ছেলেরা পথের ধারে বসে থলি খুলে। সমান সমান করতে চাইল, কিন্তু হল না। লেইকো এক একমুঠো সোনার গুঁড়ো বার করে আর সেটা হয়ে যায় কালো। লাঙেকা বলল:

'হয়তো এটাও শুধু আর একটা ভেল্‌কি।'

নিজের থলি থেকে সে এক চিমটে সোনার গুঁড়ো বার করল, কিন্তু সেটা বদলাল না। সোনার গুঁড়োই রইল। সেই এক চিমটে সোনার গুঁড়ো সে লেইকোর থলিতে দিল, বদলাল না। তখন লাঙেকা টের পেল ব্যাপারটা কী — নীল নাগিনী তাকে কম দিয়েছে, কারণ তার বেশী পাবার লোভ হয়েছিল, সে লেইকোকে সে-কথাটা বলল — আর তার চোখের সামনে তার নিজের ছোট থলিটা উঠতে লাগল ভরে। দুজনেই তারা বাড়ী ফিরে এল থলি ভর্তি করে। তারা সেই সোনার গুঁড়ো আর তাল দিয়ে দিল নিজের নিজের বাড়ীর লোককে। বলল, নীল নাগিনী তাদের কী বলেছে।

সবাই অবশ্যই খুসি হয়ে উঠল। লেইকোদের বাড়ীতে আরো একটা ভালো খবর — অন্য গ্রাম থেকে ঘটকের দল এসেছে মারিউশ্‌কার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে। আনন্দে

ডগমগ হয়ে সে ছুটে বেড়াচ্ছে, আর তার মুখটাও হয়ে গিয়েছে একেবারে সোজা। আনন্দের দরুন হয়তো। পাত্রর চুল কেমন বুটিদার ঘোড়ার লোমের মতো তা সত্যি, কিন্তু খুব হাসিখুসি ধরনের, ছেলেদের ওপর দরাজ। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

ছেলেরা আর কখনো নীল নাগিনীকে ডাকে নি। তারা বুঝেছিল তাদের যদি প্রাপ্য হয় তাহলে নিজে থেকেই সে তাদের দেবে। তাদের দুজনের ভাগ্য ভালো ছিল। বোঝা যায়, তাদের কথা সেই সাপটার মনে ছিল, সোনার গণ্ডি দিয়ে দুর্ভাগ্যের কালো গণ্ডি থেকে আড়াল করে রেখেছিল তাদের।

পৃথিবীর চাবি

মণিরত্ন খোঁজার ব্যবসাটা কখনোই আমার বিশেষ পছন্দ হয় নি। মাঝে মাঝে দু'একটা পেয়েছি বটে, কিন্তু নিতান্তই দৈবক্রমে। বালি ধুতে ধুতে হঠাৎ দেখা গেল কী যেন চকচক করছে। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বিশ্বাসী কাউকে দেখাও, রাখব না ফেলে দেব?

সোনার ব্যাপারটা সহজ। অবশ্যই সেটারও নানা রকম ধরন আছে, কোনোটা ভালো, কোনোটা খারাপ, কিন্তু সোনা ঐ পাথরগুলোর মতো নয়। মণিরত্নের ব্যাপারে আকৃতি কিম্বা ওজন কোনোটারই মানে হয় না। একটা হয়তো বড়, একটা ছোট, দুটোই চকচক করছে সমানভাবে, কিন্তু পরীক্ষা করার পর দেখা গেল একেবারে আলাদা। বড়টার জন্যে লোকেরা কানাকড়িও দেবে না, এদিকে ছোটটার জন্যে হুড়োহুড়ি — আশ্চর্য টলটলে, তারা বলবে, এর থেকে আগুনের মতো ছটা বেরুবে।

মাঝে মাঝে আরো অদ্ভুত ঘটনাও ঘটে। একটা পাথর কেনার পর, চোখের সামনে দেখতে পাবে তার অর্ধেকটাই কেটে ফেলে দিচ্ছে। বলবে: ওটা শুধু এটাকে নষ্ট করছে, আভা কমে যাচ্ছে। তারপর বাকি অর্ধেকটা তারা ঘষবে, আর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে — এইবার ঠিক আসল রঙটি বেরিয়েছে, আলোয় আর মিটমিট করবে না। সত্যিই তাই, শেষ পর্যন্ত পাথরটা হল ছোট্ট, কিন্তু যেন জীবন্ত, হাসছে। আর তার দাম — সেটা হাসির ব্যাপার নয়, শুনলে খাবি খাবে। না, ওধরনের জিনিস সম্বন্ধে আমি কিছু বুঝি না!

কিন্তু ঐ সব কথা, অমুক রত্ন ধারণ করলে অসুখ সারে, অমুকটা ঘুমের সময় বাঁচায়, অমুকটায় দুঃখ দূর হয়, এ সব কথা — আমার মনে হয় ওগুলো একেবারে বাজে কথা, তাছাড়া আর কিছু নয়। বুড়োদের কাছ থেকে এমন একটা গল্প

শুনেছিলাম রত্ন সম্বন্ধে, সেটা আমার ভালো লেগেছিল। মানে, শাঁসওলা একটা শক্ত বাদামের মতো, যাদের দাঁত শক্ত তারাই ভেঙে খেতে পারবে।

লোকে বলে মাটির তলায় কোথাও এমন একটা পাথর আছে যার জুড়ি অন্য কোথাও নেই, শুধু আমাদের দেশে নয়, অন্যান্য দেশেও কেউ কখনো সেই পাথরটা খুঁজে পায় নি। কিন্তু সেটার কথা পৃথিবীর সবাই জানে। তবে সেই রত্ন আছে আমাদের দেশের নীচে। বুড়োরা সেটা জানতে পেরেছিল। শুধু কেউ জানে না সে জায়গাটা কোথায়, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ রত্নটা নিজে থেকেই আসল লোকের হাতে এসে পড়বে। সেই হল তার মজা। সেটার কথা লোকেরা জেনেছিল এক মেয়ের কাছ থেকে। লোকে বলে গল্পটা এই।

মুরজিন্‌কা না কোথায় ছিল একটা বড় খনি। সোনা আর নানা ধরনের জহরত পাওয়া যেত। কাজ চলত সরকার থেকে। ঝকঝকে বোতামওলা সব বড় কর্তা — একেবারে উর্দিপরা কসাই — ড্রাম বাজিয়ে লোকেদের তাড়িয়ে নিয়ে যেত কাজে। লোকেদের সার করে দাঁড় করিয়ে বেত দিয়ে মারত। মোট কথা, যন্ত্রণার এক শেষ।

এইখানে ছিল সেই মেয়েটি, ভাসিওন্‌কা। জন্মেছিল খনিতে, আর সেখানেই বড় হয়েছে, কিবা শীত কিবা গ্রীষ্ম। যে-ছাউনিতে সর্দাররা থাকত সেখানে তার মা ছিল রাঁধুনী; তার বাবার কথা ভাসিওন্‌কা কিছু জানে না।

ওধরনের ছেলেমেয়েরা যে কীভাবে দিন কাটায় সে তো জানাই আছে। কাউকে হয়তো থাকতে হয় মুখ বুজে। তারপর সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেলে মেয়েটিকে গালাগালি করত কিম্বা মাথায় চাঁটি মারত, কারণ কারুর ওপর তাদের মনের ঝাল ঝাড়তে হয় তো। হ্যাঁ, তার জীবনটা ছিল ভারি দুঃখের। অনাথদের চেয়েও খারাপ। খুব কম বয়েসে কাজে জুতে দেওয়ার হাত থেকে তাকে বাঁচাবার কেউ ছিল না। তখনো বয়েস হয় নি, লাগাম ধরবার মতো জোরও নেই, আর তাকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাল বইবার কাজে: 'লোকেদের পায়ের তলায় চাপা পড়ার বদলে বালি বইতে শুরু কর!'

সামান্য বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার হাতে একটা আঁচড়া দিয়ে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে পাঠানো হল বালির মধ্যে জহরত খুঁজতে। আর জানো, দেখা গেল এই কাজে

ভাসিওন্‌কার ভারি গুণ। সবার চেয়ে ঘন ঘনই সে জহরত পায়, সবগুলোই ভালো, দামী-দামী।

সে ছিল খুব সরল মেয়ে, যা পেত সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দিত দপ্তরে। অবশ্যই তারা খুসি হয়ে উঠত। কতকগুলো তারা দপ্তরে জমা দিত, কতকগুলো নিজেদের পকেটে আর কেউ-বা আবার রাখত গালে। খামকা তো আর লোকে বলে না — বড় কর্তা রাখে পকেটে, ছোট লোকেদের রাখতে হয় লুকিয়ে। সবাই তারা ভাসিওন্‌কার একবাক্যে প্রশংসা করত, তারা তার একটা ডাকনামও দিল — 'শুভদৃষ্টি'। কোনো কর্তা এলে সঙ্গে সঙ্গে যেত সোজা ভাসিওন্‌কার কাছে:

'কি শুভদৃষ্টি, পেলে কিছু?'

তার কাছে যা থাকত ভাসিওন্‌কা দিয়ে দিত তাকে, অমনি সে আহ্লাদে আটখানা হত:

'বা, বা, বা! লক্ষ্মী মেয়ে, ভালো করে খোঁজ, ভালো করে খোঁজ!'

ভাসিওন্‌কা খুঁজত, কারণ খুঁজতে তার ভালো লাগত।

একবার সে নিজের আঙুলের মতো বড় একটা রত্ন পেল। সেটা দেখতে সব কর্তারা এল দৌড়ে। তাই সেবার কেউ সেটা চুরি করতে পারল না, পাঠাতে হল ব্যাঙ্কে। লোকে বলে তারপর সেটা রাজার কোষাগার থেকে বিদেশে চলে যায়। তবে সেটা অন্য কথা।

ভাসিওন্‌কার সৌভাগ্যের জন্যে অন্যান্য মেয়েদের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল, ওপরওয়ালারা তাদের ক্রমাগত দিত গঞ্জনা।

'কেন ও বেশী খুঁজে পায়, আর তোমরা নিয়ে আসো বাজে মাল, তাও সামান্য? তোমরা মন দিয়ে খোঁজো না।'

ভাসিওন্‌কাকে সুপরামর্শ দেবার পরিবর্তে মেয়েরা হিংসে করে তার বিরুদ্ধে জোট পাকাল। তার জীবন হয়ে পড়ল অত্যন্ত দুঃখের। তারপর এল একটা কুত্তা, বড় সর্দার। বোঝা গেল ভাসিওন্‌কার সৌভাগ্যে তার লোভ হয়েছিল, বলল:

'এই মেয়েকে বিয়ে করব।'

বহুকাল আগেই তার দাঁত ক্ষয়ে গেছে। তার উপর দুর্গন্ধের দরুন তার

পাঁচ হাত কাছে আসা যায় না, যেন তার ভিতরটাও পচে গেছে। তাহলেও নাকি সুরে সে ক্রমাগত বলতে লাগল:

'শোনো, মেয়ে, তোমাকে ভদ্রমহিলা করে তুলব, কথাটা মনে রেখো। যে-পাথর পাবে সেগুলো আমাকে দিও, আর কাউকে নয়। অন্যদের সেগুলো মোটেই দেখিও না।'

ভাসিওন্‌কা লম্বা, কিন্তু বিয়ে করার বয়েস তার হয় নি। সম্ভবত তার বয়েস ছিল তেরো কিম্বা চোদ্দ। কিন্তু সর্দার হুকুম করলে কে সে-কথা তুলবে? পাদ্রী খাতায় যেকোনো বয়েস লিখে দেবে। তা ভাসিওন্‌কা বাস্তবিকই ভয় পেয়ে গেল। সেই পচ-ধরা পাত্রকে দেখলেই তার হাত-পা থরথর করে উঠত। যাকিছু সে পায় সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেয় তাকে। লোকটা ক্রমাগত ঘড়ঘড় করে বলে:

'ভাসিওন্‌কা, ভালো করে খোঁজো, ভালো করে খোঁজো! আসছে শীতে তুমি পালকের বিছানায় ঘুমবে।'

সে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাসিওন্‌কাকে নিয়ে মেয়েরা টিটকারি দিতে শুরু করত। পারলে নিজেই সে নিজেকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে রাজী ছিল। সন্ধের ড্রাম বাজার পর সে ছাউনিতে ছুটে যেত তার মার কাছে, কিন্তু তাতে ফল হত আরো খারাপ। মার অবিশ্যি তার জন্যে দুঃখ হত বৈকি, সে যথাসাধ্য চেষ্টা করত তাকে রক্ষা করতে। কিন্তু ছাউনির রাঁধুনীর আর সাধ্যি কতটুকু, বড় সর্দার যে তারও কর্তা, ইচ্ছে করলে যেদিন খুসি তাকে সে নিয়ে যেতে পারত চাবুক মারতে।

শীত পর্যন্ত ভাসিওন্‌কা তাকে ঠেকাতে পারল, কিন্তু তার বেশী পারল না। প্রতিদিনই সর্দার আসতে শুরু করল তার মায়ের কাছে:

'ভালো মনে কন্যে দাও, নইলে বিপদে পড়বে!'

মেয়ে যে বিয়ের পক্ষে খুব ছোট সে-কথা বলে লাভ নেই, কারণ পাদ্রীর লেখা কাগজটা সে তার নাকের কাছে তুলে ধরবে।

'আমার কাছে মিথ্যে কথা বলতে চেষ্টা করছ! গির্জের খাতায় লেখা আছে তার বয়েস ষোলো। আইন সম্মত বয়েস। একগুঁয়েমি না ছাড়লে কালকেই তোমাকে চাবুক মারতে হুকুম দেব।'

মাকে তাই মত দিতে হল:

'দেখছি, বাছা, এটাই তোর কপাল, এর থেকে নিস্তার নেই।'

আর সেই মেয়েটি? তার হাত-পায়ের যেন খিল খুলে গেল, একটি কথাও বলতে পারল না। কিন্তু রাত্রে সেটা কেটে গেল। খনি থেকে সে গেল পালিয়ে। যাবার সময় বিশেষ সাবধানও হল না। পথ ধরে সোজা লাগল চলতে, কোথায় তা একবার ভাবলও না। শুধু খনি থেকে যত দূরে পারে চলে যাবে।

আবহাওয়াটা গরম, বাতাস নেই। সন্ধেয় শুরু হয়েছিল তুষার পড়তে। পালকের মতো হালকা ফুলকি। পথ ধরে সে বনে এসে পড়ল, সেখানে নেকড়ে-টেকড়ে আছে বৈকি, কিন্তু ভাসিওন্‌কা তাদের ভয় করে না। সে মন ঠিক করে ফেলেছে।

'ঘাটের মড়াকে বিয়ে করার চেয়ে নেকড়ের পেটে যাওয়া ভালো।'

এইভাবে সে ক্রমশ এগিয়ে চলল। প্রথমে চলল একেবারে পা চালিয়ে। ধরো এই সাত কি দশ ক্রোশ সে গেল। জামাকাপড় তার বলার মতো কিছু নয়, কিন্তু ঠাণ্ডা লাগছিল না তার, এমন কি গরমই লাগতে লাগল। তুষার বেশ গভীর, তার হাঁটু পর্যন্ত, বহু কষ্টে পা টানতে হয়। তাইতে সে উঠল গরম হয়ে। তুষার কিন্তু ক্রমাগত পড়ে চলল, আগের চেয়ে বেশী ঘন হয়ে, বাস্তবিকই একটা ঢিপের মতো। শেষে ভাসিওন্‌কা একেবারে হয়রান হয়ে পড়ল, বসে পড়ল পথের পাশেই।

ভাবল, 'একটু জিরিয়ে নিই।' সে জানত না ঐ রকম আবহাওয়ায় খোলা জায়গায় বসে থাকা সবচেয়ে খারাপ।

সেখানে সে বসে বসে চেয়ে রইল তুষারের দিকে। তুষার ওদিকে ক্রমাগত পড়ে পড়ে তার গায়ে আটকাতে লাগল। খানিক বসার পর দেখে একেবারেই সে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। কিন্তু ভয় পেল না, ভাবল:

'আরো খানিক বসে থাকতে হবে দেখছি, ভালো করে জিরিয়ে নিই।'

সে বিশ্রাম করতে লাগল। তুষার তাকে একেবারে ঢেকে দিল, তাকে দেখাতে লাগল পথের পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা একগাদা খড়ের মতো। অথচ কাছেই ছিল একটা গ্রাম।

ভাগ্য ভালো, সকালের দিকে একজন গ্রামবাসী এল — গ্রীষ্মকালে সে খুঁজত সোনা আর পাথর। সে এল একটা ঘোড়া আর একটা স্লেজ নিয়ে। ঘোড়াটা থেমে

গিয়ে নাক দিয়ে শব্দ করতে লাগল, সেই গাদাটার কাছে যেতে চাইল না। লোকটা তখন তাকিয়ে দেখে কোনো মানুষ চাপা পড়েছে। কাছে এল সে। দেখল শরীরটা সম্পূর্ণ জমে যায় নি, তার হাতদুটো বাঁকানো যাচ্ছে। তাই ভাসিওন্‌কাকে স্লেজের মধ্যে তুলে নিজের ভেড়ার চামড়া দিয়ে ঢেকে তাকে নিয়ে এল বাড়ীতে। তারপর সে আর তার স্ত্রী তাকে ঘষে ঘষে আবার প্রাণ ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল। পারলও। চোখ মেলল সে, আঙুল গেল খুলে। তার একটা হাতে দেখা গেল একটা বড় জ্বলজ্বলে পাথর, খাঁটি নীলাভ রঙের। লোকটি এমন কি ভয়ই পেয়ে গেল। এরকম একটা জিনিস জেলে পাঠাতে পারে। জিজ্ঞেস করল:

'কোথা থেকে পেলে?'

ভাসিওন্‌কা বলল:

'আপনা থেকেই আমার হাতে উড়ে এসেছে।'

'সে কী? কেমন করে?'

ভাসিওন্‌কা তাই সব কথা তাকে বলল।

যখন তুষার তাকে একেবারে ঢেকে দিতে শুরু করে তার সামনে মাটির মধ্যে হঠাৎ খুলে যায় একটা পথ। খুব চওড়া নয়, অন্ধকারও, কিন্তু সেটা দিয়ে যাওয়া যায়। সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। ভিতরটা গরমও। ভাসিওন্‌কা খুসি হল। ভাবল:

'খনির কোনো লোক কখনো এখানে আমাকে খুঁজে পাবে না।' এই ভেবে সিঁড়ি দিয়ে যায় নেবে। অনেকক্ষণ ধরে নামার পর শেষে একটা বিরাট মাঠে এসে পেঁছয়। এতো বিরাট যে, মনে হয় তার বুঝি শেষ নেই। সেখানে ছিল চাবড়া চাবড়া ঘাস আর এখানে-ওখানে ঝোপ, গাছ কম, শরৎকালে যেমন হয় সেরকম হলদে। তার মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে একটা নদী, মিশমিশে কালো, কিন্তু একটাও ঢেউ নেই সেখানে — যেন পাথর। ভাসিওন্‌কার ঠিক সামনে অন্য পারে ছিল একটা ঢিবি। সেটার চূড়ায় বড় একটা পাথর ঠিক টেবিলের মতো। তার চারিধারে ছোট ছোট টুলের মতো পাথর। কিন্তু লোকে যেরকম আকারের টুল ব্যবহার করে সেরকম নয়, অনেক বড়। জায়গাটা ঠাণ্ডা আর কী রকম যেন ভয়ঙ্কর ধরনের।

ভাসিওন্‌কা ফিরে আসবে ভাবছে। হঠাৎ সেই ঢিবিটার পিছন থেকে ফুলকি উঠতে লাগল। তাকিয়ে দেখে সেই টেবিলটার উপর একগাদা দামী-দামী পাথর।

নানা রঙে সেগুলো ঝিকমিক করছিল, তাতে নদীটা হয়ে উঠল কেমন খুসি-খুসি। তারপর কে যেন প্রশ্ন করল:

'এগুলো কার জন্যে?'

নীচে থেকে চিৎকার এল:

'সরল লোকের জন্যে।'

সেই মুহূর্তে চারিদিকে পাথরগুলো রঙীন ফুলকির বৃষ্টির মতো ছড়িয়ে যায়।

ঢিবিটার পিছন থেকে আবার আগুনের ঝলক দিয়ে টেবিলের উপর নতুন একগাদা পাথর ফেলল ছুঁড়ে। অনেক পাথর। একটা খড়ের গাড়ী ভরে ফেলতে পারে। এগুলো আরো বড় বড়। আবার কে যেন প্রশ্ন করল:

'এগুলো কার জন্যে?'

নীচে থেকে উত্তর এল:

'সহ্যশক্তি যাদের আছে তাদের জন্যে।'

ঠিক আগের বারের মতোই চারিদিকে পাথরগুলো ছিটকে গেল। মনে হয় যেন এক ঝাঁক কাঁচপোকা উড়ছে, শুধু এই তফাত যে, নানা রঙে সেগুলো ঝকমক করে, কোনোটা লাল, কোনোটা সবুজ আর নীল। হলদেও ছিল—সবরকমের। ছিটকে যাওয়ার সময় সেগুলো গুন্‌গুন্‌ করে ওঠে। ভাসিওন্‌কা সেই কাঁচপোকাগুলোর দিকে চেয়ে আছে, এমন সময় ঢিবিটার পিছন থেকে আবার জ্বলে উঠল সেই আগুনের শিখা, টেবিলের উপর এসে পড়ল এক গাদা পাথর। এবারের গাদাটা বেশ ছোট, কিন্তু সব পাথরই বড় বড় আর ভারি সুন্দর। নীচে থেকে সেই স্বর চিৎকার করে উঠল:

'এগুলো সাহসী আর শুভদৃষ্টির জন্যে।'

পরের মুহূর্তে পাথরগুলো ছোট ছোট পাখির মতো ঝাপটা মেরে চারিদিকে উড়ে যায়। দেখায় যেন মাঠের উপরে দোদুল্যমান ছোট ছোট মশাল। কোনো তাড়াহুড়ো না করে শান্তভাবে সেগুলো ওড়ে। একটা পাথর ভাসিওন্‌কার দিকে উড়ে এসে তার হাতের মধ্যে ঠাঁই নেয়, যেন একটা বিড়ালছানা মাথা গুঁজে বলছে: এই তো আমি, আমাকে নাও!

সব পাথরগুলো পাখির মতো উড়ে যাবার পর জায়গাটা বেশ অন্ধকার হয়ে যায়। এর পরে কী ঘটে দেখার জন্যে ভাসিওন্‌কা অপেক্ষা করে। তারপর টেবিলের উপর দেখা যায় আর একটি পাথর। সেটাকে দেখায় সাধারণ একটা পাঁচ পলের পাথরের মতো, তিনটে লম্বালম্বি আর দুটো আড়াআড়ি। সঙ্গে সঙ্গে সব আলো আরো গরম হয়ে ওঠে। ঘাস আর গাছ হয়ে যায় সবুজ, গান গায় পাখি, নদীটা ঝকমক করে ঢেউ তোলে। যেখানে ছিল শূন্য বালি মাটি, সেখানে দেখা যায় ঘন ফসল। লোকজনও দেখা গেল অনেক। সবাই হাসিখুসি। মনে হয় যেন কাজ থেকে বাড়ী ফিরছে, তারাও গান গাইছে।

তারপর ভাসিওন্‌কা নিজেই চিৎকার করে ওঠে:

'ওটা কার জন্যে, কাকুরা?'

নীচে থেকে সেই স্বর তাকে উত্তর দেয়:

'লোককে যে সত্যিকারের পথে নিয়ে যায় তার জন্যে। এই চাবি-পাথরটা দিয়ে সে পৃথিবীকে খুলবে, আর তারপর এইমাত্র যা দেখলে তাই ঘটবে।'

ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে আলো মিলিয়ে যায়। সবকিছু অদৃশ্য হয়।

প্রথমে সোনা-খুঁজিয়ে আর তার বৌ তার কথা বিশ্বাস করতে চায় নি। তারপর ভাবল — ওরকম পাথর কোথায় সে পেতে পারে! জিজ্ঞেস করতে লাগল, কোথা থেকে আসছে, আর সে কে। কোনো কথা না চেপে সবকিছু সে বলল। নিজেই মিনতি করল:

'ওখানকার ওদের জানতে দিও না কোথায় আছি!'

সেই লোকটি আর তার বৌ এ বিষয়ে খানিক ভেবেচিন্তে বলল:

'ঠিক আছে, আমাদের সঙ্গেই থাকো... কোনো রকমে লুকিয়ে রাখব, কিন্তু তোমাকে ডাকব ফেনিয়া বলে। মনে রেখো, ঐ নামে তুমি সাড়া দিও।'

জানো তো, তাদের নিজেদের মেয়ে কিছুকাল আগে মারা গিয়েছিল, তার নাম ছিল ফেনিয়া। বয়েস ছিল ঠিক ভাসিওন্‌কার মতো। আরো একটা ব্যাপারে সুবিধে হল, এই গ্রামটা সরকারী মহলের মধ্যে নয়, এটা ছিল দেমিদভের জমিদারিতে।

তাই হল। কর্তার মোড়ল সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল মেয়েটি এখানে নতুন এসেছে।

16—1115

কিন্তু তাতে তার কী আসে যায়? তার কাছ থেকে তো সে পালিয়ে আসে নি। একজোড়া বাড়তি হাত খারাপ নয়। তাই সে তাকে কাজে লাগাল।

অবশ্যই দেমিদভের জমিদারিতেও জীবন খুব সুখের নয়, কিন্তু তাহলেও সরকারী মহালের মতো নয়। ভাসিওন্‌কার হাতের পাথরটাও কাজ দিল। লুকিয়ে সেটা বিক্রি করল লোকটা। অবশ্যই আসল দাম পেল না, তা সত্ত্বেও বেশ কিছু টাকা। খানিকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ভাসিওন্‌কা বড় মেয়ে হয়ে উঠলে ঐ গ্রামেরই একটি ভালো ছেলেকে বিয়ে করল। বরাবর তার সঙ্গেই থাকে, ছেলেপুলে, নাতিপুতি হয়।

লোকে তাকে বলত ফেদোসিয়া দিদিমা। সম্ভবত সে তার পুরনো নাম আর শুভদৃষ্টি ডাক নামটাও ভুলে গিয়েছিল। খনির কথা কখনো সে বলেও নি। কিন্তু কেউ কোনো ভালো পাথর পেয়েছে, এমন কথা উঠলে সর্বদাই সে ফোড়ন কাটত।

বলত, 'ওতে আর কেরদানি কী। ভালো পাথর পেলে আমাদের ভাই-বন্ধুদের খানিকটা কপাল ফেরে। পৃথিবীর চাবিটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করাই বরঞ্চ ভালো।'

তারপর সে বলত:

'এমন একটা পাথর আছে, যেটা পৃথিবীকে খোলবার চাবি। কিন্তু সময় না হলে কেউ সেটা পাবে না — সরল, সহ্যশীল, সাহসী কিম্বা সুখকপালী কেউ না। কিন্তু লোকে যখন ঠিক পথ ধরবে, তখন যে-লোক আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তার হাতের মধ্যে ঐ পৃথিবীর চাবিটা নিজেই আসবে উড়ে। আর তখন পৃথিবীর সমস্ত দৌলত যাবে খুলে, জীবন হবে এক্কেবারে অন্য ধরনের। সেই দিকে মন দাও!'

নীল বুড়ির কুয়ো

সময় আমাদের খনিতে ছিল ইলিয়া নামে একটি ছেলে। একেবারে একা, আপনজন সবাই মারা যায়। সবাই কিছু কিছু তার জন্যে রেখে গিয়েছিল।

বাবার কাছ থেকে সে পায় কাঁধ আর হাত, মা'র কাছ থেকে জিভ আর দাঁত, ইগ্‌নাত্‌ ঠাকুর্দার কাছ থেকে কুড়ুল আর কোদাল, আর ঠাকুমা লুকেরিয়ার কাছ থেকে বিশেষ স্মারক চিহ্ন। সেটার কথাই প্রথমে বলা যাক।

এখন — এই বুড়ি ছিল খুব বুদ্ধিমতী। নাতির বালিশ করার জন্যে পথ থেকে সে পালক কুড়িয়ে জমাত, কিন্তু শেষ করার সময় পায় নি। যখন তার সময় ঘনিয়ে এল তখন ইলিয়াকে ডেকে বলল:

'দেখ, বাছা ইলিয়া, ঠাকুমা তোর কত পালক জমিয়েছে! প্রায় একটা চালুনী ভরা। আর কী সুন্দর পালক সেগুলো — সবই সমান মাপের, ছোট ছোট, রঙচঙে। দেখেও আনন্দ। স্মৃতি-চিহ্ন হিসেবে তুই নে। কাজে লাগবে।

'তোর বিয়ের সময় মেয়েটি যদি বালিশ নিয়ে আসে তাহলেও তুই লজ্জায় পড়বি না। বলতে পারবি, আমার নিজেরই পালক আছে, ঠাকুমা দিয়ে গেছেন।

'তবে তুই বালিশের পিছনে ছুটবি না। যদি আনে ঠিক আছে, না আনে — রাগ করবি না। খুসি মনে চলবি, খেটে কাজ করবি, খড়ের বিছানাতেও ঘুম খারাপ হবে না, ভালো স্বপ্ন দেখবি। তোর মাথা থেকে খারাপ চিন্তা তাড়াবি, তাহলেই তোর সবকিছু ভালো হবে। আলোর দিন তোকে ফুর্তি দেবে, আঁধার রাত তোকে দেবে সোহাগ, সোনালী সূর্য তোকে চাঙ্গা করবে। কিন্তু খারাপ চিন্তা যদি আসতে দিস তাহলে গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠুকবি। সবই হবে খারাপ।'

ইলিয়া জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু, ঠাকুমা, ঐ খারাপ চিন্তাগুলো কী?'

বুড়ি বলল, 'টাকার চিন্তা, দৌলতের চিন্তা। এর চেয়ে খারাপ কিছু নেই। এগুলো মানুষকে শুধু অস্বস্তি আর যন্ত্রণা দেয়। সৎ পথে থাকলে একটা বালিশের মতো পালকও তোর জুটবে না, দৌলত তো দূরের কথা।'

ইলিয়া বলল, 'কিন্তু মাটির তলাকার দৌলতের বেলায়? সেটাও খারাপ? মাঝে মাঝে এমন তো ঘটে...'

'হ্যাঁ, ঘটে কিন্তু তার ওপর ভরসা নেই। এল দলা-দলা, গেল ধুলো হয়ে। সঙ্গে আনে শুধু কষ্ট। ওর কথা তুই ভাবিস না, ওটা নিয়ে মাথা ঘামাস না। লোকে বলে, মাটির তলার দৌলতের মধ্যে শুধু একটাই খাঁটি। নীল বুড়ি যখন সুন্দরী মেয়ে হয়ে নিজের হাত দিয়ে সেটা দেয়। দেয় সে তাদেরই, যারা কুশলী, দুঃসাহসী আর সরল। অন্য কাউকে নয়। তাই, বাছা ইলিয়া, আমার শেষ কথাগুলো মনে রাখিস।'

ইলিয়া তখন তার ঠাকুমাকে নত হয়ে কুর্নিশ করল।

'লুকেরিয়া ঠাকুমা, এই পালকগুলোর জন্যে তোমায় ধন্যবাদ, কিন্তু আরো বেশী ধন্যবাদ তোমার কথার জন্যে। চিরকাল মনে রাখব।'

অল্প পরেই ঠাকুমা মারা গেল... ইলিয়া হয়ে পড়ল একেবারে একলা, তার বড়ও কেউ নেই, ছোটও কেউ নেই। অবশ্য বৃদ্ধারা ছুটে এল মৃতদেহকে ধোয়াতে, সাজাতে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে। মরার কাছে তারা আসে খুব আনন্দ আছে বলে তো নয়। কেউ এটা-ওটা চায়, কেউ লুকিয়ে তাকায় কী নেবে। ঠাকুমা যা রেখে গিয়েছিল তার সবটাই ওরা দেখতে নিয়ে নিল। কবরখানা থেকে ইলিয়া ফিরে এসে দেখল কুটীর একেবারে পরিষ্কার। পেরেকের গায়ে যা ঝুলিয়ে রাখল — তার কোট আর টুপি — সেগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই। একজন এমন কি ঠাকুমার পালকগুলোও নিয়ে গেছে, চালুনীটাকে দিয়েছে একেবারে ফাঁকা করে। শুধু তিনটে পালক পড়ে রয়েছে — একটা শাদা, একটা কালো আর তৃতীয়টা লাল।

ঠাকুমার উপহারকে সে যত্ন করে রাখতে পারে নি বলে ইলিয়ার দুঃখ হল।

ভাবল: 'অন্তত এই তিনটি পালক জমিয়ে রাখি। নইলে ভারি খারাপ হবে। কত কষ্টে ঠাকুমা এগুলো জোগাড় করেছে। আমার যেন তাতে কিছুই এসে যাবে না।'

মেঝের উপর সে একটুকরো নীল সুতো দেখতে পেল, সেটা দিয়ে একসঙ্গে বাঁধল সেই পালকগুলো। তারপর সেটা আটকে দিল নিজের টুপিতে।

ভাবল: 'এটাই ওদের ঠিক জায়গা। এটা যখন পরব কিম্বা খুলব তখনই আমার ঠাকুমার কথা মনে পড়বে। বেঁচে থাকার সদুপদেশ — চিরকাল কথাগুলো মনে রাখা দরকার।'

তারপর সে তার টুপি আর কোট আবার পরে ফিরে গেল খনিতে। ঘরের দরজা বন্ধ করল না, কারণ সেখানে কিছুই নেই। শুধু আছে সেই খালি চালুনী, পথের পাশে পড়ে থাকলেও সেটা কুড়বার মানে হয় না।

ইলিয়া বড় হয়ে উঠেছে, বহুকাল হয়েছে তার বিয়ের বয়েস। ছ'সাত বছর ধরে সে সোনার খনিতে কাজ করছে। তখনকার দিনে ভূমিদাস প্রথা ছিল। ছেলে আর মেয়েদের কাজে যেতে হত খুব ছোটবেলা থেকেই। বিয়ের আগে অনেককেই কর্তার জন্যে দশ বছর ধরে খাটতে হত। ইলিয়ার বেলায় বলা যায় সোনার খনিতেই সে বড় হয়ে উঠেছে।

সে জায়গাটার সবই সে জানত। খনিতে যাবার পথটা লম্বা। শোনা যায়, গ্রেমিখার লোকেরা প্রায় 'শ্বেত-পাথরের' কাছে সোনা পাচ্ছিল। ইলিয়া তাই নিজের মনে ভাবল:

'জুজেল্কা জলার ভিতর দিয়ে ছোট পথটা ধরব। আবহাওয়া এখন গরম, ওটা খানিক শুকিয়েছে, তার ভিতর দিয়ে যেতে পারব। এতে দেড় ক্রোশ কম হবে, হয়তো দুই।'

তাই সে করল। বনের মধ্যে দিয়ে সোজা গেল, শরৎকালে লোকে যেমন যায়। প্রথমে গেল পা চালিয়ে, তারপর সে হয়রান হয়ে পড়ল। গিয়ে পেঁছিল ঠিক পথ থেকে দূরে। ঘাসের চাবড়ার উপর লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে হলে পথ সোজা থাকে কি? যেতে হবে যেদিকে, চাবড়াগুলো সেদিকে নয়, লাফাতে লাফাতে ঘেমে উঠল। শেষ পর্যন্ত বনের মধ্যে এক নীচু জায়গায় সে পেঁছিল। মাঝখানে একটা খাল। সেখানে ঘাস জন্মেছে — সর্ষে, আগাছা। পাশের পাড়ে ঝুনো পাইন গাছ। মানে, এখান থেকেই শুকনো জমি শুরু হয়েছে। শুধু বিপদ, ইলিয়া জানে না তারপর

কোন দিকে যেতে হবে। এর আগে যতবারই এখানটায় এসেছে — ঐ নীচু জমিটা কখনো দেখে নি।

ইলিয়া তার মাঝখান দিয়ে চলল, পাড়দুটোর মাঝখান দিয়ে। যেতে যেতে দেখে একটা ছোট গোল কুয়োর মতো, তাতে জল, শুধু তলাটা দেখা যায় না। জলটা পরিষ্কার, কিন্তু একটা নীল মাকড়সার জাল তার উপরটা ঢেকে দিয়েছে। মাঝখানে বসে আছে একটা মাকড়সা। সেটারও রঙ নীল।

জল দেখে ইলিয়া খুসি হয়ে উঠল। জল খাবার জন্যে একপাশ থেকে মাকড়সার জালটা দিল ঠেলে। অমনি তার মাথা ঘুরতে শুরু করল। আর একটু হলেই জলের মধ্যে পড়ে যেত। দারুণ ঘুম পেল তার।

ভাবল: 'কী ক্লান্তই না হয়ে পড়েছি। দু'এক ঘণ্টা বরং জিরিয়ে নেওয়া ভালো।'

দাঁড়িয়ে উঠতে চাইল সে, কিন্তু পারল না। তা সত্ত্বেও কোনো রকমে গুড়ি মেরে পাড়ের দিকে গজ দু' এক গেল। সেখানে টুপিটা মাথার তলায় গুঁজে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। পিছনে তাকাল সে — দেখতে পেল ছোট্ট একটা বুড়িকে, জল থেকে উঠছে। লম্বায় সে ত্রিশ ইঞ্চির বেশী নয়। পোষাকটা নীল, মাথার রুমালটাও। শরীরটাও নীলচে রঙের। এত রোগা যে মনে হবে বাতাসের প্রথম দমকাই তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু চোখ তার তরুণীর মতো, নীল, আর এতো বড় যে, মনে হয় সেগুলো যেন তার মুখের নয়।

ছোকরার দিকে তাকিয়ে সে হাতদুটো বাড়িয়ে দিল। হাতদুটো লম্বা হয়ে উঠতে লাগল। শেষটায় সে-দুটো তার মাথার কাছে পেঁছল। তাদের মধ্যে যেন সার কিছুই নেই, যেন নীল কুয়াশা। কোনো শক্তি নেই, নখও নেই, কিন্তু তবু ভয়ঙ্কর। ইলিয়ার ইচ্ছে হল গুড়ি মেরে আরো দূরে সরে যায়, কিন্তু পারল না।

ভাবল, 'আমার পিছনে ফিরব, তাহলে আর অত ভয়ঙ্কর মনে হবে না।'

তাই সে করল। তার নাকে ঘষে গেল সেই পালকগুলো। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ সে হাঁচতে শুরু করল। ক্রমাগত হেঁচে হেঁচে নাক দিয়ে গলগল করে বেরুতে লাগল রক্ত। থামে না। তবে টের পেল মাথাটা হালকা হয়ে উঠছে। ইলিয়া তখন তার টুপিটা মুঠো করে ধরে উঠে দাঁড়াল। দেখল, বুড়িটাও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে, রাগে

কাঁপছে। তার হাতদ্বটো ইলিয়ার পায়ের কাছে, কিন্তু সেগ্বলো মাটি থেকে তুলতে পারছে না। ইলিয়া ব্বঝল ব্বড়ির মতলবটা খাটে নি। হাত দিয়ে তাকে চেপে ধরবার শক্তি তার নেই। আরো বার দ্ব' এক সে হেঁচে নাক ঝাড়ল আর টিটকারি দিয়ে বলল:

'কী, ব্বড়ি, পারলে না, এ্যাঁ। দেখছি তোমার সাধ্যি নেই।'

তার হাতদ্বটোর উপর থ্বথ্ব ফেলে যাবার জন্যে সে ঘ্বরে দাঁড়াল। কিন্তু কুমারী মেয়েদের মতো চনমনে গলায় ব্বড়ি বলল:

'দাঁড়াও-না, অত আহ্লাদ করো না, পরের বার যখন আসবে তখন নিজের মাথা আস্ত নিয়ে ফিরতে পারবে না!'

'আমি আসবই না,' ইলিয়া উত্তর দিল।

'বটে! ভয় পেয়েছ দেখছি। ভয় পেয়ে গেছ!' আহ্লাদে ডগমগ হয়ে ব্বড়ি চিৎকার করে উঠল।

এতে ইলিয়ার আঁতে ঘা লাগল, দাঁড়িয়ে পাড়ে উঠল। উত্তর দিল:

'বেশ, তাই যদি হয়, তাহলে ইচ্ছে করেই আসব। তোমার কুয়ো থেকে জল নিয়ে যাব।'

শ্বনে হেসে ব্বড়ি ছেলেটিকে টিটকারি দিতে শ্বর্ব করল:

'তোমার যে ভারি দেমাক, দেমাকে কোথাকার। পার পেয়ে যাবার জন্যে তোমার ঠাকুমাকে ধন্যবাদ জানালে পারতে, আর নিজে কিনা বড়াই করছ! এমন মান্বষ জন্মায় নি, যে এই কুয়ো থেকে জল নিয়ে যেতে পারে!'

'সেরকম লোক জন্মেছে কিনা দেখা যাবে,' ইলিয়া বলল।

ব্বড়ি কিন্তু ক্রমাগত বকবক করে চলল:

'কথার ফান্বস তুমি, আর কিছ্ব না। তোমার তো কাছে আসতেই ভয়, কী করে জল পাবে? লম্বা লম্বা শ্বধ্ব কথা, তাছাড়া আর কিছ্ব নয় — অন্যদের সঙ্গে করে না আনলে আসবে না। তোমার চেয়ে যাদের সাহস বেশী!'

ইলিয়া চিৎকার করে উঠল, 'অন্যদের তোমার কাছে আনব, সেই কথা ভেব না। শ্বনেছি তো, কেমন তুমি অনিষ্টকারী, লোকদের কেমন ছলনা করো।'

ব্বড়ি কিন্তু ক্রমাগত একই কথা ঘ্যানঘ্যান করে চলল:

'আসবে না! আসবে না! এটা তোমার ধাতে সইবে না! এ কাজ তোমাদের মতো লোকেদের জন্যে নয়!'

সে-কথা শুনে ইলিয়া বলল:

'বেশ তাহলে। রবিবারে বাতাস যদি ভালো বয়, তাহলে আমাকে আশা করতে পার।'

বুড়ি প্রশ্ন করল, 'বাতাস ভালো বওয়াতে চাইছ কেন?'

ইলিয়া বলল, 'তখন দেখা যাবে। হাতের থুথুটা কিন্তু মুছে রেখো। ভুলো না!'

বুড়ি বলল, 'কী হাত তোমাকে তলায় টেনে নিয়ে যাবে তাতে তোমার কী? বুঝতে পারছি তুমি সাহসী ছেলে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাকে পাকড়াব। বাতাস কিম্বা তোমার ঠাকুমার দেওয়া পালকগুলোর ওপর ভরসা করে থেকো না। ওতে কিছু হবে না!'

এইভাবে কথা কাটাকাটি করে তারা বিদায় নিল। পথে চিহ্ন রেখে ইলিয়া এগিয়ে গেল।

ভাবল: 'নীল বুড়িটা তাহলে এই রকম। দেখে মনে হয়, এখুনি বুঝি মরবে, কিন্তু চোখদুটো কুমারীদের মতো। মোহিনী। স্বরটাও তরুণীদের মতো শোনায়। ইচ্ছে হয় দেখি, কেমন সে সুন্দরী কুমারীর রূপ নেয়।'

নীল বুড়ি সম্বন্ধে ইলিয়া অনেক কথা শুনেছিল। খনিতে প্রায়ই তার সম্বন্ধে আলোচনা হত। নির্জন জলা আর পড়ো খনির মধ্যে লোকেরা তাকে দেখতে পেত। যেখানেই সে বসত সেখানেই থাকত দৌলত। তাকে সরাতে পারলে যেখানে সে ছিল, সেখানে থাকত এক রাশ সোনা আর জহরত। যত পারো তুলে নাও। অনেকে তাকে খুঁজেছিল, কিন্তু হয় তারা ফিরে এসেছিল শূন্য হাতে, নয়ত ফেরেই নি।

খনিতে ইলিয়া যখন এসে পড়ল তখন সন্ধে। ঠিকেদার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গালাগালি করতে লাগল:

'এতক্ষণ কোথায় ছিলি?'

ইলিয়া খুলে বলল — ঠাকুমা লুকেরিয়াকে কবর দিয়ে এসেছে। সে-কথা শুনে ঠিকেদারের খানিক লজ্জা হল, কিন্তু তাহলেও খুঁত ধরার জন্যে বলল:

'তোর টুপিতে ঐ পালক কিসের জন্যে? এত আনন্দ কেন!'

ইলিয়া বলল, 'ওগ্‌বলো ঠাকুমা আমার জন্যে উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। তাঁকে যাতে মনে পড়ে সেইজন্যে এগ্‌বলো ওখানে আটকেছি।'

ঠিকেদার আর সেখানকার লোকজনরা এই ধরনের সম্পত্তি পাওয়ায় হেসে উঠল। ইলিয়া কিন্তু বলল:

'হ্যাঁ, কর্তার সমস্ত খনির বদলেও এ পালক দেব না। এগ্‌বলো সাধারণ পালক নয়, এগ্‌বলোর মধ্যে যাদ্‌ব আছে। শাদাটা হাসিখ্‌বসি দিন, কালোটা নির্ঝঞ্ঝাট রাত, আর লালচেটা লাল স্‌ব্যের জন্যে।'

অবশ্য সে ঠাট্টা করে কথাগ্‌বলো বলে, কিন্তু আরেকটা ছেলে সেখানে ছিল দাঁড়িয়ে, দ্‌ব-শ্‌বঁড়ো কুজ্‌কা। ইলিয়ারই সমবয়সী। তাদের নামকরণও হয় একই মাসে, কিন্তু তাদের মিল এখানেই শেষ। দ্‌ব-শ্‌বঁড়ো বড়লোকের ছেলে। ইচ্ছে করলে সে খনিতে নাও আসতে পারত, বাড়ীতেই পেতে পারত সহজ কাজ। কিন্তু কুজ্‌কা বহ্‌বকাল ধরে নিজের মতলবে এইভাবে খনিতে ঘ্‌বরে বেড়াত, হয়তো ভালো কিছ্‌ব পেয়ে যাব, লোকের চোখে ধ্‌বলো দিয়ে পারব সেটা হাতাতে। কথাটা ঠিকই, অন্য লোকের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার ছলাকলা তার বহ্‌বদিনের অভ্যেস। কোনো জিনিসের উপর থেকে চোখ একটু সরালেই হল, ব্‌বঝতে পারার আগেই দ্‌ব-শ্‌বঁড়ো সেটা বাগিয়ে নেবে, কখনোই সেটা আর দেখতে পাবে না। এককথায় — চোর। তার চেহারাতেও ছিল চোরের ছাপ। এক সোনাখ্‌বঁজিয়ে কোদাল দিয়ে তার উপর ছাপ দিয়ে যায়, ঘা'টা পড়ে বাঁকাভাবে। তাহলেও চিহ্ন হিসেবে থেকে যায় একটা কাটা দাগ। ঠোঁট পর্যন্ত তার নাক দ্‌বভাগ হয়ে যায়। এ কারণেই তার নাম হয়েছিল দ্‌ব-শ্‌বঁড়ো।

ইলিয়াকে কুজ্‌কা দার্‌বণ হিংসে করত। জানো তো, ইলিয়া ছিল শক্ত-সমর্থ ছেলে, শক্তিশালী আর ফুর্তি-বাজ। মনে হত যেন তার কাজ নিজে থেকেই হয়ে যায়। কাজটা শেষ হলে সে খেত আর তারপর হয়তো আরম্ভ করত গান গাইতে নয়তো জ্‌বড়ে দিত নাচ। আর্টেলে তাও ঘটে। নিজের ইচ্ছে কিম্বা শক্তি না থাকায় ওরকম ছেলের সঙ্গে দ্‌ব-শ্‌বঁড়ো কী করে পাল্লা দিতে পারে, তাছাড়া তার মনের ভাবনা-গ্‌বলোও ছিল অন্য ধরনের। কুজ্‌কা কিন্তু নিজের ধাঁচেই সেটার ব্যাখ্যা করে।

'ইলিয়া নিশ্চয়ই কোনো যাদু জানে, সেজন্যেই কপাল তার বরাবর ভালো। অফুরন্ত সে পারে কাজ করতে।'

ইলিয়া যখন পালকগুলোর কথা বলল, কুজ্‌কা ভাবল, 'ঠিক হয়েছে, ওগুলোর মধ্যেই রয়েছে ওর যাদুর শক্তি।'

কাজেই রাত্রে পালকগুলো সে চুরি করল।

পরের দিন ইলিয়া দেখল পালক নেই। ভাবল, নিশ্চয়ই সেগুলো কোথাও ফেলেছে। তাই খুঁজতে শুরু করল। লোকেরা তাকে করতে লাগল ঠাট্টা:

'ওরে ছোঁড়া, কোথায় গেল তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি! এত দাপাদাপি করছিস শুধু ক্ষুদে ক্ষুদে পালকগুলো খোঁজার জন্যে! বহু আগেই সেগুলো গেছে পায়ের তলায় মিলিয়ে। তাছাড়া সেগুলো পেলে লাভই বা কী?'

'লাভ কী, সেগুলো যে আমার ঠাকুমার স্মৃতি-চিহ্ন!'

তারা তাকে বলল, 'স্মৃতি-চিহ্ন রাখা দরকার ভালো জায়গায় কিম্বা মাথার মধ্যে। টুপিতে নয়।'

ইলিয়া ভাবল, ওরা যা বলছে তা ঠিক। তাই পালকগুলো খোঁজা বন্ধ করল। কল্পনাতেও ভাবতে পারল না সেগুলোকে হয়তো কোনো মন্দ লোক চুরি করেছে।

কুজ্‌কার কাজ হল ঠাকুমার পালকগুলো ছাড়া ইলিয়া কীভাবে চালায় সেটা লক্ষ্য করা। সে দেখল খনিতে কাজ করার পাত্রটা নিয়ে ইলিয়া যাচ্ছে বনের মধ্যে। দু-খুঁড়ো চলল তার পিছু পিছু — ভাবল, ইলিয়া কোথাও সোনা মেশানো বালি খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু বালির কোনো চিহ্নই ছিল না। ইলিয়া শুধু সেই পাত্রটার সঙ্গে লম্বা খোঁটা আটকাল। লম্বায় সেটা নিশ্চয়ই আট গজের বেশী হবে। সেটা সোনাধোয়ার কোনো কাজেই লাগতে পারে না, কিন্তু কিসের জন্যে তাহলে সেটা? কুজ্‌কা আরো ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগল।

তখন শরৎকাল, জোরে বাতাস বইছে। শনিবার যখন এল আর খনির শ্রমিকরা গেল বাড়ীতে, ইলিয়াও যাবার জন্যে ছুটি চাইল। প্রথমে ঠিকেদার বাগড়া দিচ্ছিল — এই তো সেদিন গিয়েছিলি, আর তোর যাবার দরকারটা কী শুনি? তোর সংসার নেই, সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে তোর ঐ পালকগুলোও তো খনিতে হারিয়েছিস। কিন্তু

শেষ পর্যন্ত তাকে যেতে দিল। কুজ্‌কা এধরনের সুযোগ হারায় না, সময় মতো সেই জায়গায় লুকিয়ে গেল যেখানে লম্বা খোঁটার উপর পাত্রটা ছিল লুকোনো। বেশখানিক তাকে সবুর করতে হল, কিন্তু সেটা তো চোরেদের ব্যবসার অন্তর্গত। প্রবাদটা তো জানো — চোর শুধু মালিককে নয়, তার কুকুরের চোখেও ধুলো দিতে পারে।

খুব সকাল সকাল ইলিয়া এল, বার করল তার পাত্রটা। তারপর বলল:

'দুঃখের কথা পালকগুলো নেই। তাহলেও বেশ বাতাস বইছে, শীস দিচ্ছে, দুপুরের মধ্যেই দারুণ জোরে বইবে।'

এত জোরে বাতাস বইছিল যে গাছগুলো ককিয়ে উঠছিল। ইলিয়া তার চিহ্ন ধরে চলতে লাগল। দু-শুঁড়ো মহা ফুর্তিতে লুকিয়ে লুকিয়ে চলল তার পিছন পিছন।

'এই সেই পালক! দৌলত পাবার পথ দেখাবে!'

চিহ্ন ধরে পথ খুঁজে যেতে ইলিয়ার অনেকক্ষণ লাগল। ক্রমশ বাতাসের বেগ আসতে লাগল কমে। যখন সেই কুয়োটার কাছে এল, বাতাস তখন একেবারে গেছে থেমে, একটা ডালও নড়ছে না। ইলিয়া সেই কুয়োটার ধারে চেয়ে দেখল বুড়িটা রয়েছে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে। রিনঝিনে গলায় চেঁচিয়ে বলল:

'আরে লড়ুইয়ে এল দেখছি। ঠাকুমার পালকগুলোও নেই, বাতাসও নেই। এখন কী করবে শুনি? দৌড়ে ফিরে গিয়ে বাতাসের জন্যে অপেক্ষা করবে? হয়তো বাতাস উঠবে!'

খানিক সে দাঁড়িয়ে রইল পাশে। ইলিয়ার দিকে হাত বাড়াল না। কুয়োর ওপর নীল টুপির মতো কুয়াশার গাঢ় কুজ্‌ঝটিকা। ইলিয়া ছুটে গিয়ে সেই নীল কুয়াশার এক্কেবারে মাঝখানে পাত্র-লাগানো লম্বা খোঁটা দিয়ে সজোরে খোঁচা দিল; আর শুধু তাই না, চেঁচিয়েও উঠল:

'এই, সাবধান, বুড়ি, নইলে হয়তো তোমাকে মেরে বসব!'

কুয়ো থেকে একপাত্র জল সে তুলল। কিন্তু দেখল পাত্রটা খুব ভারি, টেনে তোলা মুশকিল। বুড়ি হাসতে লাগল, তার দাঁত ঝকঝক করতে লাগল তরুণী মেয়ের মতো।

‘ভালো, দেখা যাক কী করে তোমার পাত্রটা টেনে আনো, দেখা যাক আমার জল কত খেতে পারো!’

বুড়ি ছেলেটিকে ঠাট্টা করতে লাগল। ইলিয়া টের পেল বাস্তবিকই সেটা খুব ভারি, তাই রেগে উঠল।

চেঁচিয়ে বলল, ‘নিজেই তুমি খাও!’

প্রাণপণে সে পাত্রটা সামান্য তুলে চেষ্টা করল জলটা বুড়ির উপর ঢালতে। বুড়ি সরে গেল। ইলিয়া চলল তাকে ধাওয়া করে। বুড়ি আরো দূরে সরে গেল। তারপর খোঁটাটা গেল ভেঙে আর জল গেল পড়ে। বুড়ি আবার লাগল হাসতে:

‘তোমার পাত্রটাকে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে আটকালে ভালো হত... তাহলে ভাঙত না!’

ইলিয়া তাকে ভয় দেখাল:

‘দাঁড়াও-না, হতচ্ছাড়ি বুড়ি। চোবাব!’

তখন বুড়ি বলল:

‘আচ্ছা, ঠিক আছে। খানিক তামাসা করেছি, এখন থামানো যাক। দেখছি তুমি বেপরোয়া সাহসী ছেলে। যখনই ইচ্ছে তখনই কোনো চাঁদনী রাতে এসো। নানা দৌলত দেখাব। যত পারো নিয়ে যেও। আমি ওপরে না থাকলে তুমি শুধু বলো: পাত্রটা না নিয়ে এসেছি, আর তাহলেই সব পাবে।’

আর ইলিয়া বলল, ‘আমার ইচ্ছে হয় দেখব কী করে তুমি সুন্দরী মেয়ে হয়ে ওঠো।’

‘সেটা দেখা যাবে,’ হেসে উঠল বুড়ি। দেখাল তার তরুণীদের মতো দাঁত।

দু-শুঁড়ো সবকিছু দেখল। সবকিছু শুনল।

ভাবল, ‘চটপট খনিতে ফিরে যাই। কতকগুলো থলি রাখি তৈরি করে। শুধু ইলিয়া যেন আমার চেয়ে আগে এটা পেয়ে না যায়।’

এই ভেবে দু-শুঁড়ো তাড়াতাড়ি ফিরে গেল। ইলিয়া কিন্তু পাড়ে উঠে চলল বাড়ীর দিকে। ঘাসের চাবড়াগুলোর উপর পা ফেলে ফেলে জলা জমিটা সে পেরুল, পৌঁছল বাড়ীতে। দেখল এক অবাক কাণ্ড — তার ঠাকুমার চালুনীটা অদৃশ্য হয়েছে।

ইলিয়া অবাক হয়ে ভাবল — ওরকমের জিনিস কার দরকার? বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে গেল, এটা-সেটা নিয়ে খানিক গল্প করল, তারপর ফিরে গেল খনিতে, জলা জায়গাটা দিয়ে নয়, রাস্তা দিয়ে, যেমন সবাই যায়।

পাঁচ দিন কেটে গেল। ইলিয়া মাথা থেকে কথাটা কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারল না। কাজ করার সময় তার কথা ভাবে, রাত্রে তার স্বপ্ন দেখে। সেই নীল চোখদুটো সে যেন দেখতে পায়। যেন শুনতে পায় সেই রিনঝিনে স্বর:

'যখনই ইচ্ছে তখনই কোনো চাঁদনী রাতে এসো।'

শেষে ইলিয়া মন ঠিক করে ফেলল:

'যাব। অন্তত দেখব দৌলতের চেহারাটা কী রকম। হয়তো সুন্দরী মেয়ে হয়ে সে দেখা দেবে।'

ঠিক সেই সময় শুক্লপক্ষ শুরু হয়েছিল। রাতগুলো ক্রমশ ফিকে হয়ে উঠছে। হঠাৎ দু-শুঁড়ো অদৃশ্য হয়ে গেল, সবাই তার কথা বলাবলি করতে লাগল। খনিতে তারা লোক পাঠাল, কিন্তু সেখানে সে নেই। সর্দার লোক পাঠিয়ে বনের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করল, সেখানেও তার কোনো চিহ্ন নেই, যদিও সত্যি কথা বলতে কি, তারা বিশেষ খোঁজাখুঁজি করে নি। ভাবল আপদ বিদেয় হওয়ায় ভালোই হয়েছে। এইখানেই ব্যাপারটা চুকল।

পূর্ণিমার দিন ইলিয়া সেখানে গেল। পৌঁছে দেখে কেউ নেই। তবু পাড় দিয়ে নীচে নামল না, শুধু ধীরে ধীরে বলল:

'পাত্রটা না নিয়ে এসেছি।'

কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই বুড়ি দেখা দিয়ে সস্নেহে বলল:

'স্বাগত, অতিথি! বহুদিন অপেক্ষা করে রয়েছি। এসো, আর যত পারো নাও।'

কুয়োটার উপর সে হাত বোলাল, যেন একটা ঢাকা খুলছে। আর দেখা গেল সেটা সবরকম দামী-দামী রত্নে ভরা। একেবারে উপর পর্যন্ত। ইলিয়ার ইচ্ছে হল কাছে গিয়ে দেখতে, কিন্তু পাড় দিয়ে নামল না। বুড়ি তাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল:

'দাঁড়িয়ে আছ কেন? এসো, থলিতে যত পারো নাও।'

সে বলল, 'সঙ্গে আমার থলি নেই। আর লুকেরিয়া ঠাকুমা আমাকে অন্য কথা বলেছিল। তুমি নিজের হাতে যা দেবে শুধু সেই দৌলতই ভালো আর খাঁটি।'

'ইস, কী দেমাক। ওঁকে আবার হাতে করে দিতে হবে। ঠিক আছে, তাই হবে!'

বুড়ি কথাগুলো বলার পর কুয়োর ভিতর থেকে নীল কুয়াশার এক কুণ্ডলী উঠল। আর সেই কুণ্ডলীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে, ভারি সুন্দর দেখতে, পোষাক-পরিচ্ছদ রাজরানীর মতো, লম্বায় একটা ভালো পাইন গাছের প্রায় অর্ধেক। হাতে তার সোনার একটা থালা, সব রকম দামী-দামী জিনিস সেখানে রয়েছে গাদা করা। আছে সোনার গুঁড়ো, দামী-দামী মণিরত্ন আর প্রায় রুটির মতো বড় বড় সোনার তাল। মেয়েটি ইলিয়ার কাছে গিয়ে নীচু হয়ে কুর্নিশ করে তাকে সেই থালাটা দিল।

'কুমার, নাও এটা!'

ইলিয়া মানুষ হয়েছে সোনার খনিতে। দেখেছে সোনা ওজন করা। এগুলোর ওজন যে কী হবে সেটা আন্দাজ করল। তাই থালাটার দিকে তাকিয়ে বুড়িকে বলল:

'আমার সঙ্গে তুমি ঠাট্টা করছ। ওটাকে তোলার ক্ষমতা কারো নেই।

বুড়ি বলল, 'নেবে না?'

ইলিয়া উত্তর দিল, 'বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে নেই।'

বুড়ি বলল, 'তোমার যা ইচ্ছে! অন্য উপহার দেব।'

মুহূর্তের মধ্যে সেই সোনার থালা সমেত মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার কুয়ো থেকে উঠল এক নীল কুয়াশার কুণ্ডলী। আর একটি মেয়ে এল বেরিয়ে। তার চেহারা কিছু ছোট। সেও সুন্দরী, আর তার পোষাক-পরিচ্ছদ সওদাগরের মেয়ের মতো। হাতে তার একটা রুপোর থালা, তার উপর গাদা করা দামী-দামী জিনিস। কিন্তু সেই থালাটাও ইলিয়া নিতে চাইল না। বলল:

'এটাকে তোলা মানুষের সাধ্যের বাইরে। আর তাছাড়া এটা তুমি নিজে হাতে করে দিচ্ছ না।'

কথা শুনে বুড়ি কুমারী মেয়ের মতো হেসে উঠল।

‘বেশ, তুমি যা চাইছ তাই হোক! তোমারও আনন্দ হবে আমারও। কিন্তু দেখো, পরে আপসোস করো না। সবুর করো।’

বলতেই রুপোর থালা সমেত মেয়েটি অদৃশ্য হল। বুড়িও হয়ে গেল অদৃশ্য। ইলিয়া বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করল, কিন্তু কেউ নেই। অপেক্ষা করতে করতে যখন বিরক্তি ধরে গেছে তখন শুনতে পেল ঘাসের খসখস শব্দ। ঘুরে দেখল একটি মেয়ে আসছে। সাধারণ একটি মেয়ে, লম্বায় সাধারণ মানুষের মতো। বয়েস সম্ভবত আঠারো, পোষাক নীল, মাথার রুমালটাও, পায়ে নীল চটি। আর এমন সুন্দরী যে, বলা যায় না। চোখ তারার মতো, ভুরু ধনুকের মতো, ঠোঁট রাস্প-বেরির মতো লাল। একটা চওড়া সোনালী রঙের বিনুনি তার কাঁধের উপর দিয়ে সামনে পড়েছে। সেটার ডগায় নীল ফিতে।

কাছে এসে সে বলল:

‘নাও, বন্ধু ইলিয়া, খোলা মনে দিচ্ছি।’

নিজের ফরসা হাত দিয়ে তাকে বেরি-ভরা লুকেরিয়া ঠাকুমার পুরনো চালুনীটা দিল। তার মধ্যে বুনো স্ট্র-বেরি, রাস্প-বেরি, সোনালী-ক্লাউডবেরি, ব্ল্যাক-ক্যারেণ্ট আর বোগ-বিলবেরি। সবরকম জাতের বেরি। চালুনীটার কানা পর্যন্ত ভরা। সেগুলোর উপরে রয়েছে তিনটে পালক। একটা শাদা, একটা কালো আর তৃতীয়টা লাল। একটি নীল সুতো দিয়ে বাঁধা।

চালুনীটা নিয়ে ইলিয়া দাঁড়িয়ে রইল বোকার মতো। ভেবে পেল না কোথা থেকে মেয়েটি আসতে পারে আর কোথা থেকেই বা শরৎকালে এইসব বেরি পেল। তাই তাকে জিজ্ঞেস করল:

‘কে তুমি, সুন্দরী, কী নামে ডেকে তোমায় মান্যি করি?’

মেয়েটি হেসে বলল:

‘লোকে আমাকে বলে নীল বুড়ি, কিন্তু যারা কুশলী, দুঃসাহসী আর সরল, তাদের দেখা দিই এখন যেমন দেখছ সেইভাবে। শুধু সে রকম মানুষ ক্বচিৎ মেলে।’

ইলিয়া তখন বুঝতে পারল কার সঙ্গে কথা বলছে। জিজ্ঞেস করল:

‘কোথা থেকে এই পালক পেলে?’

মেয়েটি বলল, 'আরে ওই দু-শুঁড়ো এসেছিল দৌলতের খোঁজে। কিন্তু নিজেই কুয়োয় পড়ে যায়। তার সঙ্গে ডুবে যায় তার সব থলি। শুধু তোমার এই পালক ওঠে ভেসে। দেখছি মন তোমার ভারি সরল গো।'

ইলিয়া বলার মতো আর কোনো কথা ভেবে পেল না। মেয়েটিও সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে শুধু তার বিনুনির ফিতেটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। তারপর বলল:

'তাহলে, বঁধুয়া ইলিয়া, আমিই নীল বুড়ি। চিরকাল বুড়ি, চিরকাল ছুঁড়ি। চিরকালের জন্যে এখানকার এই দৌলত পাহারা দিচ্ছি।'

তারপর খানিক থেমে সে প্রশ্ন করল:

'দেখে তোমার আশ মিটেছে তো? ব্যস, আর নয়, নইলে আবার আমাকে স্বপ্নে দেখতে থাকবে।'

কথাগুলো বলে মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আর ছেলেটির বুকে সেটা বিঁধল ছুরির মতো। সে যদি সত্যিকারের মেয়ে হত তাহলে ইলিয়া তার জন্যে যথাসর্বস্ব দিয়ে দিতে পারত। মেয়েটি কিন্তু অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে ইলিয়া সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। কুয়োর ভিতর থেকে নীল কুয়াশা উঠে সমস্ত নীচু জমিতে ছড়িয়ে পড়ার পর ইলিয়া ফিরল বাড়ীতে যাবার জন্যে। যখন পোঁছল তখন সকাল হয়ে গেছে, আর যেই না বাড়ীতে ঢুকেছে অমনি হঠাৎ চালুনীটা ভারি হয়ে উঠল, তার তলাটা গেল ছিঁড়ে, সোনার তাল আর দামী-দামী পাথর মেঝের উপর পড়ল ছড়িয়ে।

অত দৌলত থাকায় ইলিয়া সঙ্গে সঙ্গে কর্তার কাছ থেকে তার স্বাধীনতা কিনে নিল, নিজের জন্যে তৈরি করল নতুন একটা বাড়ী আর কিনল একটা ঘোড়া। কিন্তু কোন কারণে বিয়ে করতে মন চাইল না। সেই মেয়েটিকে ভুলতে পারে নি। তার মনের শান্তি আর ঘুম নিয়েছে বিদায়। লুকেরিয়া ঠাকুমার পালক থেকেও কোনো ফল হল না। বার বার সে বলত:

'হায়, লুকেরিয়া ঠাকুমা, লুকেরিয়া ঠাকুমা! শিখিয়েছিলে কী করে নীল বুড়ির দৌলত পেতে হয়, কিন্তু মন-পোড়ানি থেকে কী করে রেহাই পাওয়া যায় তা শিখিয়ে গেলে না। বোঝা যায় নিজেই জানতে না।'

এইভাবে সে হেদিয়ে উঠতে লাগল। শেষটায় ভাবল:

'এরকম যন্ত্রণা সহ্য করার চেয়ে সেই কুয়োয় বরং ঝাঁপ দিই।'

জ়ুজেল্‌কা জলায় সে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল ঠাকুমার দেওয়া পালকগুলো। তখন বেরি ফলার সময়, লোকে চলেছে বুনো স্ট্র-বেরি তুলতে।

বনে পেঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই ইলিয়ার সঙ্গে একদল মেয়ের দেখা হল। সংখ্যায় তারা জনাদশেক। ঝুড়ি তাদের ভর্তি। একজন মেয়ে সামান্য পিছিয়ে পড়ে হাঁটছিল। বয়েস বছর আঠারো, পোষাকটা নীল, মাথার রুমালটাও। আর এমন সুন্দরী যে, বলা যায় না। চোখ তারার মতো, ভুরু ধনুকের মতো, ঠোঁট রাস্প-বেরির মতো লাল। একটা চওড়া সোনালী রঙের বিনুনি তার কাঁধের উপর দিয়ে সামনে এসে পড়েছে। তার ডগায় নীল একটা ফিতে। একেবারে সেই অন্য জনের প্রতিচ্ছবি। শুধু একটি মাত্র তফাৎ — সেই মেয়েটির পায়ে ছিল নীল চটি, এটির পা খালি।

থমকে গেল ইলিয়া, তাকিয়ে রইল তার দিকে। মেয়েটি তার নীল চোখ দিয়ে থেকে থেকে ঝলক দেয়, মুখ টিপে হাসে, শাদা দাঁত দেখা যায়। সামান্য সম্বিত ফিরে এলে ইলিয়া বলল:

'আগে তোমাকে কখনো দেখি নি কেন বলো তো?'

মেয়েটি বলল, 'এই তো, ভালো লাগলে এখন দেখো। আমার গুমর নেই, এক কোপেকও চাইব না।'

জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় থাকো?'

মেয়েটি বলল, 'সোজা চলে গিয়ে ডান দিকে ঘুরো, তাহলে মস্তো একটা গাছের কাটা গুঁড়ি দেখতে পাবে। দৌড়ে গিয়ে সেই গুঁড়িতে মাথা ঠুকবে, যেই চোখে সর্ষে ফুল দেখবে অমনি আমাকে দেখতে পাবে।'

মানে, ঠাট্টা করল আর কি, মেয়েরা যেমন করে থাকে। কিন্তু তারপর বলল, সে কে আর কোথায় থাকে।

হ্যাঁ, বলল সবই সত্যি-সত্যি আর তার নীল চোখ দিয়ে কেবলি তাকে টানে আর টানে।

17—1115

এই মেয়েটিকে নিয়ে ইলিয়া সুখের মুখ দেখল। কিন্তু বেশী দিনের জন্যে নয়। জানো তো, মেয়েটি এসেছিল গ্রামের খনি থেকে, তাই আগে তাকে দেখে নি। আর এই খনি মানে কী সে তো বুঝতেই পারো। সেখানকার মেয়েদের মতো সুন্দরী এ এলাকায় নেই, কিন্তু বিয়ে করলে শীগ্‌গীরই বিপত্নীক হতে হয়। কচি বয়েস থেকে সেই পাথর নিয়ে কাজ, ক্ষয়রোগে ধরে।

ইলিয়াও বেশী দিন বাঁচে নি। হয়তো এই অসুখটা পেয়েছিল এই মেয়েটি কিম্বা অন্য কারুর কাছ থেকে। কিন্তু যাই হোক না কেন, জুজেল্‌কা জলার নীচে পাওয়া যায় একটা বড় সোনার খনি।

মানে, কোথা থেকে যে দৌলত পেয়েছিল তা সে লুকিয়ে রাখে নি। লোকে তাই সেখানটা খুঁড়তে শুরু করে, আর আবিষ্কার করে ভালো জাতের সোনা।

লোকে সেখানে যখন অনেক সোনা পেত সেই সময়কার কথা আমার মনে পড়ে। শুধু সেই কুয়োটাকে কেউ কখনো খুঁজে পায় নি। কিন্তু আজকেও সেখানে নীল এক কুয়াশা দেখা যায়, দৌলত দেখিয়ে দেয়।

কিন্তু আমরা করেছি-টা কী? শুধু খানিক ওপরটা খুঁড়েছি। অনেক নীচে খোঁড়া দরকার। লোকে বলে, নীল বুড়ির কুয়ো খুব গভীর। ভয়ানক গভীর। পথ চেয়ে আছে, কখন লোকে সেখানে পৌঁছবে।

সোহাগের নাম
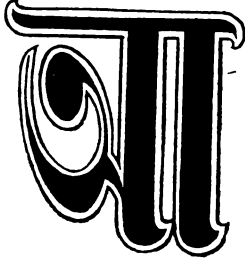
দিবাসীরা যখন এখানে থাকত এটা সেই সময়কার কথা। মানে, ওই ডাঙাটায়, যেখানে লোকে এখন ওপরকার বালি থেকে সোনা পায়।

তখন সেখানে অনেক সোনা... ক্রিসোলাইট... তামাও ছিল। যত চাও কুড়িয়ে নাও। কিন্তু আদিবাসীদের সে-অভ্যেস ছিল না, কিসের জন্যে দরকার? ক্রিসোলাইট নিয়ে নয় ছেলেরা খেলা করতে পারত, কিন্তু সোনার ব্যাপারে কিছুই জানত না। হলদে দানা আর বালি — সেটা নিয়ে কী করবে? কয়েক পাউণ্ডের কিম্বা এমন কি আধ-পুদ ওজনের সোনার তাল পড়ে থাকত হাঁটাপথের উপরেই, কেউই তুলে নিত না। কারো অসুবিধা হলে সরিয়ে দিত — ব্যস। অবশ্য একটা কাজের জন্যে সেগুলো তারা ব্যবহার করত। শিকারে বেরুবার সময় কিছু পরিমাণ ঐ সোনার তাল সঙ্গে করে নিয়ে যেত। জানো তো, এমনিতে বড় নয়, কিন্তু ভারি। হাতে ভালো করে ধরাও যায়, ছোঁড়া সহজ। বেশ যুৎসই ছুঁড়লে বড়-সড় গোছের জন্তুও পারা যায় মারতে। সহজ ব্যাপার। তাই এখনো মাঝে মাঝে এমন সব জায়গায় সোনার তাল পাওয়া যায় যা সেখানে থাকার কথা নয়। আদিবাসীরা তা যেখানে খুসি ছুঁড়ে ফেলেছে।

তামার তাল তারা কিছু কিছু খুঁজত। জানো তো, তা দিয়ে তারা কুড়ুল বানাত, নানা রকমের হাতিয়ার। হাঁড়ি-পাতিল, হাতা এই সব।

গুমেশ্‌কি খনি তো আমরা পেয়েছি ওই আদিবাসীদের কাছ থেকেই। অবশ্যই কোনো খনি তারা খোঁড়ে নি, যা ওপরে ছিল শুধু তাই নিয়েছে। এখনকার মতো নয়।

শিকার করত তারা, মাছ, পাখি ধরত আর এই নিয়েই বেঁচে থাকত। তখন ছিল অঢেল বুনো মৌমাছি, যত চাও তত মধু। কিন্তু রুটির নামও জানত না। গৃহপালিত পশু — ঘোড়া, গরু কিম্বা ভেড়া — কোনোটাই ছিল না। ওধরনের জিনিস তারা বুঝত না।

রুশী নয় তারা, তাতারও নয়। কিন্তু কী তাদের নাম, ধর্মই বা কী কেউ জানে না। থাকত বনে। মানে, আদিবাসী আর কি।

তাদের ঘরবাড়ী, যেমন ধরো স্নানের ঘর, গুদম ঘর সেধরনের কিছুই ছিল না। গ্রামেও তারা থাকত না। থাকত পাহাড়ে। দুম্নায়া পাহাড়ে বড় একটা গুহা আছে। নদী থেকে ঢোকা যেত। এখন আর দেখা যায় না, ধাতুমলে ঢাকা পড়ে গেছে। সম্ভবত পঁচিশ গজ পুরু। কিন্তু সবচেয়ে বড় গুহাটা ছিল আজোভ পাহাড়ে। বাস্তবিকই সেটা বিরাট, চলে যায় পাহাড়ের তলা দিয়ে। এখনো তার মুখ দেখা যাবে, যদিও ভিতরে অনেক ধ্বসে গেছে। মানে, সেখানে অনেক রহস্যের ব্যাপার। তাই নিয়েই গল্পটা।

এইভাবেই থাকত আদিবাসীরা, থাকত নিজের মনে, কাউকেই বিরক্ত করত না। কিন্তু এইসব এলাকায় অন্যান্য লোকেরাও আসতে শুরু করল। প্রথমে তাতাররা এর পাশ দিয়ে যাতায়াত করত ঘোড়ায় চেপে, দুম্নায়া পাহাড়ের তলা থেকে আজোভ পাহাড় পর্যন্ত গোটা পথ। সেটা যায় দক্ষিণ থেকে উত্তরে, ধনুক দিয়ে ছোঁড়া তীরের মতো সোজা। এখন পথটা চোখে পড়বে না, বুড়োরা তাদের ঠাকুর্দাদের কাছ থেকে শুনেছিল, সেটা দেখা যেত, চওড়া, পায়ে চলা পথ, রাস্তার মতো, শুধু দু'পাশে নালা ছিল না।

তাতাররা ঘোড়ার পিঠে যাতায়াত করত, এক ধরনের মাল তারা আনত উত্তর থেকে, অন্য ধরনের মাল নিয়ে যেত দক্ষিণ থেকে। কিন্তু সোনার দিকে তাদের নজর ছিল না। সম্ভবত জানত না সেটা কী, কিম্বা হয়তো তাদের চোখে পড়ে নি। প্রথমে আদিবাসীরা তাদের ভয় পেত, কিন্তু তারপর দেখে কেউ তাদের কিছু করছে না। তাই যেভাবে থাকত সেইভাবে তারা থাকতে লাগল। ধরতে লাগল পাখি আর মাছ, সোনার তাল ছুঁড়ে জন্তুদের ঘায়েল করত, শেষ করত তামার কুড়ুল দিয়ে।

কিন্তু তারপর একেবারে হঠাৎ বহু তাতার শুরু করল আসতে। ঝাঁকে ঝাঁকে

আসতে লাগল। সবাইকার সঙ্গেই বর্শা আর তলোয়ার, যেন যাচ্ছে লড়াই করতে। কিছু পরে তারা উল্টো দিকে এল ফিরে। ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল, একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। ইয়ের্মাক তার কসাক দল নিয়ে সাইবেরিয়ায় গিয়ে সেখানকার তাতারদের হারিয়ে দিয়েছিল। যারা এসেছিল তাদের সাহায্য করতে, তাদের মনে একেবারে মৃত্যুভয় ঢুকিয়ে দেয়। জানো তো, তাদের ছিল বন্দুক। সেটা তখন একেবারে নতুন। বন্দুক দেখে তাতারদের বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

জানো তো, কসাকরা আগে ছিল স্বাধীন, কিন্তু তারা সাইবেরিয়ায় আসে গোলাম হয়ে। বেনিয়াদের কাজে লাগে। রাজাও তাদের খেলাৎ পাঠাত। তাদের মধ্যে ইয়ের্মাক ছিল সর্দার, রাজা তাকে পাঠায় নিজের রুপোর কামিজ। কখনো সেটা সে গা থেকে খুলত না। জানো তো, গর্ব আর কি। সেটা পরেই জলে ডুবে মরে।

ইয়ের্মাক মরতেই যত গণ্ডগোল শুরু হল। মানে, বদমায়েস লোক সব ভেড়ে কসাকদের সঙ্গে। তাই তখন তাদের প্রাণে যা চায় তাই করে। লোক দেখলেই গলা চেপে ধরে আর বলে, সঙ্গে যাকিছু আছে দিয়ে দাও। বয়স্কা মেয়ে আর কুমারীদের ধরে নিয়ে যেত, এমন কি যারা তখনো সাবালিকা হয় নি তাদেরও। মানে, এমন উৎপাত শুরু করল যা বলার নয়।

এই এলাকায় তাদের একটা দঙ্গল আসে — খুব বড় দল নয়, আসে পায়ে হেঁটে। কিন্তু তাদের সর্দার ছিল নিশ্চয়ই এক আসল ডাকাত। সঙ্গে সঙ্গে সোনার উপর তাদের চোখ পড়ে। সেগুলো নিয়ে তাদের মধ্যে এমন কাড়াকাড়ি পড়ে যায় যে, প্রায় খুনোখুনি পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু তারপর একটু চৈতন্য হল। দেখে আরো অনেক সোনা রয়েছে পড়ে। এতো যে তারা বয়ে নিয়ে যেতে পারে না। এখন কী করা যায়? এদিকে-ওদিকে তারা খোঁজ করতে শুরু করে। হয়তো কাছাকাছি লোকজন আছে। তাদের কাছ থেকে ঘোড়া পেতে পারে। এইভাবে তারা দেখা পায় এই আদিবাসী লোকদের। তাদের জিজ্ঞেস করতে শুরু করে:

'কোন দেশী লোক তোমরা? তোমাদের ধর্ম কী, জাত কী? কোন রাজাকে ভেট দাও?'

আদিবাসীদের তারা ব্যতিব্যস্ত করে তুলল, কিন্তু এই লোকদের মুখে ছিল শুধু একটিমাত্র জবাব — তোমাদের আমরা চাই না। আমাদের ঘাঁটিও না, নিজেদের

পথ ধরো। কসাকরা তখন চাইল ভয় দেখাতে। ছুঁড়ল তাদের বন্দুক। তখন আদিবাসীরা গেল দারুণ ভয় পেয়ে। পালাল পাহাড়ে। কসাকরা চলল তাদের ধাওয়া করে। ভেবেছিল এই তো, জিতে যাচ্ছে। কিন্তু সেটি হল না। আদিবাসীরা ছিল সাহসী। তারা শুধু প্রথমে বন্দুক ছোঁড়া দেখে ভয় পায়। ভাবে বুঝি আকাশ-থেকে-পড়া আগুন। তারপর কিন্তু টনক নড়ে তাদের। প্রকাণ্ড চেহারার শক্তিমান মরদ সব। নিজেদের গুহায় দৌড়ে গিয়ে এমনভাবে শুরু করে সোনার তাল ছুঁড়তে, যে কসাকদের দফা রফা। কিন্তু দু'-তিনজন পারে পালাতে। আদিবাসীরা তাদের পিছু ধাওয়া করে না। পালাচ্ছে, তা পালাক যেখানে খুসি। আমাদের না ঘাঁটালেই হল। আদিবাসীরা মৃতদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল এই দেখে যে, প্রত্যেক লোকের কাছে রয়েছে খুব বেশী বেশী হলদে পাথর। কেন ওরা ঐ ভারি বোঝা বইতে চায়? আদিবাসীরা কখনো ভাবতেই পারে নি ঐ পাথরগুলো কেন ছিল তাদের সঙ্গে। নিজেদের মতোই ভেবে তারা ঠিক করল কসাকরা সেগুলো নিয়েছে লড়াই করার জন্যে। তারা সেই বন্দুকগুলোও দেখল। একটা ছিল গুলি-ভরা। তাদের একজন সেটা নিয়ে মুচড়িয়ে, ঘুরিয়ে, এটা টেনে, ওটা ঠেলে চলল। হঠাৎ সেটার ভিতর থেকে ছুটে গেল গুলিটা। তাতে তারা ভয় পেয়ে গেল আর সেই লোকটির শরীর গেল খানিকটা ছড়ে। কিন্তু কেউ মারা গেল না। তখন আদিবাসীরা বুঝল যে, আগুনটা একেবারেই আকাশ থেকে আসে নি। আবার তারা চাইল একবার বন্দুক ছুঁড়তে। মৃতদের কাছ থেকে সবকিছু তারা নিয়ে নিল, সব জিনিস দেখল, হাত দিয়ে ছুঁল, শুঁকল। দেখল বারুদ আর সীসে, কিন্তু সেগুলোর কী কাজ তা তারা বার করতে পারল না।

কিন্তু যে তিনজন পালিয়ে গিয়েছিল, তারা কোনো রকমে আবার ফিরে যায় নিজেদের দলে। তাদের সর্দারকে সে-বিষয়ে সব বলে — এক অদ্ভুত উপজাতি আমাদের আক্রমণ করে, প্রায় সবাইকেই মেরে ফেলেছে; শুধু আমরা তিনজন পালাতে পেরেছি।

সেই সর্দার, সম্ভবত খানিক মাতাল ছিল, শুধু বলল, 'ঠিক আছে।' তখন লড়াই চলছে, সাইবেরিয়াকে তারা জিতে নিচ্ছে। কত কীই তো ঘটতে পারে। মারা পড়েছে, মারা পড়েছে। সেখানেই গেল চুকে। কিন্তু সেই তিনজন সোনার

কোনো কথা বলে নি। ভাবল, আমরা পেয়েছি, ওগ্‌লো দিয়ে আমরাই খানিক আরাম আর ফুর্তি করব। কিন্তু সোনা হল সোনা। সেটা ভারি হতে পারে, কিন্তু সব সময়ই ওপরে উঠে আসে। প্রথমত সেটাকে ভাঙিয়ে টাকা করতে হবে। তাই নিয়ে তারা মাথা চুলকাতে লাগল। তাদের কাছে ছিল বাস্তবিকই বড় বড় সোনার তাল। কিন্তু লোকদের যদি সেগ্‌লো দেখতে দেয় তাহলে কী ঘটবে? তারা প্রশ্ন করবে কোথা থেকে পেয়েছে... কিন্তু শীগ্‌গীরই তারা একটা উপায় আবিষ্কার করল। সোনার তালগ্‌লো ছোট ছোট টুকরোয় ভেঙে তারা এক সওদাগরের কাছে বিক্রি করে দিল। কিন্তু পরস্পরের কাছ থেকে তারা কথাটা রাখল ল্‌কিয়ে। সোনা হল সোনা। তাই একজন গেল এক সওদাগরের কাছে, তারপর দ্বিতীয় জন, তারপর গেল তৃতীয় জন। তারা সবাই একই ভাবে গেল। সওদাগররাও বাস্তবিক খ্‌সি। তারা টাকা দিল, কিন্তু তাদের মনের কথা প্রকাশ করল না। টাকা তো পাওয়া গেল, কিন্তু কী হবে তা দিয়ে? প্রথমে তারা নিজেদের মনের মতো দামী-দামী পোষাক কিনল। তারপর শ্‌র্‌ হল মদ্যপান। সবসময় তারা কাটাতে লাগল শ্‌ঁড়িখানায়। যে কেউ আসে সবাইকেই তারা মদ এগিয়ে দেয়। অন্যান্য কসাকদের সন্দেহ হল — কোথা থেকে ঐ টাকা তারা পেয়েছে? জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল, আর মাতাল তো, কতক্ষণ আর লাগে... শীগ্‌গীরই তাদের কাছ থেকে সব কথা তারা বার করে নিল। তারপর সেই সোনার খোঁজে যাবার জন্যে গড়ে তুলল একটা দল।

কিন্তু সব কসাকরা এক জাতের ছিল না। তাদের মধ্যে এমন একজন ছিল, জানি না তাকে তারা কী নামে ডাকত, সে আসে সোলিকামস্ক থেকে। খ্‌ঁজছিল সৎ জীবন, কিন্তু দেখে সেখানে শ্‌ধ্‌ ল্‌টপাট আর মদ্যপান। তাই সে অন্যদের এড়িয়ে চলতে শ্‌র্‌ করল।

আর একটা ল্‌টপাটের জল্পনা-কল্পনা তাদের করতে শোনার পর সে চেষ্টা করল তাদের ভালো কথায় ফেরাতে:

'লজ্জা হয় না? আগে তোমরা ল্‌টপাট করতে সওদাগর আর ভ্‌ঁইয়াদের, কিন্তু এখন কী করতে চলেছ? এখানকার লোকদের শেষ সম্বল কেড়ে নিয়ে দিয়ে দিচ্ছ সওদাগরদের। তাই না?'

কথাটা তাদের পছন্দ হল না বৈকি। সবাই তারা সশস্ত্র। তাই তরোয়াল আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মারামারি শুরু হয়ে গেল। সোলিকামস্কের সেই লোকটি ছিল দুঃসাহসী, চটপটে। সবাইকে সে মেরে তাড়াল, কিন্তু নিজে হল মারাত্মক জখম। সেখান থেকে পালিয়ে সে বনের মধ্যে লুকল, যাতে তারা তাকে খুঁজে না পায়। ভয়ঙ্কর ঘন বন — সেখানে কোথায় কোনো মানুষকে খুঁজে পাবে? তাই কসাকরা খানিক খোঁজাখুঁজি আর দারুণ হৈচৈ করার পর ফিরে গেল। সোলিকামস্কের সেই জখম লোকটি ভাবতে শুরু করল, এখন কি করবে? যদি ফিরে যায় তাহলে তাকে তারা মেরে ফেলবে, কিম্বা হয়তো তার কথার জন্যে তাকে হাজির করবে জল্লাদের কাছে। তাই ভাবল:

'তাদের কাছে যাব যাদের এরা লুঠ করতে চাইছে। তাদের সাবধান করে দেব।'

কোন পথে তারা যাবে বলে ভেবেছে তা সে জানত। কিন্তু পথটা লম্বা, তার সঙ্গে খাবারও কিছু ছিল না। খানিক পরেই সে হয়রান হয়ে পড়ল। জখমগুলো তাকে ফেলল কাবু করে। নিজের শরীরটাকে সে অতি কষ্টে চলল টেনে নিয়ে। খানিক শোয়, তারপর আবার শুরু করে যেতে। আজোভ পাহাড়ের একেবারে কাছে, ঠিক ঐখানটায়, সে আর উঠতে পারল না।

সেই আদিবাসীরা দেখল এক অচেনা লোক সেখানে শুয়ে। দেহটা রক্তাক্ত। সঙ্গে একটা বন্দুক। প্রথমে কাছে গেল মেয়েরা। বোঝোই তো, যে-জাতের কিম্বা যে-দেশেরই লোক হোক না কেন জখমদের ওপর সর্বদাই তাদের করুণা আর তাদের শুশ্রূষা করে তারা পায় আনন্দ। তাদের মধ্যে একজন সর্দারের মেয়ে। সাহসী আর চটপটে, অনায়াসেই পুরুষের পোষাক পরতে পারত। দেখতেও ভারি সুন্দরী — কারুর সঙ্গেই তার তুলনা করা যায় না। চোখ কয়লার মতো, গাল যেন ফুটন্ত গোলাপ। গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা একটা বিনুনি। সবকিছুই যেমনটি হতে হয়। তার চেয়ে ভালো কিছু কল্পনা করা যায় না। নাচে তার সমান কেউ ছিল না। আর যখন পাখির মতো গলা কাঁপিয়ে গান গাইত, তখন... এককথায়, মোহিনী। শুধু একটা জিনিস — সে দারুণ লম্বা, প্রায় দৈত্যের মতো বলা যায়। বিয়ের বয়েস তার হয়েছিল। আঠারো বছর, ঠিক বিয়ের বয়েস। মনে হল এই বিদেশী লোকটি

তার চোখে ধরেছে। লম্বা বলতে আমরা যা বুঝি সে লোকটিও তাই। চেহারা সুন্দর, চুল কোঁকড়া, চোখ বড় বড়। তার সম্বন্ধে মেয়েটির মন টানল। তাই অন্য মেয়েরা যখন উঃ আঃ করছে, এ মেয়েটি তখন সেই জখম লোকটিকে অনায়াসে তুলে গুহার মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার সেবাযত্ন শুরু করে দিল। তাকে দিল জল, ক্ষত স্থান দিল বেঁধে। এতে তার বাবা-মা আপত্তি করল না, ব্যাপারটা তারা সম্পূর্ণ সাধারণ বলেই মনে করল। প্রতিবেশীরাও আপত্তি না করে খানিক সাহায্য করল। মেয়েটি যা চাইল তাই দিল তাকে। মেয়েদের তো মায়া হয়েছিল। পুরুষদেরও ছিল নিজের নিজের চিন্তা — হয়তো ওর কাছ থেকে শেখা যাবে কী করে বন্দুক ছুঁড়তে হয়।

অল্পদিনের মধ্যেই আহত লোকটি সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। দেখল অচেনা সব লোক। আমাদের চেয়ে তারা লম্বা। তাতার ভাষা জানে না। সে জানত সামান্য তাতার। সেইটুকুই ছিল তার ভরসা। করার কিছুই নেই, সে শুরু করল ইশারা করতে। এটা-ওটা কী বলে আঙুল দিয়ে দেখায়। অর্থাৎ তাদের ভাষা শিখতে শুরু করল। সেই মেয়েটি কিন্তু কখনোই তার কাছ ছাড়া হয় না, যেন এঁটে রইল। আর সেও তো জোয়ান, মেয়েটিকে তার খুব পছন্দ হল। কিন্তু তার শক্তি ফিরে আসতে দেরি হতে লাগল। কারণ এদের কাছে রুটি নেই। মেয়েটি তাদের সবচেয়ে ভালো ভালো জিনিস তাকে দিত খেতে। মাছ, মাংস, কানায় কানায় ভরা মধু, কিন্তু এগুলো তার সহ্য হল না। এমন কি একটুকরো বার্লির রুটি পেলেও সে খুসি হত। মেয়েটির কাছে সে চাইল রুটি, মেয়েটি কিন্তু জানত না রুটি কাকে বলে। আর অমন মেয়ে সে কিনা কেঁদে ফেলল। বোঝোই তো, রুটি না হলে রুশী মানুষের চলে না। তাই কী করে সে শক্তি সঞ্চয় করবে? তবুও সে খাড়া হয়ে উঠল। তাদের ভাষাও খানিক শিখল। মেয়েটিও শিখল তার রুশ ভাষা, এতো তাড়াতাড়ি শিখল যে, অবাক হয়ে যেতে হয়। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, একেবারেই বোকা নয়। বোঝা যায় তার মধ্যে ছিল গোপন শক্তি।

সোলিকামস্কের সেই লোকটি এইভাবে চারিধারে খানিক ঘোরাঘুরি করতে লাগল। জায়গাটা তার চেনা হয়ে গেল। তাদের সে শেখাল কী করে চক্‌মকে বন্দুক ব্যবহার করতে হয়। বন্দুকের সবকিছু তাদের বুঝিয়ে দিল।

18—1115

'ঐ হলদে পাথর, হলদে গুঁড়ো আর বালি, আর ঐ জ্বলজ্বল সবুজ পাথর — এসব তোমাদের দুর্ভাগ্য নিয়ে আসবে। সওদাগররা একবার যখন সেগুলোর খোঁজ পেয়েছে, কখনই তারা আর শান্তিতে থাকতে দেবে না। আর কথাটা যখন রাজার কানে যাবে, তোমাদের জীবন তখন হয়ে উঠবে দুর্বিষহ। শোনো,' সে বলল, 'এক কাজ করো, এই পাথর আর সোনার তাল তোমরা চোখের আড়ালে রেখে দাও। ইচ্ছে হলে ওগুলো তোমরা নিয়ে যাও আজোভ পাহাড়ে। ক্রিসোলাইটগুলোকেও। মাটি চাপা দিয়ে দাও ঐ সোনার দানা আর বালির ওপর। নীচে থেকে কালো মাটি খুঁড়ে বার করো, তাহলে ঘাস জন্মাবে। কাজটা যতদিন না হয় ততদিন কোনো অচেনা লোককে কাছে আসতে দিও না। আর হঠাৎ যাতে কেউ এসে পড়তে না পারে তার জন্যে এমন লোকদের দুম্‌নায়া পাহাড়ের ওপর পাহারায় রাখো যাদের বিশ্বাস করতে পারো। তারা পথের ওপর নজর রাখুক। অচেনা কাউকে দেখলেই সঙ্কেত হিসেবে তারা যেন আগুন জ্বালায়।'

মেয়েটি দলের লোককে তার কথা বুঝিয়ে বলল। তারা দেখল তাদের জন্যে সে ভাবছে, তাই তারা তার কথা শুনল। তার উপদেশমতো তারা পাহারা বসাল। সবাই শুরু করল সোনার তাল আর ক্রিসোলাইট জড়ো করে আজোভ পাহাড়ে নিয়ে যেতে। সেগুলোকে তারা গাদা করে রাখল — বিরাট বিরাট গাদা, দেখলে ভয় হয়। ক্রিসোলাইটগুলোকে দেখাতে লাগল কয়লার গাদার মতো। তারপর তারা বাকি সোনার গুঁড়ো আর বালি ঢেকে দিল। এর মধ্যে কোনো অচেনা লোককে তারা কাছে আসতে দিল না। দুম্‌নায়া পাহাড়ের কিম্বা আজোভ পাহাড়ের প্রহরীরা কোনো বিদেশীকে ঘোড়ায় চড়ে কিম্বা পায়ে হেঁটে আসতে দেখলে হুঁশিয়ারি দিয়ে আগুন জ্বালাত। তাই দেখে সবাই তারা দৌড়ে গিয়ে সেই লোকটিকে শেষ করত। শেষ করে গোর দিত মাটির তলায়। কারণ তখন আর তাদের বন্দুককে ভয় ছিল না।

কিন্তু মধুর কাছে যেমন মাছি, সেই রকম মানুষকে টানে সোনা। যত লোকই মারা যাক না কেন, আরো লোক আসে তাদের পিছন পিছন। এখানকার অবস্থা হল তাই। অনেক লোক মারা গেল, কিন্তু তবু আরো লোক আসতে লাগল। তাই সোনার কথা পড়ল আরো দূরে ছড়িয়ে। কেউ নিশ্চয়ই কথাটা রাজার কাছে তুলেছিল। অবস্থাটা তখন বাস্তবিকই হয়ে পড়ল খারাপ, লোকজন আসতে লাগল

কামান নিয়ে। আসতে লাগল চারিধার থেকে। বনটা ছিল ঘন আর ভয়ঙ্কর। কিন্তু তারা পথ খুঁজে নিল।

আদিবাসীরা দেখল তারা আর কিছু করতে পারবে না। তাই তারা পরামর্শ চাইতে গেল জখম লোকটির কাছে। সে ছিল দুম্‌নায়া পাহাড়ে। যখন খুবই কাহিল হয়ে পড়ে তখন মেয়েটি তাকে সেখানে বয়ে নিয়ে যায়। আজোভ পাহাড় বনে-ঢাকা, কিন্তু দুম্‌নায়া পাহাড়ে বড় বড় পাথর, তার উপর দিয়ে বয়ে যেত খোলা হাওয়া। তাই মেয়েটি তাকে সেখানে নিয়ে যায়। একমাত্র ভাবনা তাকে আবার সুস্থ সবল করে তোলা।

সেখানে তারা তিন দিন ধরে পরামর্শ করল। তাই পাহাড়টার নাম হয় দুম্‌নায়া*। আগে তার অন্য কী একটা নাম ছিল। নানা কথা ভেবে ঠিক করল, অন্য কোথাও চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই; এমন জায়গা যেখানে সোনা নেই, কিন্তু জন্তু, পাখি আর মাছ আছে অনেক। সোলিকামস্কের সেই লোকটি তাদের বুঝিয়ে বলল, দেখিয়ে দিল কোন পথে যেতে হবে। সেই পথ ধরে যাবার জন্যে তারা তৈরি হতে শুরু করল। আদিবাসীরা চেয়েছিল তাদের পরামর্শদাতাও যেন তাদের সঙ্গে যায়, কিন্তু সে রাজী হল না।

বলল, 'আমার মরণ ঘনিয়ে এসেছে, যাওয়া যায় না।'

কেন যাওয়া যায় না সে-কথা কিছু বলল না। মেয়েটিও বলল:

'আমিও কিছুতেই যাব না।'

তার মা আর বোনেরা কাঁদতে লাগল। বাবা রাগারাগি করল, ভয় দেখাল, ভাইরা চেষ্টা করল তার মত ফেরাতে:

'বোন, তুমি কী বলছ! তোমার সমস্ত জীবনটাই পড়ে রয়েছে!'

কিন্তু কিছুতেই তাকে টলানো গেল না:

'এই আমার নিয়তি। যাকে ভালোবাসি কখনোই তাকে ছেড়ে যাব না।'

বলল একেবারে চূড়ান্ত ক'রে। পাথরের মেয়ে। একেবারে সবদিক দিয়েই। আত্মীয়স্বজনেরা দেখল আর কিছুই করা যাবে না, তাই তারা বিদায় নিল ভালোবাসা

* 'দুমাত্' কথা থেকে, মানে ভাবা। — অনুঃ

আর স্নেহ জানিয়ে, মনে মনে ভাবল — ওর আর কিছু হবে না। যেসব মেয়েদের ভাবী বর মারা যায় তাদের অবস্থা বিধবাদের চেয়েও খারাপ। সারা জীবন তাদের দুঃখে কাটে।

তাই চলে গেল সবাই। আজোভ পাহাড়ে তারা দুজনে রইল একলা। চারিধারে তাদের নানা অচেনা লোক। কোদাল দিয়ে তারা খোঁড়ে, নিজেরা মারামারিও করে।

জখম লোকটির শক্তি প্রায় শেষ হয়ে এল। মেয়েটিকে সে বলল:

'বিদায়, ওগো কনে! বেঁচে থাকা, ভালোবাসা, ছেলেমেয়েদের মানুষ করা আমাদের কপালে নেই।'

মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়ল, মেয়েরা যেমন করে থাকে। তার কোনো কথা সে শুনতে চাইল না, শুধু চেষ্টা করতে লাগল অন্য কথায় মন ভোলাতে:

'ওগো, ওসব কথা রাখো, মন খারাপ করো না। আমি তোমাকে সেবা করে সুস্থ করে তুলব আর তারপর একসঙ্গে করব ঘরসংসার।'

কিন্তু আবার সে শুধু বলল:

'না গো, না, আমার আর বেশী দিন নেই। এখন তো রুটি পেলেও কিছু হবে না। বুঝতে পেরেছি আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তাছাড়া তোমার স্বামী হবার উপযুক্তও আমি নই। চেয়ে দেখো, তুমি কী রকম লম্বা, তোমার পাশে আমি বাচ্চার মতো। কোনো বৌ তার স্বামীকে বাচ্চার মতো বয়ে বেড়াবে, সেটা ভালো দেখায় না। আমাদের এ জগতে তোমার স্বামী হবার মতো লোকের জন্যে তোমাকে বসে থাকতে হবে অনেক দিন।'

কিন্তু সে বিষয়ে সে কোনো কথা কানে তুলল না:

'এসব কী ধাঁচের কথা! অমন কথা মাথাতেও এনো না। আমার কাছে তুমি ছাড়া অন্য আর কেউ নেই।'

সে কিন্তু মেয়েটির কথায় কান দিল না। বলল:

'তোমার মনে ঘা দেবার জন্যে কথাগুলো বলছি না, বলছি স্পষ্ট বুঝতে হবেই বলে। তোমরা সোনা নিয়ে আছ অথচ বেনিয়া নেই, এই দেখেই কথাটা মনে হল। আমাদের দেশেও এমন এক সময় আসবে, যখন সেখানে কোনো সওদাগর কিম্বা রাজা থাকবে না, এমন কি তাদের নাম পর্যন্ত লোকে ভুলে যাবে। এখানকার

লোকেদের চেহারাও হয়ে উঠবে লম্বা, জোরদার। সেরকম কেউ আসবে আজোভ পাহাড়ে আর তোমার সোহাগের নাম ধরে ডাকবে জোরে। সেই দিন এলে আমাকে তুমি কবর দিয়ে নির্ভয়ে খুসি মনে যেও তার কাছে। সে তোমার স্বামী হবে। সেদিন এলে এদের সব সোনা নিয়ে যেতে দিও, যদি সোনার দরকার থাকে। কিন্তু এবারের মতো বিদায়, সোহাগী আমার।' আর একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলার পর তার মৃত্যু হল, যেন পড়ল ঘুমিয়ে। আর সেই মুহূর্তে আজোভ পাহাড় গেল বন্ধ হয়ে।

লোকটা, জানো তো, বাজে কথা বলে নি। নিশ্চয় ছিল পিশাচসিদ্ধ। সোলিকামস্কের লোকেরা এ ব্যাপারে ওস্তাদ।

তখন থেকে আজোভ পাহাড়ের মধ্যে কেউ কখনো ঢুকতে পারে নি। এখন লোকেরা সেই গুহার প্রবেশ পথটা জানে, কিন্তু সেটা খানিক ধ্বসে গেছে। কেউ ভিতরে ঢুকলে আরো খানিক সেটা ধ্বসে যায়, ভয় পায় এগুতে। পাহাড়টা তাই নিঃসঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে। তার উপরে জন্মেছে গাছ। যারা জানে না কখনোই তারা আন্দাজ করতে পারবে না তার ভিতরে কী আছে।

কিন্তু পাহাড়ের মধ্যে আছে, কি জানো, বিরাট একটা গুহা। তার সবটাই আশ্চর্য মোলায়েম, মেঝে সবচেয়ে ভালো মার্বেল দিয়ে তৈরি। মাঝখানে একটা ফোয়ারা। তার জল চোখের জলের মতো। আর সমস্ত দিকে সোনা স্তরে স্তরে সাজানো, যেমনভাবে আমরা কাঠ সাজিয়ে রাখি। আর কয়লার গাদার মতো আছে ক্রিসোলাইট।

এমনভাবে সেটা তৈরি যাতে গুহার ভিতরটা বরাবর আলো হয়ে থাকে। সেখানে আছে একটি মৃতদেহ, তার পাশে বসে একটি মেয়ে, কাঁদছে সর্বক্ষণ। এমন সুন্দর তাকে দেখতে যে, বলা যায় না। বয়েসও তার বাড়ে না। আঠারো বছর বয়েসের সময় তাকে যেমন দেখতে ছিল এখনও সেরকম দেখতে।

অনেকেই চেয়েছিল গুহার মধ্যে ঢুকতে। সবরকমভাবে তারা চেষ্টা করে। কত খোঁড়াখুঁড়ি করেছে, কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। আর, জানো তো, ডিনামাইটেও কোনো ফল হয় নি। তারপর অন্যরা ভাবে সেই দৌলত চালাকি করে পেতে হবে। পাহাড়ের কাছে এসে তারা নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত নাম ধরে ডাকত। ভাবে আন্দাজে লেগে যাবে সেই সোহাগের নামটা, যেটা বললে আপনা থেকেই গুহা খুলে যাবে। বুঝতেই পারছ, হাঁদা সব। নিজেদেরই কবে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। কী সব আবল-

তাবল বকে, কিন্তু হবে কী কেউ বোঝে না। কেবলি, জানো তো, সবসময় নাম ভেবে ভেবে বার করে।

বোঝা যায়, খুব জোরালো যাদু করা আছে সেখানে, সময় না আসা পর্যন্ত আজোভ পাহাড় খুলবে না।

একবার একটা জানানি আসে। সেটা যখন বাপুজি ইয়েমেলিয়ান ইভানভিচ আসেন, আর শ্রমিকরা যখন জড়ো হয় দুম্‌নায়া পাহাড়ে। আমাদের বুড়োরা বলেছিল সেই সময় পাহাড়ের ভিতর থেকে একটা গানের মতো শোনা যায়, যেন মা তার ছেলেটির সঙ্গে খেলা করছে এবং আনন্দে গান গাইছে।

কিন্তু তারপর থেকে সে গান আর শোনা যায় নি। হুহু আর হাহা। ভূমিদাস প্রথা উঠে গেলে অনেকেই আজোভ পাহাড়ে যায় এই ভেবে, দেখি এখন কী শোনা যায়। কিন্তু না, তখনো গোঙানি। আগের চেয়ে যেন করুণ।

এটা সত্যি, টাকাপয়সার জুলুম কর্তার চাবুকের চেয়েও খারাপ। যতদিন যায় ততই যেন তার জোর বাড়ছে। বাবারা এবং ঠাকুর্দারা আমাদের মতো বয়েসে উনুনের পাশে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকত, আর আমাকে, দেখো, দুম্‌নায়া পাহাড়ে পাহারা দিতে হচ্ছে, কারণ মরণ পর্যন্ত সবাই তো দুটি খেতে চায়।

হ্যাঁ, সত্যিই আজোভ পাহাড় যেদিন খুলবে সেদিন দেখার জন্যে বেঁচে থাকব না... সেদিনটা দেখতে পাব না! কিন্তু তার ভিতর থেকে যদি অন্তত একটু আনন্দের গানও শুনতে পেতাম।

তোমাদের কথা আলাদা। তোমরা ছোকরা। হয়তো তোমাদের কপাল ভালো, সেসময় পর্যন্ত বেঁচে থাকবে।

আর বলি, শোনো, লোকে তখন সোনার জোর কেড়ে নেবে। মনে রেখো আমার কথাটা, কেড়ে নেবেই! সোলিকামস্কের সেই লোকটি ভেবেচিন্তেই বলেছিল।

সেদিন পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা দেখবে আজোভ পাহাড়ের দৌলত। জানতে পারবে সেই সোহাগের নামটি যাদিয়ে দৌলত খুলবে।

এই হল ব্যাপার... সাধারণ গল্প নয় এটা। মাথা খাটিয়ে বুঝতে হয় কোনটা কী?

ঈগলের পালক

টনাটা ঘটে সারাপ্‌ল্‌কা গ্রামে। বেশী দিন আগে নয়। গৃহযুদ্ধের খানিক পরেই। সেসময় গ্রামের লোক বিশেষ লেখাপড়া জানত না। তাসত্ত্বেও যারা ছিল সোভিয়েত রাজের সপক্ষে, তারা ভাবতে শুরু করে, কী দিয়ে তাকে সাহায্য করা যায়।

জানোই তো, সারাপ্‌ল্‌কায় বহু কাল থেকে আমাদের বাপ-ঠাকুর্দারা পাথর খুঁজত। ফসল বোনা আর ফসল কাটার মধ্যে, কিম্বা অন্য সময় যখন তাদের কাজ থাকত না, তারা বেরুত তার খোঁজে। লোকে সেই কথাটা মনে রেখে গড়ল একটা আর্টেল। শুরু করল গ্রাফাইট খুঁজতে। বেশ ভালোই চলল। হাজার পুদ তুলল, কিন্তু অল্প দিন পরেই কাজটা বন্ধ করে দিল। কেন বন্ধ করে — গ্রাফাইটটা খারাপ ছিল কিম্বা দামটা ছিল খুব কম — তা বলতে পারি না। ছেড়ে দিল, দিল, তারপর নজর দিল আদুই'এর দিকে।

এখানকার সবাই সে জায়গাটা সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানে। সেখানে সবচেয়ে বেশী পাওয়া যেত একোয়ামেরিন আর এ্যামেথিষ্ট। অন্যান্য পাথরও পাওয়া যেত সেখানে। আর্টেলের একজন গর্ব করে বলে, 'পুরনো খোঁদলটায় এমন একটা ফাটল জানি যার মধ্যে বেশ কিছু পাওয়া যেতে পারে।' অন্যরা তার কথা লুফে নিল। প্রথমে ভালোই চলল। পেতে লাগল দু'তিনটে করে পাথরের জায়গা। কী পাচ্ছে দেখে আরো অনেক লোক এল আদুইতে — আমরাও একটু ভাগ্যকে পরীক্ষা করে দেখি-না। খনিটা বেশ বড়ই, তাদের বারণ তো করা যায় না। তারপর কিন্তু ব্যাপারটা খারাপ দাঁড়ায়, কিছু একটা ভুল চুক হয়। যে-আর্টেল প্রথম সেখানে যায় সেটা সেই স্তরটা হারিয়ে ফেলল। পাথরের বেলায় প্রায়ই তা ঘটে। তারা বহু খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু খুঁজে পেল না। এখন কী করা যায়? বেরেজোভ্‌স্কে তখন থাকত এক

বুড়ো খনি-শ্রমিক, তার বহু বয়েস, কিন্তু নাম-ডাক খুব। তাই আর্টেলের লোকেরা গেল তার কাছে। যে-জায়গায় তারা কাজ করছিল তার কথা বলে তাকে তারা বলল:

'দোহাই, কনদ্রাত মার্কেলিচ, স্তরটা খুঁজে দাও।'

বুড়োর জন্যে তারা আনে ভালো খাবারদাবার, কথায় যত পারলে তোয়াজ করল, প্রতিজ্ঞা করে অনেক কিছু দেবে। বেরেজোভ্স্কের অন্যান্য পাথর-খুঁজিয়েরাও আসে, বড়াই করে তাদের বুড়ো ওস্তাদকে নিয়ে:

'ওধরনের ব্যাপারে আমাদের মার্কেলিচের দারুণ হাত। গোটা এলাকায় ওর জুড়ি পাবে না।'

যারা আসে তারা অবশ্য নিজেরাই সেকথা জানত। কিন্তু কোনো কথা বলল না। এ তারিফে তাদেরই কাজ হবে। বুড়ো কি আর তেতে উঠবে না? বুড়ো কিন্তু তাদের সব কথার জবাবেই কেবল না আর না:

'আদুইতে ওরকম এমন অনেক স্তরের কথা জানি যেগুলো আপনা থেকেই হারিয়ে যায়। এখন আর আমার নজর চলবে না।'

কিন্তু আর্টেলের লোকরা ছাড়ল না। বুড়োর সামনে আরো খাবারদাবার রেখে বলল — তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা। তুমি যদি বার করতে না পার তো তাহলে কার কাছে যাব? বুড়োর ঐসব কথা শুনতে ভালো লাগছিল। সে পানও করেছিল কয়েক গেলাশ মদ। কাঁধদুটো নেড়েচেড়ে সে বড়াই করতে শুরু করল — এটা পেয়েছে, সেটা পেয়েছে, অমুক জায়গা বার করেছে, অমুকটা দেখিয়ে দিয়েছে। মোট কথা, তারা তাকে রাজী করাল। উত্তেজিত হয়ে বুড়ো টেবিলে ঘুষি মেরে বলল:

'বুড়ো হলে কী হবে, কিন্তু এখনো তোমাদের দেখাতে পারি কী করে স্তর খুঁজতে হয়!'

ঠিক এটাই আর্টেলের লোকেরা চেয়েছিল:

'দেখিয়ে দাও, কনদ্রাত মার্কেলিচ, আমাদের দেখিয়ে দাও, আমরা তোমাকে ভালো করে শুধব। প্রথম যা পাব তার অর্ধেকটা তোমার হবে।'

কনদ্রাত কিন্তু কথাটা কানে তুলল না:

'ওর জন্যে যাব না! দেখাতে চাই বুদ্ধি বিবেচনা থাকলে সত্যিকারের খনি-শ্রমিক কী করতে পারে।'

লোকে ঠিকই বলে — মাতাল হয়ে বড়াই করলে দেখাতে হয় সুস্থ হয়ে। মার্কেলিচকে আদুইতে যেতে হল। জিজ্ঞেস করল, স্তরটা কীভাবে যায়, ঠোকাঠুকি, খোঁজাখুঁজি করতে লাগল, কিন্তু কোনো স্তরই পেল না। আর্টেলের যে-লোকরা তাকে আনতে রাজী করিয়েছিল, তারা দেখল লাভ নেই কিছু। চটপট ব্যাপারটা ছেড়ে দিল। ভাবল:

'যদি কনদ্রাত বার করতে না পারে তাহলে এ নিয়ে আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

অন্যান্য যেসব লোক সে জায়গার কাছাকাছি কাজ করছিল, একের পর এক তারাও হাল ছেড়ে দিল। তাছাড়া, ঘাস কাটার সময় এসে পড়েছে। প্রত্যেকে চায় প্রচুর ঘাস কাটতে। তাই আদুই খাদ থেকে লোকেরা অদৃশ্য হল। যেন বাতাস জায়গাটা ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করেছে, একজনকেও দেখা গেল না। শুধু কনদ্রাত তখনো চলল ক্রমাগত কাজ করে। বুঝেছ, বুড়োটা একগুঁয়ে। প্রথমে সে কাজে নামে আর্টেলের লোকগুলোর জন্যে, কিন্তু যখন দেখল পাথর তাকে ব্যঙ্গ করছে, দেখা দিচ্ছে না, তখন তার রাগ হয়ে গেল:

'যেমন করেই হোক আমি বার করবই! করবই!'

সপ্তাহের পর সপ্তাহ বুড়ো একলা খেটে চলল। শক্তি ফুরিয়ে এল, কিন্তু কিছুই মিলল না। অনেককাল আগেই নিরস্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সে লজ্জা পেল। এ কী ব্যাপার — গোটা অঞ্চলের সবচেয়ে ভালো খনি-শ্রমিক, আর সে কিনা স্তরটা খুঁজে পাচ্ছে না?! হবেটা কী তাহলে! লোকে ঠাট্টা করবে। তাই কনদ্রাত ঠিক করল:

'সাবেকী কায়দায় দেখলে কী হয়?'

লোকে বলে, আগেকার দিনে লোকে খনিজ ধাতু খুঁজত যাদু-করা লাঠি আর পাথর খুঁজত যাদু-করা তীর দিয়ে। সেসব কথা সবই কনদ্রাত শুনেছে ছেলেবেলা থেকে, কিন্তু কখনো সে চেষ্টা করে নি। ওসব কথা তার মনে হত বাজে। কখনো কখনো সে ঠাট্টাও করেছে। কিন্তু এখন ঠিক করল ওগুলোই চেষ্টা করবে।

'কোনো ফল না হলে এখানে আর সময় নষ্ট করব না।'

নিয়মটা এই: চুম্বক পাথর দিয়ে একটা তীরের মাথা ঘষা দরকার, তারপর ঘষা দরকার যেধরনের পাথর খুঁজছ সেটা দিয়ে। সেই সঙ্গে কী একটা মন্ত্রও বলা

দরকার। তারপর দরকার এক সাধারণ ধনুক দিয়ে ঐ যাদু-করা তীরটা ছোঁড়া। কিন্তু ছুঁড়বার আগে চোখ বন্ধ করে তিনবার ঘুরতে হবে।

কনদ্রাত সবরকম মন্ত্রতন্ত্র জানত। কিন্তু নিজে করতে তার লজ্জা হল। তাই ভাবল সেটা করাবে তার নাতিপুতিকে দিয়ে। দেরি না করে ফিরে গেল বাড়ীতে। কাউকে অবিশ্যি দেখাল না যে, কিছু করতে পারে নি। বেরেজোভ্‌স্কের কোনো কোনো লোক এ নিয়ে আলাপ জুড়তে এলে সে সবাইকে আশা দিল আরো সপ্তাহখানেক লাগবে।

যা-দরকার স্নান-টান সারল, ভাপ নিল শরীরে। একদিন গড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হবার সময় সে তার নাতিকে বলল:

‘কী, মিশুন্‌কা, পাথর খোঁজবার জন্যে তুই আসবি আমার সঙ্গে?’

ঠাকুর্দার সঙ্গে যাওয়া, ছেলেটি গলে গেল।

বলল, ‘যাব।’

কনদ্রাত তাই তার নাতিকে নিয়ে গেল আদুইতে। ছেলেটিকে সে একটা ধনুক বানিয়ে দিল, সমস্ত নিয়ম অনুযায়ী বানাল তীর। মিশুন্‌কাকে বলল চোখ বন্ধ করে তিন পাক ঘুরে এলোপাতাড়ি তীর ছুঁড়তে। ছেলেটি তাতে খুব রাজী। কনদ্রাত যা-যা বলল সেইমতো সবকিছু সে করল। তিনবার ছুঁড়ল তীর। কিন্তু কনদ্রাত দেখল তাতে কোনো ফল হচ্ছে না। প্রথম তীর লাগল একটা গাছের গুঁড়িতে, দ্বিতীয়টা পড়ল ঘাসে আর তৃতীয়টা একটা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে গেল পিছলে পড়ে।

সেইসব জায়গায় বুড়ো সামান্য খুঁড়ল — কিন্তু প্রধানত সাবেকী রীতি পুরো মেনে চলার জন্যে। ছেলেটি অবিশ্যি সেই তীর ধনুক নিয়ে খেলতে লাগল, ছুটোছুটি করে হয়রান হয়ে পড়ল। খাবার খাইয়ে চালাটার নীচে ঠাকুর্দা তাকে শুইয়ে দিল, কিন্তু নিজের আর ঘুম আসে না। ভারি দমে গিয়েছিল সে। বুড়ো বয়েসে পেয়েছে লজ্জা। চালা থেকে বেরিয়ে বসে বসে সে ভাবতে লাগল, আর একবার চেষ্টা করে দেখলে হয় না? তারপর টনক নড়ল — তীরটা যে ঠিক জায়গায় পেঁছিয় নি, তার কারণ কি সেটা ঠিক হাত দিয়ে ছোঁড়া হয় নি?

‘ছেলেটা এখনো কিছুই জানে না। হয়তো এ কাজের সে যুগ্যি, কিন্তু নিজে

কখনো তো পাথর খোঁজে নি। তাই তার তীরটা পথ দেখাচ্ছে না। দেখছি নিজেকেই চেষ্টা করে দেখতে হবে।'

তীরটায় সে মন্ত্র পড়ল, যা-দরকার সবকিছুই করল, তিনবার পাক খেল, তারপর ছুঁড়ল। কিন্তু খনির দিকে সেটা একেবারেই গেল না। এক অচেনা লোক আসছিল রাস্তা দিয়ে। তার সঙ্গে বিশেষ কোনো পোঁটলা-পুঁটলি নেই। হাতে শুধু একটা হাতে-বোনা ঝুড়ি, বেরি তুলতে যাবার সময় আমাদের দেশের মেয়েরা যেরকম ঝুড়ি নেয়। তীরটা সে তুলে নিল, সেটা পড়ে তার খুব কাছেই। ঠাট্টা করে বলল:

'ছেলেদের খেলা নিয়ে খেলা তোমার বয়েসে মানায় না, দাদু, মানায় না।'

ওধরনের কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ায় কনদ্রাত অপ্রস্তুত হল বৈকি। রেগে বলল:

'এ নিয়ে তোমার মাথা ব্যথার দরকার নেই! যেদিকে যাচ্ছিলে যাও!'

অচেনা লোকটি হেসে উঠল:

'আমার মাথা ব্যথার কারণ নয় কেন, তোমার তীরটা তো আর একটু হলেই আমার পায়ে বিঁধত!'

বুড়োর কাছে গিয়ে সে তীরটা দিল আর খানিক হাসি-মেশানো তিরস্কারের সুরে বলল:

'হায়রে, দাদু! কতদিন কাটালে, আর প্রবাদটা জানো না: যে-তীরের পিছনে ঈগলের পালক নেই সেটা তীরই নয়।'

ওসব কথা মার্কেলিচের ভালো লাগল না। রেগে বলল:

'আমাদের এলাকায় ওধরনের কোনো পাখিই নেই। ঈগলের পালক পাব কোত্থেকে?'

লোকটি বলল, 'তা নয়। ঈগলের পালক সবখানেই আছে, কিন্তু সেগুলো খোঁজা দরকার উঁচুতে, আলোতে।'

কনদ্রাতের সন্দেহ হল:

'খুব যে বুদ্ধি ফলাচ্ছ। বুড়ো মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা। কিন্তু আমার কাজে অন্যদের চেয়ে আমি বিশেষ খারাপ নই।'

লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কাজটা কী?'

অমনি বুড়োর মুখ খুলল। লোকটির কাছে বলে চলল তার সমস্ত জীবনের

কথা। নিজেরই অবাক লাগে, তবু বলে চলল। লোকটি একটি পাথরের উপর বসে শুনল, আর তাড়া দিয়ে গেল:

'ও, তাই নাকি, দাদু? আর তারপর?'

বুড়ো তার গল্প শেষ করল। লোকটিও তারিফ করল:

'সৎপথে খেটেছ, দাদু, অনেক ভালো কাজ করেছ। কিন্তু ঐ তীরটা ছুঁড়েছিলে কেন?'

কনদ্রাত সে-কথাটাও লুকল না। লোকটি সামান্য চোখ কুঁচকে তার দিকে চেয়ে বলল:

'ও, এই তাহলে। কিন্তু তোমার তীরে যে ঈগলের পালক নেই।'

শুনে কনদ্রাত দারুণ চটে উঠল। তাকে সে নিজের জীবনের সবকথা বলেছে, আর এই লোকটা কিনা আবার তার পালক নিয়ে শুরু করেছে! ভয়ানক রেগে সে চেঁচিয়ে উঠল:

'তোমাকে বলছি এখানে ওরকম কোনো পাখিই নেই। কখনোই পালক খুঁজে পাবে না। কালা না কী তুমি?'

লোকটি খানিক হেসে প্রশ্ন করল:

'চাও তোমায় দেখাই?'

কনদ্রাত অবশ্য তার কথা বিশ্বাস করল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলল:

'যদি পারো, যদি ঠাট্টা না করে থাকো, তাহলে দেখাও।'

লোকটি তখন তার ঝুড়ি থেকে একটা বড় পাথর বার করল। আয়তনে হাতের মুঠোর দ্বিগুণ। তার ওপর আর নীচ মসৃণ করে কাটা, পাশগুলো পাঁচমুখো। তখন অন্ধকার, রঙটা সে দেখতে পেল না, কিন্তু দেখতে রঙীন কোয়ার্ৎজের মতো, ওপরের প্রত্যেকটা পলের উপর একটি করে শাদা শাদা বিন্দু — প্রায় দেখাই যায় না।

লোকটি সেই পাথরটিকে পাশে রেখে ঐ বিন্দুগুলির একটিকে আঙুল দিয়ে টিপল, আর হঠাৎ চারিপাশ একটা বিরাট ঘণ্টার আকারে আলো হয়ে উঠল। আলোটা খুব জ্বলজ্বলে আর নীলচে ধরনের, কিন্তু কোথা থেকে যে আসছে সেটা তারা দেখতে পেল না। সে আলোর ঘণ্টাটা খুব উঁচু নয়, মানুষের চেয়ে তিন কিম্বা সম্ভবত চার গুণ বড়। অসংখ্য পোকা নাচছে তার মধ্যে, ডানা নাড়িয়ে বাদুড় চলছে উড়ে।

একেবারে উপরে এক ঝাঁক পাখি গেল উড়ে। তাদের প্রত্যেকেই ফেলে গেল একটা করে পালক। আকাশে তারা ক্রমাগত পাক দিতে লাগল, যেন মাটিতে নামতে চায় না।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'পালক দেখলে?'

কনদ্রাত বলল, 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ওগুলো ঈগলের পালক নয়।'

'ঠিকই বলেছ, ঈগলের চেয়ে বরঞ্চ ওগুলোকে চড়ুইয়ের পালক বলেই মনে হয়,' লোকটি বলে বুঝিয়ে দিল। 'দাদু, ওটাই তোমার জীবন। তুমি অনেক খেটেছ, কিন্তু তোমার ডানা ছিল ছোট আর কমজোরী, বেশী ওপরে উঠতে পারো নি। চোখে ঢুকেছিল পোকা, নানা ধরনের পতঙ্গ দিয়েছিল বাধা। কিন্তু এখন দেখো কী ঘটতে চলেছে।'

আর একটা বিন্দুর ওপর সে আবার আঙুল দিয়ে টিপল, আর আলোর ঘণ্টাটা হয়ে গেল আরো অনেক বড়। তার নীল রঙের সঙ্গে মিশে গেল সবুজ রঙ। তাদের পায়ের নীচে মনে হল যেন মাটির একটা স্তর সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলল পাখি। নীচের দিকে হাঁস, তার ওপরে সারস, আর আরো ওপরে রাজহাঁস। প্রত্যেকটা পাখিই ফেলতে লাগল পালক। এই পালকগুলো আরো সোজা হয়ে পড়তে লাগল মাটির দিকে, কারণ সেগুলো আরো ভারি।

তারপর লোকটি আর একটি বিন্দুর ওপর আঙুল দিয়ে টিপল। সেই আলোর ঘণ্টাটি আরো ছড়িয়ে পড়ে, আরো দারুণ উঁচুতে উঠল, আলোটা এতো জ্বলজ্বলে যে, চোখ প্রায় ধাঁধিরে যায়। তার থেকে আভা বেরুতে লাগল নীল, সবুজ আর লাল। মাটির তলার পাঁচ গজ পর্যন্ত সবকিছু দেখা যেতে লাগল, আর মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলল পাখির দল। প্রত্যেকে তারা ফেলতে লাগল পালক। সেগুলো তীরের মতো সোজা পড়তে লাগল জমির উপর, যেখানে সেই পাথরটা ছিল তার কাছে। লোকটি কনদ্রাতের দিকে তাকাল, তার হাসিটা আলোর মতো। বলল:

'আরো অনেক পাখি আছে, যেগুলো ঈগলের চেয়েও উঁচু দিয়ে ওড়ে, কিন্তু সেগুলো তোমাকে দেখাতে ভয় হয়। সেদৃশ্য তোমার চোখে সহ্য হবে না। এখন তোমার তীরটা নিয়ে চেষ্টা করো।'

কতকগুলো পালক মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি আটকে চলল, যেন সমস্ত জীবন ধরে এই কাজ করে এসেছে। তারপর বুড়োকে বলল:

'যেখানে স্তরটা আছে বলে তোমার মনে হয় সে জায়গায় তীর ছোঁড়ো। কিন্তু তিনবার পাক খাবার বা চোখ বন্ধ করার দরকার নেই।'

লোকটির কথা শুনল কনদ্রাত। উড়ে গেল তীরটা, খাদটাও যেন খুলে গেল তার জন্যে। সে সবকিছু পেল দেখতে — শুধু স্তরের চিহ্ন নয়, পাথর মেলার গর্তগুলোও। তাদের একটা খুব বড়। এতো একোয়ামেরিন ছিল যে, সেগুলোতে একটা গাড়ী প্রায় ভর্তি হয়ে যায়, সব যেন হাসছিল। বুড়ো সবকিছু ভুলে গিয়ে ছুটল কাছ থেকে দেখতে, আর আলোটা গেল নিভে। মার্কেলিচ তখন চিৎকার করে উঠল:

'ওগো লোকটা, কোথায় তুমি?'

উত্তর এল:

'আমি এগিয়ে গেছি।'

'কিন্তু তুমি অন্ধকারে কোথায় যাবে? অলুক্ষণে সময়, ডাকাতে তোমার ঐ জিনিসটা পারে নিয়ে নিতে!' মার্কেলিচ চিৎকার করে উঠল। লোকটি কিন্তু উত্তর দিল:

'আমার জন্যে ভয় নেই, দাদু। এই জিনিসটা শুধু আমার আর তাদের হাতে কাজ করে যাদের আমি এটা দিই।'

মার্কেলিচ প্রশ্ন করল, 'কিন্তু কে তুমি?'

ইতিমধ্যেই অপরিচিত লোকটি অনেক দূরে চলে গিয়েছে, তার উত্তরটা ভেসে এল অস্পষ্টভাবে:

'নাতিকে জিজ্ঞেস করো। সে জানে।'

মিশুন্কা সে রাত ঘুমিয়ে ছিল না, আলোটা তাকে জাগিয়ে দিয়েছিল, চালার বাইরে সে ছিল তাকিয়ে। বুড়ো ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মিশুন্কা বলল:

'দাদু, এযে তোমার সঙ্গে ছিলেন লেনিন!'

বুড়ো কিন্তু অবাক হল না।

'হ্যাঁ, মিশুন্কা, উনিই তিনি। লোকে যে বলে তিনি আমাদের এলাকায় ঘুরে বেড়ান সে-কথাটা মিথ্যে নয়। ঘুরে বেড়ান, আর লোকদের বুদ্ধি-সুদ্ধি দেন। নিজেদের ছোট ছোট ডানা নিয়ে গরব না করে যেন তারা ওঠে উঁচু আলোর দিকে। ঈগলের পালকের দিকে আর কি।